পদাবলী-সাহিত্য

শ্রীকালিদাস রায়

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৬৮

মূল্য : টা. ৭·০০ (সাত টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদপট :
শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাব্রতী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ

মহোদয়ের করকমলে—

গ্রন্থ-পরিচিতি

সপ্তদশ শতকের ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ড্রাইডেন একদা তাঁহার রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন—

"ভাবসমূহ এত দ্রুতগতিতে আমার চিত্তে উদিত হয় যে, আমার দ্বিধা জাগে উহাদিগকে কাব্যের ছন্দোরূপ দিব, না গদ্যের যে অপরবিধ ছন্দোধ্বনি (other harmony of prose) তাহার মধ্যেই গাঁথিয়া তুলিব।"

আমাদের সমসাময়িক বাঙ্গালী কবি কালিদাস রায়ও বোধ হয় সময় সময় অনুরূপ দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া থাকেন। গদ্যে পদ্যে এই সমশক্তিসম্পন্ন সব্যসাচিত্বেই তাঁহার অনন্যসাধারণতা।

স্বর্গগত কবিসমালোচক মোহিতলাল মজুমদারেরও এই উভয়বিধ পটুত্ব ছিল, কিন্তু তাঁহার কাব্য গুণে শ্রেষ্ঠ মৌলিকতার অধিকারী হইলেও পরিমাণে অপেক্ষাকৃত স্বল্প। মনে হয় যে, তাঁহার পরিণত মনীষা ও কাব্যসম্বন্ধে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি সমালোচনাকে অবলম্বন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

কবি কালিদাস তাঁহার জীবনের পঞ্চাশৎ বৎসর পর্যন্ত প্রধানতঃ কাব্যরসেই বিভোর ও কবি আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। পঞ্চাশোর্ধ্বে তাঁহার কবিমন কাব্যরস-বিশ্লেষণের বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছে। এ যেন কাব্যরচনার প্রত্যক্ষ রাজৈশ্বর্যভোগ পরিত্যাগের পর তাহার পরোক্ষ রহস্য অনুধ্যানের পালা কবিজীবনে আবির্ভূত হইয়াছে।

কালিদাসের কবিতার রস আমরা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়াছি। এখন তাঁহার নূতন রচনার মধ্যে পুরাতন সুরেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার কাব্য-সমালোচনার ভিতর দিয়া তাঁহার যে নূতন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা আমাদিগকে যেমনি বিস্মিত, তেমনি পুলকিত করিয়াছে। ব্রজরাখালের বেণু আজ সমালোচকের মানদণ্ডে পরিবর্তিত হইয়াছে, যিনি বাঁশী বাজাইয়াছেন তিনি বাঁশীতে সপ্তস্বর-বিন্যাসরহস্য ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রূপান্তর সত্ত্বেও ইহার স্বভাবসুলভ মাধুর্যের কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই, কবির কাব্যরস আস্বাদন কখনও গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ড আস্ফালনের রূপ লইয়া আমাদের ভীতি উৎপাদন করে নাই।

কালিদাস যেরূপ মুগ্ধ অন্তর্মুখী মন লইয়া নিজের কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা লইয়াই অপরের কবিতারও আলোচনা করিয়াছেন। কবির সমালোচনা কাব্য-সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া কবিমনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের গোপন মন্ত্রটি আয়ত্ত করিয়াই আমাদের সম্মুখে দ্বিতীয় কাব্যসৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। স্বভাবসুন্দরী শকুন্তলার অনভ্যস্ত প্রসাধন-সজ্জা তাহার দেহসৌষ্ঠবকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নাই।

রচনার উৎকর্ষ ও স্থায়িত্বের দিক্ দিয়া কবি কালিদাস সমালোচক কালিদাসকে অতিক্রম করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু এইসঙ্গে ইহাও সত্য যে, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের দিক্ দিয়া সমালোচকেরই প্রাধান্য। এইটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

কবির প্রথম যৌবনের যে সুরভিত মদির আবেশে কবিতাগুচ্ছ থরে থরে ফুটিয়া উঠে, কবিচিত্তের সেই ক্ষণবসন্ত ঠিক তাঁহার ইচ্ছাধীন নহে, ইহা এক নিগূঢ় রসোচ্ছলতার উপর নির্ভরশীল; কিন্তু যাঁহার কাব্যানুভূতি আছে, তাঁহার পক্ষে ইহার যুক্তিগত অনুশীলন কেবলমাত্র অবসর-সাপেক্ষ ও রুচিসাপেক্ষ। কালিদাস এই অবসর ও রুচির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পর্যালোচনা করিয়া কবির দৃষ্টিতে ইহার ক্রমবিকাশের ধারাটি সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই সাহিত্যালোচনার মধ্যে কবিসুলভ সহানুভূতি ও রসোপলব্ধির প্রচুর পরিচয় মিলে।

সাহিত্য আলোচনার বিভিন্ন রীতি ও স্তর আছে। সমালোচনার মধ্যে সব সময় যে মৌলিক আবিষ্কারশক্তি বা বিচারকের কঠোর দোষগুণ বিচারে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অপক্ষপাত মূল্য নির্ধারণ থাকিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। সমালোচনার অপ্রীতিকর দায়িত্ব, নির্ভীক দোষ উদ্‌ঘাটন, অপাত্র-ন্যস্ত অতি-প্রশংসার প্রতিরোধ সকল সমালোচকের লেখার মধ্যে দেখা যায় না। কালিদাস কবির কোমল সৌন্দর্যমুগ্ধ মনোভাব লইয়াই সমালোচনা-কার্যে ব্রতী হইয়াছেন।

সাহিত্যের সহজ মর্মোদ্ধার, সরস রুচিকর আস্বাদন, বিন্যাসকৌশলের দ্বারা উহার অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও আদর্শের সুস্পষ্ট নির্দেশ—ইহাই কালিদাসের বিশেষত্ব। তিনি হয়ত কোন চমকপ্রদ কথা বলেন নাই, কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শান্তকরুণ আবেদন, ইহার ভক্তিরসাশ্রিত, গভীর অনুভূতিসিদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন রচনা-পারিপাট্য তাঁহার রচনার প্রসাদগুণে, তাঁহার কবিমনের সরস স্পর্শে ও স্বচ্ছ প্রতিবিম্বনে আরো মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক হইয়া পাঠকের সাহিত্যরুচির তৃপ্তিবিধান করিয়াছে।

কালিদাস যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা বক্তৃতামালার অঙ্গীকৃত ভাষণদানে ব্রতী ছিলেন, তখন তাঁহার সবগুলি বক্তৃতায় সভাপতিরূপে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের রসবিশ্লেষণ তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল। এই বক্তৃতাগুলির রসসিক্ত কাব্যালোচনা শুনিতে শুনিতে বৈষ্ণব কবিদের সহিত তাঁহার নিগূঢ় ভাব-ঐক্য নূতন করিয়া আমার মনে প্রতিভাত হইতেছিল। কালিদাসের কাব্যে পদাবলী-সাহিত্যের প্রভাব অতি গভীর, প্রায় সর্বব্যাপী। বৃন্দাবনলীলার দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রস আধুনিক কবির রূপক-সন্ধানী পুরাতন ভাবাসঙ্গের মধ্য হইতে নূতন তাৎপর্য-গভীরতা ও ভাবনিবিড়তা অনুসন্ধানে তৎপর, বিচিত্রসঞ্চারী কল্পনাজালের আকস্মিক ঐককেন্দ্রিক সংহরণে অন্তরনুপ্রবেশশীল মনোধর্মের মাধ্যমে এক অভিনব প্রগাঢ়তা অন্তর্মুখিতা লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার ভাবধ্বনি আধুনিক কবির মনোগহনের গহ্বরে এক গভীরতর প্রতিধ্বনির অনুরণন তুলিয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্যের সহিত বৈষ্ণবভাবাশ্রয়ী আধুনিক কবিতার পার্থক্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবির সমস্ত বেদনার্তির সমস্ত অশ্রুসজল বিলাপ-বিস্তারের মধ্যে এক নিশ্চিত আশ্বাস, এক প্রশান্ত মধুর রমণীয় পরিণাম বর্তমান। তাহা না হইলে ইহার খেদোচ্ছ্বাস, ইহার ক্ষোভ-অনুযোগের মধ্যে ভক্তিবিহ্বল আত্মনিবেদনের নিঃসন্দিগ্ধ স্বরটি শোনা যাইত না।

সাধনায় স্থির বিশ্বাস, আদর্শের অবিচল অনুসরণ সমস্ত ব্যর্থতার উপরে অটুট মহিমায় বিরাজিত। বৈষ্ণবের খেদ দয়িতের অপ্রাপণীয়তায়, ভালবাসার প্রতি অবিশ্বাসে নহে। উহার "হৃদয়মন্দিরে কানু ঘুমাওল প্রেমপ্রহরী রহু জাগি।"

শ্রীরাধার নিরাশ-প্রণয়জ্বালা, বেদনার বুকফাটা হাহাকার পড়িতে পড়িতে হঠাৎ মনে হয় যে এ সবই যেন লীলারহস্য, মায়ার কুহক; এ বিরহ যেন চিরমিলনেরই একটা কল্পিত দীর্ঘশ্বাস, শাশ্বত প্রেমেরই হৃৎস্পন্দনের একটা ছদ্মবেশী ছন্দ, সদাজাগ্রত ভালোবাসার নিমীলিত আঁখিপল্লবের ছলনা।

আধুনিক কবির মনে বেদনা ও আত্মবিলাপের নানা উপাদান সঞ্চিত,—আদর্শচ্যুতি, মানস উদ্‌ভ্রান্তি, মোহ-মরীচিকার দিশাভুলানো ইঙ্গিত, নিরাশ্রয় চিত্তবিক্ষেপের অপার শূন্যতা। সুতরাং তাঁহার কণ্ঠে যখন বৈষ্ণব কবির খেদোক্তি উচ্চারিত হয়, তখন তাহাতে এক অনভ্যস্ত অস্বস্তির সুর ফুটিয়া উঠে।

কমলাকান্ত যখন বৈষ্ণব পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছে, তখন তাহা এক অপ্রত্যাশিত তির্যকপথচারী বিলাপমূর্ছনার মর্মভেদী আক্ষেপে পরিণত হইয়াছে। "এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস, নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।" পরিপূর্ণ প্রেমের এই মহিমময় প্রশস্তি পরবর্তী যুগে এক অভিনব রূপকদ্যোতনায়, এক জটিলতর অতৃপ্তিবোধে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয়াকণ্ঠের সোহাগ বাণী দেশমাতৃকার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্তরের ভাবময় আকৃতি বহির্জগতের গ্লানিকর পরাভবে আরোপিত হইয়া খানিকটা আতিশয্য-অসঙ্গতির সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমান যুগের কবিমানসের পক্ষে দয়িতের প্রতি এই আবাহনের আন্তরিকতা, তাহাকে আধ আঁচরে বসাইবার একাত্মতা ও তাহার প্রেমোপলব্ধির বহিশ্চৈতন্যহীন আত্মমগ্নতা সবই অনায়ত্ত আদর্শ। কাজেই উপরি-উক্ত পদটির আধুনিক প্রয়োগ যে ব্যাকুলতায় উন্মনা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে সংশয়াকীর্ণ চিত্তের অনির্দেশ্য বেদনা-বিষাদের সুরটি মিশিয়া গিয়াছে।

কবি কালিদাস বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর অতি নিকট আত্মীয়, তাঁহার মধ্যে আধুনিক চিত্তের দোলাচলতা ও সমস্যাবিহ্বলতা তাঁহার প্রকৃতিবৈশিষ্ট্যের জন্যই অনেকটা অনুপস্থিত। মধ্যযুগীয় ভাব-ও-রস-সর্বস্বতা একটা আদর্শানুগামী যুক্তিপ্রতিষ্ঠা-প্রবণতার ও অভিজাত প্রকাশরীতির সহিত সংযুক্ত হইয়া তাঁহার বৈষ্ণবভাবাশ্রয়ী কবিতার বিশিষ্ট রূপের হেতু হইয়াছে। তথাপি আধুনিক মনোধর্মের যে অপরিহার্য লক্ষণ, রূপাত্মক ও দেহধর্মী কল্পনার মধ্যে অরূপ ভাবব্যঞ্জনার অনুসরণ, তাহ তাঁহার মধ্যেও অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

তাঁহার মাথুরবিরহ বৈষ্ণব কবির মাথুরবিরহের নানামুখী সম্প্রসারণ, মনের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে অনুভূতির স্তরে স্তরে ইহা একটা সূক্ষ্ম অনুরণন জাগায়। ইহার ভাবকেন্দ্র বৈষ্ণবী নিষ্ঠার পরিধি অতিক্রম করিয়া গভীরতার আপেক্ষিক অভাব ব্যাপকতার দ্বারা পূর্ণ করিয়াছে।

তাঁহার নৌকাবিলাসের কবিতায় এই সুরের নূতনত্ব সুপরিস্ফুট। বৈষ্ণব কবির কাছে ইহা তরুণতরুণীর লীলাবিহার, ঐশী প্রেমের ক্রীড়াকৌতুকবৈচিত্র্য। উপরে মেঘের ভ্রূকুটি, নিম্নে তীব্রবায়ুপ্রখর যমুনাতরঙ্গের ফেনিল দংষ্ট্রাবিকাশের বিভীষিকা, মধ্যে টলমল তরীর উপর কপটব্রীড়ায় মুখর, ব্যাজতর্জনে রুষ্ট, ছদ্ম আশঙ্কায় ত্রস্ত কিশোরীর চক্ষে প্রেমের স্থির দীপ্তি, বিশ্বাসের অবিচল নির্ভর। তরী করে টলমল পশরায় উঠে জল—এই সঙ্কটময় দৃশ্য বিপদের সঙ্কেতরূপে নহে,

কাণ্ডারীর উপর একান্ত আস্থাশীলতার পটভূমিকারূপেই কল্পিত হইয়াছিল। জ্ঞানদাসের নৌকাবিহারের দুই-একটি পদে ভবভয়ক্লিষ্ট, মুক্তিকামনায় উদগ্র ব্যাকুল, অনিশ্চয়তার গোধূলিরহস্যে অভিভূত আধুনিক মনের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ বৈষ্ণব কবিরা সংশয়াতীত বিশ্বাসে আত্মপ্রতিষ্ঠিত। কবি কালিদাসের পদে বৈষ্ণবভাবাদর্শ অনুসরণের সহিত আধুনিক শঙ্কাভীরুতার সুরও মিশিয়াছে।

তাঁহার 'নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতায় বৈষ্ণব-ভাব-পরিবেশের অনবদ্য পুনর্গঠন থাকিলেও এই অন্ধকার কেবল বৃন্দাবনলীলার উপর যবনিকাপাতের জন্যই নহে, ইহার সহিত আদর্শ অবলম্বন হারানোর বিমূঢ়তা, স্থিরজ্যোতি অস্তমিত হইবার পর আলোর সন্ধানে লক্ষ্যহীন সঞ্চরণের অস্থিরত্ব খানিকটা মরীচিকা-কম্পনের করুণ বিভ্রান্তি যুক্ত করিয়াছে।

বৈষ্ণবভাবমণ্ডলের সহিত তাঁহার এই অন্তরঙ্গ সম্পর্কই তাঁহাকে পদাবলীর রসবিশ্লেষণের অধিকার দিয়াছে। তাঁহার আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল এই সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ের সুষ্ঠু বিন্যাসের দ্বারা ইহার বিরাট্ আয়তন ও বিচিত্র রসসম্ভারের মধ্যে সাধারণ পাঠকের স্বচ্ছন্দ পদচারণার পথরচনা। তাঁহার আলোচ্য গ্রন্থে তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্বের দিক্ ও রূপরসের দিক্‌টা পাশাপাশি রাখিয়া উহাদের পারস্পরিক প্রভাব নির্ণয় করিয়াছেন। তত্ত্ব কেমন করিয়া একান্ত ভক্তিবিহ্বলতা ও দ্রবকারী অনুভূতির সাহায্যে অপরূপ রসপরিণতি লাভ করিয়াছে ও মাধুর্য কেমন করিয়া তত্ত্বের সুদৃঢ় বেষ্টনে আপনাকে অপচয় ও অসংযম হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহা তাঁহার আলোচনায় চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধনার ক্রম, দর্শনের সত্যানুভূতি, ভক্তিশাস্ত্রের যত্নরচিত অনুশাসন এক নির্মল ভাবনির্ঝরে স্নাত হইয়া এক অপরূপ রূপ-মুগ্ধতার অনুলেপ অঙ্গে মাখিয়া কেমন করিয়া করুণ প্রেমের সুকুমারশ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়া মানব-চিত্তবিহারী আদর্শ সৌন্দর্যস্বপ্নের অনবদ্য বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা আমরা অনুভব করি। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় কবির হাতে কাব্যসমালোচনা কাব্যে গহনশায়ী প্রেরণাকে আমাদের প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। সময়ে সময়ে কবির অসংবরণীয় ভাবোচ্ছ্বাস ও নিগূঢ় মর্মানুভূতি গদ্যরচনার পায়ে-হাঁটা পথ ছাড়িয়া কাব্যাভিব্যক্তির পরাগসুরভিত গীতিমর্মরিত বনবীথির অনুসরণ করিয়াছে। দীপ হইতে দীপান্তর প্রজ্বলিত করার মত মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতা আধুনিক কবির মনোমন্দিরে এক নূতন অর্ঘ্য নিবেদনের প্রেরণা জাগাইয়াছে। কবি

গদ্যসমালোচনার কুণ্ঠিত অস্ত্র ফেলিয়া তাঁহার কাব্যের দীপ্ত মন্ত্রপূত আয়ুধ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করিয়াছেন।

তাঁহার এই লীলা-বক্তৃতামালার স্বল্প পরিসরে বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা স্থান পায় নাই। কিন্তু তিনি যেটুকু বলিয়াছেন তাহা কবির অনুভূতি লইয়া কাব্যময় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণবরস-মাধুরীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতি ও সহানুভূতি গদ্যপদ্যের দ্বিমুখী গঙ্গাযমুনা-ধারায় প্রবাহিত হইয়া আবেগধর্মী ও বিশ্লেষণাকাঙ্ক্ষী উভয়বিধ পাঠকেরই রুচিকে তৃপ্ত করিয়াছে।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পদাবলী-সাহিত্য

(তত্ত্ববিচার ও রস-বিশ্লেষণ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণব পদাবলী রাগানুগ বৈষ্ণব ভক্তগণের সাধনভজনের সহায়, বাংলার প্রাচীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্য ও কীর্তনসঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন। এইগুলির উপজীব্য একাধারে ধর্ম, সাহিত্য ও সঙ্গীত,—বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহাদের কাছে পদাবলী একাধারে ভাগবতের মতই ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্য। যাঁহারা বৈষ্ণব নহেন—তাঁহাদের কাছে অনুরাগমূলক উৎকৃষ্ট কাব্যসাহিত্য।

পদাবলীর বিষয়বস্তু—বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা থাকিলেও চার পাঁচ শত বর্ষ ধরিয়া বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য-রসপিপাসা মিটাইয়াছে এই পদাবলী-সাহিত্য। সেকালে কাব্যের প্রধান উপজীব্য ছিল ধর্মপ্রসঙ্গ। কোন লৌকিক, ব্যাবহারিক বা ঐহিক বিষয়বস্তু লইয়া কিছু রচিত হইয়া থাকিলে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ পদকর্তারা ছিলেন বৈষ্ণব সাধক। কাজেই বৈষ্ণব লীলাতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। রাধাশ্যামের প্রণয়লীলাই পদাবলীর মুখ্য বিষয়বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যলীলা ও সখ্যলীলা-ও পদাবলীর উপজীব্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাবর্ণনার পদগুলি পদাবলীর একটি নব ধারার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাগবতের অনুসরণে রচিত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলার পদগুলি আসল পদাবলীর

অন্তর্গত নয়। পদাবলী শব্দটি 'মধুরকোমলকান্ত পদাবলীর' কবি জয়দেবের প্রবর্তিত।

তত্ত্বানুশাসন—পদকর্তারা পদাবলীর তত্ত্বগত অনুশাসন লাভ করিয়াছেন প্রধানতঃ বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব রস-গুরুদের গ্রন্থ হইতে।

পদকর্তাদের গুরুস্থানীয় রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী, কবিকর্ণপূর, রায় রামানন্দ ইত্যাদি বৈষ্ণবাচার্যগণ সংস্কৃতে লীলাতত্ত্ব অবলম্বনে কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত উজ্জ্বল-নীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, অলঙ্কারকৌস্তুভ ইত্যাদি রসশাস্ত্রের পুস্তকগুলি ভক্তিতত্ত্বের অনুগত সাহিত্য-রচনারই রীতিপদ্ধতি ও পরিচালনা দান করিয়াছে এবং সেই সাহিত্যেরই রসবিশ্লেষণে সহায়তা করিয়াছে। রূপ গোস্বামীর পদাবলী এবং নাটকান্তর্বর্তী শ্লোকগুলিতে তত্ত্ব অপেক্ষা আলঙ্কারিক চাতুর্য ও কবিত্বের মাধুর্যই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সাহিত্যের পল্লবিত শ্যামল পেলবতায় ভক্তিরস পূজার পুষ্পের মতই বিকসিত হইয়াছে। ঐগুলি হইতে অনেক পদকর্তা কলা-চাতুর্য ও মাধুর্য-সৃষ্টির আদর্শও লাভ করিয়াছেন।

পদাবলীর কাব্যরূপ—এক-একটি লীলা অবলম্বনে যেন এক-একটি স্বতন্ত্র কাব্যই বিরচিত হইয়া আছে। এই কাব্যের রচয়িতা একজন নয়, অনেকে। পদসঙ্কলয়িতারা ও কীর্তনীয়ারা এই কাব্যগুলির সম্পাদক। বহু জনের মিলিত কণ্ঠের উদ্‌গীত সঙ্কীর্তনের ন্যায় বহু জনের নিবেদিত রসগীতিকার সমাবেশে এই কাব্যগুলি রচিত। ভিন্ন ভিন্ন কবির পদ লইয়া রসের ক্রম অনুসারে এমন করিয়া পালাগুলি সাজানো হইয়াছে, যাহাতে এক-একটি পালা এক-একটি কাব্যে পরিণত হইয়াছে। পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরুর মত যে সকল সংগ্রহ-পুস্তকে ব্রজলীলার সব পালাগুলি সুবিন্যস্ত হইয়াছে, সেগুলি ভাগবতের মত এক-একখানি মহাকাব্যের রূপ ধরিয়াছে। একভাবনিষ্ঠ লীলারসে বিভাবিত অভিন্নহৃদয় কবিদের প্রয়াসে ও সমবেত সাধনায় এই মহাকাব্যের সৃষ্টি।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাসের মত কবিরা ব্রজের প্রত্যেক লীলাঙ্গেরই পদ রচনা করিয়াছেন। ফলে, তাঁহাদের পদাবলী সুবিন্যস্ত হইয়া এক-একটি পরিপূর্ণাঙ্গ কাব্যরূপ ধরিয়াছে। আর অনন্তদাস, উদ্ধবদাস, ঘনশ্যাম, বলরামদাস, কবিশেখর, শশিশেখর ইত্যাদি কবিরা লীলার কোন কোন অঙ্গের পদ রচনা করিয়াছেন—তাঁহাদের পদ কীর্তনগানের পালার মধ্যে স্থান পাইয়া সর্বাঙ্গসুন্দর কাব্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

পদাবলী কি গীতিকবিতা?—কতকগুলি পদের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের সংযোগে গাঢ়বন্ধতা নাই। এইগুলি অনেকটা চিত্রাত্মক। কতকগুলিতে আছে সুসম্বদ্ধ বাক্য-পরম্পরায় ভাববিশেষের ক্রমোন্মেষ (organic development,—rounded as a star), এইগুলিই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পদ। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পদ অজস্র নয়। অধিকাংশ পদ ঐ উৎকৃষ্ট পদগুলির অনুকৃতি, অথবা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পদের ভাবই রূপান্তরে প্রকাশিত। এমন কি, সেগুলিতে অন্য পদের পদবিন্যাস, অলঙ্কৃতি, বাক্যক্রম ইত্যাদির permutation combination হইয়াছে।

লিরিক বা গীতিকবিতা বলিতে যাহা বুঝায় এগুলি তাহা নয়। এগুলি বাণীভূয়িষ্ঠ গানই। গীতিকবিতার সাধারণতঃ একটি নির্দিষ্ট সীমা বা গণ্ডী নাই। তাহার অন্তর্নিহিত ভাবধারার নিজস্ব একটা বেগবত্তা আছে। সে বেগ কত দূরে গিয়া বিশ্রান্ত হইবে তাহার একটা বাঁধাধরা নিয়ম নাই। তাহা দীর্ঘও হইতে পারে, হ্রস্বও হইতে পারে। কিন্তু গানের একটা নির্দিষ্ট অবধি আছে, তাহার আকাঙ্ক্ষার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, তাহার রূপ সংক্ষিপ্ত। পদগুলি সেইরূপ একটা নির্দিষ্ট সীমায় গিয়া শেষ হইয়াছে,—সনেটের মত।

এমন এক-একটি ভাবখণ্ড লইয়া পদ রচিত হইয়াছে যে, তাহার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ১২।১৪ চরণেই পরিতৃপ্ত হইয়াছে। ফলে, অনেক সময় এক-একটি পরিপূর্ণ ভাবাবেগ হয়ত একাধিক পদে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

গীতিকবিতার একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে। কবি তাহাতে সাধারণতঃ নিজের প্রাণের কথাই বলেন—নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকেই ছন্দে রূপ দান করেন। পদাবলীর মত একটা গোষ্ঠী, সমাজ বা সম্প্রদায়ের ভাবধারাই তাহার উপজীব্য হয় না। অন্ততঃ রচনাশৈলী বা ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীটা কবির নিজস্বই থাকে। অন্ধভাবে একটা অনুশাসনের বিধিবদ্ধ ভাবধারা, রীতি বা ভঙ্গীর অনুস্থতি গীতিকবিতা নয়।

তাহা ছাড়া, আবৃত্তির জন্যই গীতিকবিতা রচিত হয়, যদিও তাহাকে গাওয়াও যাইতে পারে (সেইজন্যই নামও ইহার গীতি-কবিতা)। কিন্তু গায়কের কণ্ঠের মুখাপেক্ষী হইয়া গীতিকবিতা রচিত হয় না। বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ রচিত হইয়াছে সুরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। ছন্দের মর্যাদা সেজন্য অনেকে গোবিন্দদাসের মত অক্ষরে অক্ষরে সতর্কতার সহিত রক্ষা করিয়া চলেন নাই। সুরে গাহিতে সুবিধা হয় নাই বলিয়া হ্রস্বস্বরকে বহু স্থলে দীর্ঘত্ব এবং দীর্ঘস্বরকে হ্রস্বত্ব দান করা হইয়াছে।

অর্ধসৃষ্টি—পদাবলী যেন অর্ধসৃষ্টি, বাকি অর্ধেক সৃষ্টি সম্পাদিত হয় গায়কের কণ্ঠে। কেবল পাঠ-মন্দিরে পঠনে আমরা যেটুকু রস পাই—নাটমন্দিরে কীর্তনীয়াদের কণ্ঠে শুনিলে তাহার চেয়ে ঢের বেশি পাই। গায়কের মুক্ত-কণ্ঠের আঁখর, আবেগ ও দরদ তাহাতে যুক্ত হইয়া তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলে। যে পদে আমরা ছন্দের অঙ্গহানি লক্ষ্য করি, বা আবৃত্তির দোষে ছন্দোভঙ্গ করিয়া ফেলি, গায়ক-কণ্ঠে শুনিলে ছন্দের দিক্ হইতে তাহাকে নির্দোষ বলিয়াই মনে হইবে। গানের সুরের দিকে উৎকর্ণ হইয়া মনে মনে গাহিয়া রসাবিষ্ট অবস্থায় পদকর্তারা পদ রচনা করিতেন। তাই বোধ হয়, তাঁহাদের কাছে সে সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ বলিয়াই মনে হইত। তাহা ছাড়া, এগুলি প্রাকৃত প্রেমের ভাষায় রচিত, ভক্তের মনে অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য লাভ করিলে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে।

অভক্ত কাব্যরসিকের কাছে এইগুলি অর্ধসৃষ্টি।

সীমানুশাসন—নূতন কথা নূতন ভঙ্গীতে নূতন সঙ্গীতে বলাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না; যে কথা পূর্ববর্তী মহাজনেরা বলিয়াছেন —যে কথা বৈষ্ণবগোষ্ঠীর ইষ্টানুগত, যে কথা চৈতন্যদেবের ভাবাদর্শের সম্পূর্ণ অনুগত এবং যাহা তাঁহাদের সকলেরই সাধারণ ভাবসম্পদ্ —সেই কথা রসাভাস বর্জন করিয়া সুরসঙ্গতরূপে বলিতে পারিলেই তাঁহাদের সাহিত্যগত দায়িত্ব ও গোষ্ঠীগত কতব্যের সমাধা হইত।

পদগুলি যেন এক-একটি শ্লোকের মত, শ্লোকের মতই ইহাদের চতুঃসীমা বিধিবদ্ধ। অনেক পদ বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, উদ্ধব-সন্দেশ, দানকেলিকৌমুদী—এমন কি অবৈষ্ণব সংস্কৃত বা প্রাকৃত কাব্যনাট্যের শ্লোকের ভাবানুবাদ (এই নিবন্ধের মধ্যে সেরূপ দৃষ্টান্ত কয়েকটি দেখানো হইল)। আবার পক্ষান্তরে কোন কোন পদ পরে বৈষ্ণবাচার্যগণের দ্বারা সংস্কৃতে শ্লোকত্ব লাভও করিয়াছে।

অনেক ক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট ভাবকে বিকসিত করিয়া তোলাই বহু পদের উদ্দিষ্ট নয়। নির্দিষ্ট সীমাবন্ধনের মধ্যে সুরের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া গেলেই পদকর্তারা স্বকীয় ভণিতা দিয়া শেষ করিতেন—গীতিকবিতার বিকাশধারার অনুসরণ করিতেন না। অনেক সময় কোন একটি বিশিষ্ট ভাবের বিকাশ সাধন না করিয়া তিন চারিটি বিভিন্ন ভাবের অন্তরার দ্বারা পদটিকে পরিপূর্ণতা দান করিতেন। পদের গঠনে সনেটের মতো একটি নির্দিষ্ট গণ্ডী থাকায় বাধ্য হইয়া কবিদের ভাবাবেগ সংবরণ করিতেও হইয়াছে—ভাষা হইয়াছে মিতাক্ষরা, অতিভাষণের দূষণ কোথাও ঘটে নাই।

রচনাক্রম—পদের বাক্যাবলীর ক্রমানুস্মৃতি সকল কবির একরূপ নয়। তাহার দ্বারাই রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য ধরা যায়। গোবিন্দদাসের রচনার ক্রমপারম্পর্য আলঙ্কারিক (rhetorical sequence)।

অলঙ্কৃতির আকাঙ্ক্ষার উপর তাঁহার পদের গঠন নির্ভর করিত। চম্পতির রচনার ক্রম যুক্তিমূলক (argumentative sequence), যুক্তিপরম্পরার আকাঙ্ক্ষার উপর পদের গঠন নির্ভর করিত। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, নরোত্তমদাস ইত্যাদি অধিকাংশ কবির রচনার ক্রম আবেগাত্মক (emotional sequence)। অনেকের পদে কোন বিশিষ্ট পরম্পরা অনুসৃত হয় নাই। সেজন্য বাক্যগুলি তাঁহাদের পদের মধ্যে গাঢ়বন্ধতা লাভ করে নাই।

গোষ্ঠীসাহিত্য—পদাবলী একটা রসগোষ্ঠীর রচনা। যাঁহাদের নামের ভণিতা আছে তাঁহারা যেন উপলক্ষ মাত্র। কাহার রচনায় যে কাহার ভণিতা আছে, অনেক ক্ষেত্রে তাহার ঠিক নাই। একটা ভণিতা দিতে হয় তাই যেন দেওয়া হইয়াছে। বহু কবি সম্ভবতঃ তাঁহাদের নিজের রচনায় বিখ্যাত কবির ভণিতাই চালাইয়াছেন। আত্মবিলোপ যে সাধনার অঙ্গীভূত, সে সাধনায় ভণিতাযোগও যেন একটা অভিমানের কথা। তাই ভণিতায় দীনতার অবধি নাই। যাহার যে উপাধিই থাকুক সকলেই 'দাস'। পদে যাঁহার ভণিতা থাকে, ভাষা যদি তাঁহার নিজস্ব হয়, ভাব তাঁহার নয়—ভাব ঐ রসগোষ্ঠীর নিজস্ব। এমন কোন ভাব কোন পদে পাওয়া যায় না—যাহা অন্যান্য পদেও নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ—

বিদগ্ধমাধবে রূপ গোস্বামী লিখিলেন—

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো ময়ি যদি তবাগঃ কথমিদম্
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিতদোর্বল্লরিরিয়ম্
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥

যদুনন্দনদাস লিখিলেন—

তমালের কান্ধে মোর ভুজলতা দিয়া।
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিয়ো বান্ধিয়া॥

শ্রীখণ্ডের বিদ্যাপতি লিখিলেন—

না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখ তমালের ডালে॥

শশিশেখর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছন্দোমাধুর্য যোগ দিয়া বলিলেন—

নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি
রাখবি তনু ইহ বরজ মাঝে।
হামারি দুন বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বাঁধবি
শ্যামরূপী তরু-তমালডালে।

শুধু ভাব নয়, এমন অলঙ্কারেরও প্রয়োগ খুব কমই দেখা যায়—যাহা অন্যান্য কবির রচনাতেও পাওয়া যায় না।

বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর মতে পদরচনার ভাব, ভাষা, অলঙ্কৃতি সমস্তই এজমালী সম্পত্তির মত; তাহাতে সকলেরই ছিল সমান অধিকার। সে যুগের রসজ্ঞদের কাছেও ব্যক্তির বিশেষ কিছু মূল্য ছিল না—রসবস্তু ও রসগোষ্ঠীর দিকেই তাঁহারা দৃষ্টি রাখিতেন।

পদগুলি যেন একটি বিশাল রসপ্রবাহের কতকগুলি হিল্লোল, রসধারার প্রবাহরক্ষাই সে কালের রসিক-ভাবুকদের মতো কবিদেরও লক্ষ্য ছিল। রসপ্রবাহের সোনার তরীতে সোনার কমল তুলিয়া দিয়াই কবিরা দায়মুক্ত। কবিগুরুর ভাষায় 'রাতের তারা স্বপ্ন-প্রদীপখানি ভোরের আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে যায় চ'লে তার দেয় না ঠিকানা।'

কবিদের নিজস্ব যাহা ছিল সেটুকুকেও রচনার রূপ দেওয়ার সুযোগ-সুবিধা হয় নাই। প্রচলিত আদর্শ ও বিধিবিধানের অনুগত হইয়াই তাঁহাদের চলিতে হইত। পূর্ববর্তী মহাজনগণ যাহা বলেন নাই, তাহা বলিতে কাহারও সাহসও হয় নাই, বলা সঙ্গত নয় বলিয়াও বোধ হয় ধারণা ছিল। তাঁহারা জানিতেন মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। পাছে রসাভাস ঘটে, পাছে সুরসৌষম্য (harmony) নষ্ট

অন্য কোন পদকর্তা সে ভাবের অনুসরণ করেন নাই। পদকর্তারা কেবল জয়দেবের পদবিন্যাস অনেক পদে গ্রহণ করেন নাই—কোন কোন শ্লোককে অভিনব পদের আকারও দান করিয়াছেন, জয়দেব-রচিত পদের কোন কোন অংশ নিজেদের পদের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়াছেন, ভঙ্গীগত বৈশিষ্ট্যকে পদের অঙ্গীভূত করিয়াছেন এবং জয়দেবের আলঙ্কারিক চাতুর্যের সবটুকুই পদকর্তাদের বিভিন্ন পদে বিকীর্ণ হইয়া আছে। জয়দেবের পদগুলি বাংলা ও ব্রজবুলির পদের তুলনায় দ্রাঘীয়ান্। গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, দানলীলা, গোষ্ঠলীলা, মাথুর, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি নাই। এইগুলির কোন কোনটির সূত্রপাত হইয়াছে বিদ্যাপতি হইতে, কোন কোনটির বড়ু চণ্ডীদাস হইতে। গীতগোবিন্দে রাধা প্রধানতঃ খণ্ডিতা ও মানিনী-রূপে চিত্রিতা হইয়াছেন। ভণিতায় জয়দেব বলিয়াছেন, হরিস্মরণে যাহাদের মন সরস, বিলাসকলায় যাহারা কুতূহলী, তাহাদের হর্ষবৃদ্ধি ও ভক্তিসঞ্চারের জন্যই তাঁহার কাব্য। পদকর্তারা নিজেদের শ্রীমতীর সখীস্থানীয় কল্পনা করিয়া মধুর রসের বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন এবং শ্রীরাধার উদ্দেশে আশ্বাস, সমবেদনা ও উপদেশাদি সংযোগ করিয়াছেন। এই প্রথা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে প্রাধান্য লাভ করে নাই।

জয়দেবের আগে প্রাকৃত ভাষায় পদরচনার পদ্ধতি ছিল। পিঙ্গলের প্রাকৃত ছন্দের গ্রন্থে শ্লোকাকারে ২।৪টি পদের নিদর্শন পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার পদও পাওয়া যায়। জয়দেব যে ছন্দে পদ রচনা করিয়াছেন—সে ছন্দ মরহট্টা, বৃত্তনরেন্দ্র, চৌপইআ, চর্চরী, দোহা ইত্যাদি প্রাকৃত ভাষারই ছন্দ। এইগুলিই পদকর্তারাও গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষা আর কথিত ভাষা হিসাবে চলিল না,—দেশের বিদ্বৎসমাজও প্রাকৃত ভাষার রচনার বিশেষ আদর করিল না।—তাহার ফলে প্রাকৃত ভাষার পদগুলি ক্রমে বিলুপ্ত হইল। জয়দেবের সময়ে প্রাকৃত ভাষায় কবিতা রচনার পদ্ধতি প্রচলিত

থাকিলেও জয়দেব প্রাকৃত ভাষায় না লিখিয়া অত্যন্ত সহজ সরল সংস্কৃতে (অনেকটা সংস্কারিত প্রাকৃতে) লিখিয়া অসামান্য সাফল্য লাভ করিলেন।

জয়দেবের পদাবলীর সংস্কৃত ভাষায় ক্রিয়াপদের বাহুল্য নাই এবং সংস্কৃতের ললিতমধুর শব্দাবলীর দ্বারা পদগুলি রচিত। এই শব্দাবলী তৎসম শব্দরূপে বাংলা কবিতায় চিরপ্রচলিত। ক্রিয়াপদ-গুলির ধাতুও বাংলায় অপরিচিত নয়। ললিতমধুর শব্দগুলি সমাসবদ্ধ,—ঘন ঘন বিভক্তি প্রয়োগে সন্ধিবদ্ধ নয়, সেজন্য জয়দেবের পদাবলীর ভাষা বাংলা ভাষার সমীপবর্তী।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ সহজবোধ্য সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় আর্যাবর্তের সর্বত্রই—এমন কি দক্ষিণাপথের বহু স্থলে তাহার প্রচার ও সমাদর হইয়াছিল। কিন্তু বাংলার মত অন্য প্রদেশের গীতিকাব্যে ইহা এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। গীতগোবিন্দের অনুসরণে হিন্দী ভাষাতেও গীতিকবিতা কিছু কিছু রচিত হইয়াছিল, কিন্তু বাংলার সমতলে ইহা গীতিরসের বন্যা আনিয়া দিয়াছিল। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, বাঙ্গালী প্রেমিক জাতি, প্রেমের কবিতার বড়ই অনুরাগী। বাঙ্গালীরা গীতগোবিন্দে প্রেমগীতির একটা চূড়ান্ত আদর্শ পাইয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে ও তাঁহার প্রেমধর্ম-প্রচারের ফলে গীতগোবিন্দ বৈষ্ণবজগতে ভাগবত বা গীতার মর্যাদা লাভ করিল। চৈতন্যদেব গীতগোবন্দে লোকাতীত ব্যঞ্জনা সঞ্চার করিলেন। তখন চৈতন্যোত্তর গীতিসাহিত্যে গীতগোবিন্দ পদরচনায় অভিনব প্রেরণা দান করিল। তৃতীয়তঃ, বাঙ্গালীর নিজস্ব কীর্তনসঙ্গীতের অভাবনীয় সমুন্নতির ফলে গীতগোবিন্দের পদ কীর্তনের অঙ্গীভূত হইয়া অসাধারণ সমাদর লাভ করিল—তদনুসরণে রচিত পদেরও তেমনি মর্যাদা বাড়িয়া গেল। চৈতন্যোত্তর কীর্তনসঙ্গীতে গীতগোবিন্দ কেবল অভিনব সার্থকতা (interpretation) নয়,—অভিনব সুরতালও লাভ করিল।

চর্যাপদ—প্রাকৃত ভাষার নিকটবর্তী ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। এইগুলিকে চর্যাপদ বলা হয়। এইগুলিতে বঙ্গদেশে রূপান্তরিত বৌদ্ধ সাধনমার্গের তত্ত্বগুলি সাঙ্কেতিক ভঙ্গীতে ও রূপকের আবরণে সাঙ্গীতিক রূপ লাভ করিয়াছে। মনে হয়, এইরূপ পদ দেশে অনেক ছিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি এবং ভাষার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে চর্যাপদগুলিও অপ্রচলিত হইয়া পড়িল। কতকগুলি এই শ্রেণীর পদ নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলিতে বাংলা ভাষার আদিমরূপের পরিচয় পাওয়া যায়।—বর্তমান যুগে অপ্রচলিত হইলেও সম্ভবতঃ বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাসের যুগে অপরিচিত ছিল না। এইগুলির গঠনগত সাম্য ছাড়া পদাবলীর সহিত এইগুলির কোন সম্বন্ধ নাই। ব্রজপদাবলী রসময়, চর্যা পদাবলী রহস্যময়। এই কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন চর্যাপদগুলি সাধারণতঃ পজ্ঝটিকা ও চৌপইআ ছন্দে এবং ভণিতান্ত হ্রস্বাকারে লিখিত। ধ্রুবপদও পদের প্রথমে কিংবা মধ্যে আছে। বৈষ্ণব পদের গঠনভঙ্গী পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল কেবল এই কথাটাই ইহাতে প্রমাণিত হয়। উভয় শ্রেণীর পদাবলীর মধ্যে দৈহিক সাম্য আছে, আত্মিক সাম্য কিছুই নাই।

সংস্কৃত উৎস—বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; ভাগবত ছিল তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ। অন্যান্য পুরাণের সঙ্গেও তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সংস্কৃত রাগসাহিত্যের সমস্ত উপাদান উপকরণই বৈষ্ণব কবিরা পদাবলী-রচনায় গ্রহণ করিয়াছেন।

রসমঞ্জরী, অমরুশতক, আর্যাসপ্তশতী, শৃঙ্গারতিলক, বাৎস্যায়নের কামসূত্র ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ হইতে তাঁহারা অনেক ভাববস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। সদুক্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সুভাষিতাবলী, পদ্যাবলী, সূক্তিমুক্তাবলী, শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, সূক্তিরত্নহার ইত্যাদি গ্রন্থের বহু শ্লোককে কবিরা নব বাণীরূপ দিয়াছেন। কবিরা সব চেয়ে বেশী

ভাবোপকরণ পাইয়াছেন—গাহা সত্ত সঈ (হালের গাথা সপ্তশতী) হইতে। ছন্দের দৃষ্টান্তস্বরূপ পিঙ্গলে উল্লিখিত শ্লোকগুলি হইতেও কবিরা ভাবসূত্র লাভ করিয়াছেন। এই সকল রচনার মধ্যে যেগুলিতে প্রাকৃত প্রেমের কথা আছে সেগুলির ভোগোপকরণকে চন্দনাক্ত ও তুলসীবাসিত করিয়া বৈষ্ণব কবিরা রাধাশ্যামের উদ্দেশে নিবেদন করিয়াছেন। গাহা সত্ত সঈ কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুরাগের কথাও আছে—ইহাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস। ভাগবতের অনেক অংশকে কবিরা চৈতন্যপ্রবর্তিত লীলাতত্ত্বের অনুগত করিয়া লইয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন (রাসলীলাপ্রসঙ্গে ইহার আলোচনা করা হইবে)। বড়ু চণ্ডীদাস ভাগবত, হরিবংশ এবং অন্যান্য পুরাণের রস-নির্যাসকে সেকালে প্রচলিত ধামালী সঙ্গীতের চষকে ঢালিয়া তাঁহার কৃষ্ণকীর্তন পরিবেষণ করিয়াছেন। মালাধর বসু পদকর্তাদের আগেই ভাগবতের মর্মানুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের এক-একটি অংশ রাগরাগিণী সংযুক্ত হইলেও পদের আকারে রচিত নয়। ইহা কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত প্রধানতঃ পয়ার ছন্দে গ্রথিত। দীন চণ্ডীদাস ভাগবতের অনেক অংশ অবলম্বন করিয়া পদের আকারে একখানি কাব্য রচনা করেন। ইহাকে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য বলা যাইতে পারে। প্রাচীন সঙ্কলন-পুস্তকেও দীন চণ্ডীদাসের কতকগুলি পদ স্থান পাইয়াছে।

বিদ্যাপতি—বিদ্যাপতি বঙ্গীয় পদকর্তাদের গুরুস্থানীয়। বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রায় সকল প্রকরণের ও সকল অঙ্গেরই পদ রচনা করিয়াছেন। পদকর্তারা—বিশেষতঃ চৈতন্যোত্তর পদকর্তাদের অনেকেই বিদ্যাপতির অনুবর্তী। বিদ্যাপতির প্রধান শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ। গোবিন্দদাস শিষ্যজনোচিত দীনতার সঙ্গে নিজেই বলিয়াছেন—

বিদ্যাপতি-পদ-যুগলসরোরুহ-নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর পিবইতে করু অনুবন্ধে॥

হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিকশিরোমণি নাগরনাগরী লীলা ফুরব কি মোয় ॥

ব্রজবুলি—সে যুগে মিথিলার সঙ্গে, বিদ্যাজ্ঞানের আদানপ্রদানের পথে, বাংলার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিদ্যাপতির পদাবলী শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষার নাম ব্রজবুলি। ডাঃ সুকুমার সেনের মতে খৃঃ ৭ম-৮ম শতাব্দী হইতে ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া আর্য ভাষাভাষীদের মধ্যে আর্যাবর্তের কথ্যভাষার সার্বভৌম সাধুরূপকে আশ্রয় করিয়া যে সাহিত্য রচনার ভাষা প্রচলিত ছিল তাহার একটি নাম অবহট্‌ঠা। এই অবহট্‌ঠা হইতেই পূর্বভারতের প্রত্যেক প্রদেশে ব্রজবুলির উৎপত্তি। অবহট্‌ঠাই মৈথিলী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আসামী ইত্যাদি স্থানীয় ভাষার প্রভাবে ১৫শ-১৬শ শতাব্দীতে ব্রজবুলির রূপ ধরিয়াছে—এক হিসাবে ইহা সর্বভারতীয় কনিষ্ঠতম সাধু আর্য ভাষা। এই ভাষাই বাংলাদেশে প্রচুর বাংলা পদ এবং সংস্কৃত শব্দের বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তিজাত রূপের সহিত মিশিয়া পদাবলী সাহিত্যের বাহন হইয়াছে। অন্য কোন প্রদেশে এমন ব্যাপকভাবে ব্রজবুলির পদ রচিত হয় নাই। বাংলায় ব্রজবুলির প্রথম পদ যশোরাজ খাঁর,— "এক পয়োধর চন্দনে লেপিত আরে সহজই গোর।" তারপর উড়িষ্যার রামানন্দ রায়ের বিখ্যাত পদ—"পহিলহিঁ রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।"—আমাদের পদাবলী সংকলনে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে বাংলায় ব্রজবুলিতে পদরচনার পদ্ধতি বিশেষরূপ প্রচলিত হয় নাই। চৈতন্যদেবের তিরোধানের কিছু দিন পরে ব্রজবুলিতে পদরচনার ধুম পড়িয়া যায়। খেতুরির উৎসব সময়ে ব্রজবুলির পদ লীলাকীর্তনের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। এ ভাষায় কোন পুরা গ্রন্থ রচিত হয় নাই। বৈষ্ণব সমাজেও ইহা কথিত ভাষা হইয়া উঠে নাই। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের সকলেই এই ভাষা বুঝিত। কিন্তু এই ভাষায় পদরচনার সার্থকতা কি?

১। এই ভাষা এতই উদার ও আতিথেয় যে, ইহার মধ্যে যে-কোন প্রাদেশিক ভাষার শব্দ সহজে সামঞ্জস্য লাভ করে। সেজন্য এই ভাষায় কখনও উপযোগী শব্দের অভাব হয় নাই। দবির খাস ও শাকর মল্লিকের বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশের মতো ইহাতে ফারসী শব্দও প্রবেশ করিয়াছে।

২। ব্রজবুলির সঙ্গে কবিরা প্রাকৃত ভাষার বিবিধ সুললিত ছন্দ পাইয়াছেন। এই ছন্দগুলি দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের সমাবেশে হিন্দোলিত। বাংলা ভাষায় দীর্ঘস্বর তাহার গুরুত্ব ও দীর্ঘতা হারাইয়াছিল—বাংলায় যুক্তাক্ষরের পূর্বস্বর ছাড়া অন্যত্র দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে গেলে অস্বাভাবিক হইয়া উঠিত। কিন্তু ব্রজবুলিতে তাহা হয় না। কথিত ভাষায় দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণই অস্বাভাবিক শুনায়—কৃত্রিম ভাষাতে সে অসুবিধা নাই। এইভাবে ছন্দোহিন্দোল পাওয়ার সুযোগের জন্য কবিরা ব্রজবুলিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় হসন্ত শব্দের সংখ্যা খুব বেশী। ব্রজবুলির অধিকাংশ শব্দ স্বরান্ত। পদকর্তারা যে ছন্দগুলিতে পদ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন—সে ছন্দগুলিতে হসন্ত শব্দ একেবারেই উপযোগী নয়, সেজন্যও তাঁহারা ব্রজবুলির আশ্রয় লইয়াছিলেন।

৩। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সমগ্র আর্যাবর্তে প্রচারিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় আর্যাবর্তেও বঙ্গীয় পদাবলী-সাহিত্য-প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। আর্যাবর্তের বহু লোকও এই সাহিত্য উপভোগের জন্য পিপাসু হইয়াছিল। সেজন্য কবিরা এমন ভাষার আশ্রয় লইলেন, যাহা আর্যাবর্তের সকল লোকেরই সহজে বোধগম্য হইতে পারে। যে অবহট্‌ঠা ব্রজবুলিতে রূপান্তরিত তাহা আর্যাবর্তের সর্বত্রই কতকটা পরিচিত।

৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসসাধনার সহায়ক একটি স্বতন্ত্র নিজস্ব ভাষা থাকে, কবিগণের সম্ভবতঃ ইহা অভিপ্রেত ছিল। সর্বজনের

উচ্ছিষ্ট লৌকিক ভাষাকে অলৌকিক রসের অভিব্যক্তিতে যথাসম্ভব বর্জনের চেষ্টা হইয়াছে।

৫। অনধিকারী প্রাকৃত জনের দ্বারা পাছে পদাবলীর মর্যাদাহানি হয় বলিয়া হয়ত কবিরা প্রাকৃত জনের ভাষা বর্জন করিয়াছেন। বিশেষতঃ সম্ভোগের বর্ণনা সর্বজনবোধ্য ভাষায় হওয়া কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। ব্রজবুলিতে যাহা আদিরসাত্মক সাহিত্য, তাহা প্রচলিত ভাষায় রচিত হইলে অশ্লীল কামলীলার বর্ণনা মাত্র বলিয়া মনে হইবে।

৬। প্রেমলীলা-বর্ণনার পক্ষে এই ললিত কোমল তরলায়িত ভাষাকে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। বিদ্যাপতির বাংলায় রূপান্তরিত পদাবলীতে মধুররসাত্মক ব্রজলীলাবর্ণনা ব্রজবুলিকে প্রেমলীলার আদর্শ ভাষা করিয়া তুলিয়াছিল। আমাদের কবিরা অন্যান্য রসোপকরণের সঙ্গে তাই বিদ্যাপতির ভাষার বঙ্গীয় রূপকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে এই ভাষায় অ-বৈষ্ণব ভাবের কবিতাও লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল কবিতার আদর হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের ব্রজবুলিতে রচিত কবিতার নাম করা যাইতে পারে। ভানুসিংহ ঠাকুরই ব্রজবুলির শেষ কবি।

৭। স্কটল্যাণ্ডের প্রাদেশিক ভাষায় রচিত Burnsএর কবিতা যেমন ইংলণ্ডের নাগরিকদের মধুর লাগে—ব্রজবুলিও তেমনি বাঙ্গালী পাঠকের মধুর লাগিত। রসিক শ্রোতাদের চাহিদাতেই বোধ হয়, এই ভাষা কবিদের আদরণীয় হইয়াছিল।

৮। দেশগত ও কালগত ব্যবধান যেমন একটা রোমান্সের সৃষ্টি করে—ভাষাগত ব্যবধানও তেমনি একটা রোমান্সের সৃষ্টি করিত।

৯। কীর্তন সঙ্গীতের রসমূর্ছনা ও সুরের অলঙ্করণের পক্ষে বাংলা অপেক্ষা ব্রজবুলি অধিকতর উপযোগী বলিয়াও বোধ হয় কবিরা ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিতেন। মোটের উপর, এই অপূর্ব ভাষাটির জন্য বঙ্গীয় কবিরা বিদ্যাপতির কাছে প্রধানতঃ ঋণী। যশোরাজ

থানের প্রদত্ত নিদর্শন প্রচার লাভ করে। বিদ্যাপতির পদাবলীই বাঙালী কবিদের ব্রজবুলিতে পদরচনায় প্রেরণা দিয়াছে—শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাব—শ্রীচৈতন্যের আগে প্রচলিত ছিল বিদ্যাপতির পদাবলী এবং কাহারও কাহারও মতে দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী। শ্রীচৈতন্যের সময় হইতে বাংলার পদাবলীর প্রকৃতপক্ষে সুত্রপাত। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর ইহার স্বর্ণযুগের আবির্ভাব হয়। শ্রীচৈতন্যের পূর্বে যাহা ছিল কুট্মল তাহাই তাঁহার পরে বহুদলে বিকসিত হইয়া উঠিল। শ্রীচৈতন্যের জীবনই ছিল একখানি মহাকাব্য, তাহাই শত শত ভাগে বিকীর্ণ হইয়া পদাবলীর রূপ ধরিল। সমগ্র বৃন্দাবনলীলা শ্রীচৈতন্যের জীবনের রঙ্গমঞ্চে নাট্যের মত অভিনীত হইয়াছিল। ফলে, শ্রীচৈতন্যদেবই ব্রজলীলাকে বাস্তব রূপ দান করেন। তিনি নিজেই এই অভিনয়ে ছিলেন রাধা। তাঁহার জীবন পূর্ববর্তী পদাবলীর কুসুমে আরোপ করিয়াছিল অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মধু ও গন্ধ এবং পরবর্তী পদাবলীর কুসুমপুঞ্জে সঞ্চার করিয়াছিল প্রাণরস, মধু, গন্ধ ও সুষমা।

শ্রীচৈতন্যকে একজন পদকর্তা মেঘের সঙ্গে উপমিত করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সত্য সত্যই এদেশে রসের বর্ষা নামাইয়াছিল। ফলে, বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে যে সোনার ফসল ফলিয়াছে—সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বর্ষা ঋতুর মত মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে, যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। শ্রীচৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা হইয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই তখন দেশে যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা ও নূতন ছন্দে, কত প্রাচুর্যে ও প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।"

বৈষ্ণবাচার্যগণ—চৈতন্যোত্তর পদকর্তারা সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণনা লাভ করিয়াছেন রূপ, সনাতন, কবিকর্ণপূর, স্বরূপ দামোদর, জীবগোস্বামী ইত্যাদি বৈষ্ণবাচার্যগণের রচনা হইতে। শ্রীচৈতন্যের সময়ে শ্রীরূপের রচনা সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছে নাই—বহু গ্রন্থ তখনও বিরচিতও হয় নাই। সেজন্য তাঁহার রচনার প্রভাব চৈতন্যের সামসময়িক পদকর্তাদের রচনায় বিশেষরূপ লক্ষিত হয় না। চৈতন্যের তিরোধানের পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বৈষ্ণব গুরুদের গ্রন্থগুলি বাংলার বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত হয়। তাহার ফলে ঐ সকল রচনার ভাবসম্পুট চৈতন্যোত্তর যুগের অর্থাৎ খেতুরীর মহাসম্মেলন যুগের পদাবলীর পুষ্টিসাধন করিয়াছে। এই বৈষ্ণব গুরুদের রসঘন শ্লোকগুলিকে যাঁহারা পদে পরিণত করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজ এবং রসকদম্ব ও গোবিন্দলীলামৃতের গ্রন্থকার যদুনন্দন দাস অগ্রগণ্য। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর চমৎকার-চন্দ্রিকাকে কতকগুলি পদে পরিণত করিয়াছেন অর্বাচীন পদকর্তারা। গৌরচন্দ্রিকার পদ রচনায় পরবর্তী পদকর্তারা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যদেবের সামসময়িক ভক্তগণের রচনা হইতে প্রেরণা ও উপাদান লাভ করিয়াছেন।

বড়ু চণ্ডীদাস—বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন শ্রীচৈতন্যের সময়ে এবং তৎপরবর্তী কালে অপরিচিত ছিল না। এই পুস্তকে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ইত্যাদির পদগুলি অমার্জিত ও রসাভাসদুষ্ট হইলেও পদকর্তাদের বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গী যোগাইয়াছিল, ইহা বলিতে পারা যায়। বিশেষতঃ কৃষ্ণকীর্তনের রাধা-বিরহেই বঙ্গভাষায় পদরচনার সূত্রপাত হইয়াছে বলিতে হইবে।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'কে না বাঁশী বায় বড়ায়ি কালিনী নই কূলে' 'যে কাহ্নু লাগিয়া মো আন নাহি চাহলা।' 'বিধি কৈল তোর মোর নেহে। একুই পরাণ দুই দেহে॥'—ইত্যাদি পদগুলিকে প্রাথমিক স্তরের শ্রেষ্ঠ পদ বলা যাইতে পারে।

কৃষ্ণকীর্তনের শ্রীকৃষ্ণ আর পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণ এক নহেন। কৃষ্ণকীর্তনের গোবিন্দ গোঁয়ারগোবিন্দ, পদাবলীর গোবিন্দ বিদগ্ধমাধব—রসিক-চূড়ামণি। তবে রাধার সম্বন্ধে কথা স্বতন্ত্র। কৃষ্ণকীর্তনের রাধা-চন্দ্রাবলীই যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অর্ধাঙ্গে পদাবলীর চন্দ্রাবলী রাধার প্রতিনায়িকাতে পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনে যাহা রিয়ালিষ্টিক পদাবলীতে তাহা আইডিয়ালাইজ্‌ড্‌ হইয়াছে। বিরহের অনলে রাধার বাস্তবতা বিগলিত হইয়া 'কালিনী নই' নীরে মিশিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনখণ্ড হইতেই রাধার রূপান্তরের সূত্রপাত হইয়াছে—কৃষ্ণকীর্তনের বিরহার্তা রাধার মুখের বচনগুলি, ব্রজবুলিতে না হোক, খাঁটি বাংলা ভাষার পদগুলিতে বিকীর্ণ হইয়া আছে। কৃষ্ণকীর্তনের দূতী জরতী বড়ায়ি। কৃষ্ণকীর্তনের বাস্তব পটভূমিকায় জরতী অসমঞ্জস নয়। পদাবলীর সৌন্দর্যঘন পটভূমিকায় বড়ায়ি অচল হইয়াছে—তাহার স্থলে আসিয়াছে বিশাখা, ললিতা, বৃন্দা ইত্যাদি তরুণী দূতী ও সখীগণ।

ভক্তিসাহিত্য—বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবি ছিলেন, বৈষ্ণব সাধক ছিলেন কিনা জানা নাই। অনেকের মতে ইনি ছিলেন পঞ্চোপাসক। তিনি কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গানই লেখেন নাই; তিনি অনেক বিষয়ে কাব্য-কবিতা লিখিয়াছিলেন। নরনারীর প্রাকৃত অনুরাগের গানও তিনি লিখিয়াছিলেন অনেক। সেগুলিতে রাধা-কৃষ্ণের নাম নাই, এমন কি বৃন্দাবনের পটভূমিকাও নাই। সেগুলিকেও সংগ্রাহকগণ বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। বাংলার পদকর্তারা প্রায় সকলেই সাধক-কবি। তাঁহারা জানিতেন—তাঁহাদের দুর্লভ কবিশক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কাহারও উদ্দেশে নিবেদন বা ব্রজলীলা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে বিনিয়োগ করা স্বধর্মচ্যুতি। তাই তাঁহাদের "কানু বিনা গীত নাই।"

প্রশ্ন—গানমধ্যে কোন্‌ গান জীবের নিজ ধর্ম?

উত্তর—রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের কর্ম। তাই তাঁহারা

তাঁহাদের দুর্লভ কবিশক্তিকে বিষয়ান্তরে নিয়োজিত করেন নাই। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যে বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাববৈচিত্র্যের দিক্ হইতে হয়ত ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু পদাবলী-সাহিত্যের তথা প্রেমগীতি-রচনার অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। গোবিন্দদাস ছিলেন একজন মহাকবি। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন শাক্ত, তাই তিনি প্রথম জীবনে হরগৌরীর স্তবও লিখিয়াছিলেন। তিনি ভক্তই ছিলেন, তিনি নিজস্ব ভক্তিধারাকে শাক্তপথ হইতে বৈষ্ণবপথে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। তিনি যদি বৈষ্ণবধর্ম আশ্রয় না করিতেন—তাহা হইলে হয়ত তাঁহার কাছ হইতে আমরা নানা বিষয়ের কবিতাও পাইতে পারিতাম। কিন্তু তিনি পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হওয়ার পর আর বিষয়ান্তর লইয়া কবিতা রচনা করেন নাই, করিলেও সে রচনার নিদর্শন আমরা পাই নাই।

তাঁহার যে অসামান্য কবিশক্তি গঙ্গার বাহন হইতে পারিত, তাহা যমুনায় অগাধ জলসঞ্চারী রোহিত হইয়াই থাকিল।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অন্যান্য শাখা হইতেও বুঝা যায়, ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একমাত্র বিষয়বস্তু ছিল। তাহা হইতেও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, বৈষ্ণব কবিরা তাঁহাদের অসাধারণ কবিশক্তি ব্রজলীলা ও গৌরলীলা ছাড়া অন্য বিষয়ে প্রয়োগ করেন নাই। বোধ হয়, ইঁহারা মনে করিতেন—এই দুই লীলা ছাড়া আর সবই অনিত্য। অনিত্য বিষয়ে কবিশক্তির প্রয়োগ শক্তির অপব্যবহার। যাহা অনিত্য, যাহা ধর্মমূলক নয়, তাহাকে আশ্রয় করিলে রচনা স্থায়ীও হইবে না। বোধ হয়, বিষয়ান্তর অর্থাৎ অনিত্য বিষয়ের চিন্তায় তাঁহারা রসও পাইতেন না। উহা হয়ত তাঁহাদের চিত্তে রসসৃষ্টির কোন প্রেরণাই দিত না। অসাধারণ কবিপ্রতিভা যে অনিত্য বস্তুকেও নিত্য বস্তুতে পরিণত করিতে পারে, হয়ত এ ধারণা তাঁহাদের ছিল না।

শব্দালঙ্কার ও প্রাণহীন অর্থালঙ্কারের আতিশয্য বহু সংস্কৃত

কাব্যকে দুষ্পাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। বৃন্দাবনলীলা, যাহা হৃদয়মাধুর্যের মহামহোৎসব, তাহাতে ঐ শ্রেণীর আলঙ্কারিক আতিশয্য আমরা প্রত্যাশা করি নাই। কিন্তু বহু পদে আমরা ক্লিষ্ট কল্পনার ও শ্লিষ্ট জল্পনার আলঙ্কারিক প্রাধান্য দেখিতে পাই। রূপবর্ণনার ত কথাই নাই—অভিসার, বিহার, মান ইত্যাদির বর্ণনাতেও আলঙ্কারিক চাতুর্যের পারিপাট্য খুব বেশি। ইহা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে বক্রোক্তি ও শ্লেষের আতিশয্য দৃষ্ট হয়। অনেক পদ স্বাধীন ভাবাবেগের বাণীরূপ নয়—রসশাস্ত্রের অনুশাসনেই পরিকল্পিত। মনে হইতে পারে যে-সকল কবি প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন না, তাঁহারাই এইভাবে আলঙ্কারিক কৃতিত্ব দেখাইতেন। কিন্তু একথাও সত্য নয়। বিদ্যাপতি, রূপ ও গোবিন্দদাসের মত ভক্ত কবিও তাঁহাদের রচনাগুলিতে আলঙ্কারিক চাতুর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে তৃণাদপি সুনীচ বৈষ্ণব ভক্তেরা এই কৃতিত্ব দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই কেন ?

ইহার একটা উত্তর আছে। ভক্ত কবিরা আলঙ্কারিক কলাচাতুর্য-সৃষ্টিকেও উপাসনা বা সাধনার অঙ্গীভূত মনে করিতেন। গায়ক-ভক্ত যেমন কলাকৌশলময় সঙ্গীতের দ্বারা, নটী-উপাসিকা বা দেবদাসী যেমন নৃত্যের দ্বারা, সুবাদক যেমন বাদ্যের দ্বারা উপাসনা করে, জগদানন্দের মত কবিরাও তেমনি ভাষা-ছন্দের মণ্ডনশিল্পের দ্বারা উপাসনা করিয়াছেন। যাহার যাহা সম্বল, যাহার যাহা শক্তি ভগবানের উদ্দেশে তাহার সমর্পণই উপাসনা। দেবতার শৃঙ্গারবেশরচনা যেমন পরিচর্যা বা উপাসনার অঙ্গ, লীলাবর্ণনায় আলঙ্কারিক চাতুর্যসৃষ্টিও তেমনি সাধক-কবিদের ছিল সাধনারই অঙ্গ। যাঁহার এই রসচাতুর্যসৃষ্টির শক্তি আছে, যাঁহার বিধিদত্ত সৌকণ্ঠ্য আছে, তিনি যদি তাহা রাধাশ্যামের সেবায় নিবেদন না করেন—তাহা হইলে সেবাপরাধ হইবে, কবিদের সম্ভবতঃ এই ধারণা ছিল।

শুধু কাব্য ও সঙ্গীত নয়, রূপ গোস্বামী যে রসশাস্ত্রের গ্রন্থ

লিখিয়াছিলেন—তাহাও তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা বলিয়াই মনে করিয়াছেন। গোস্বামী প্রভু উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ সমাপন করিয়া বলিয়াছেন—

'হে দেব, দুর্গম মহাঘোষ সাগরোৎপন্ন এই উজ্জ্বলনীলমণি আপনার মকরকুণ্ডল পরিসরে সেবকজনোচিত ভজনা করুক।'

গোস্বামী প্রভুদের অলঙ্কারকৌস্তুভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভক্তিরসামৃতশেষ ইত্যাদি অলঙ্কারের পুস্তকে প্রত্যেক দৃষ্টান্তটি রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে রচিত।

হরিনামামৃত ব্যাকরণ শুধু ব্যাকরণবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য নয়—হরিনামে দীক্ষাদানের জন্যও। হরিভক্তিপ্রচারের জন্য ও বৈষ্ণব-সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য হরিভক্তিবিলাস নামে স্মৃতিগ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। এইভাবে এই সকল বৈষ্ণবাচার্যগণ নানাবিদ্যার গ্রন্থ রচনাচ্ছলেও শ্রীকৃষ্ণেরই ভজনা করিয়াছেন।

তাঁহাদের বিবিধবিষয়ক বিদ্যা যেন ভারস্বরূপ হইয়াছিল,—চিরসুন্দরকে নিবেদন করিয়া তাঁহারা ভারমুক্ত হইয়াছেন। বিদ্যার নৈবেদ্য যেন ভক্তির তুলসীপত্রে সুবাসিত হইয়া দেবপ্রসাদরূপে ভক্তজনের আস্বাদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকাশের ভাষা—ব্রজের প্রেমলীলার গূঢ়তা ও গাঢ়তা-প্রকাশের ভাষা মানবকণ্ঠে নাই। তাই প্রাকৃত প্রেমের ভাষাতেই তাহার প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে। তাহাতে যে অনির্বচনীয় নবনবায়মান মহাপ্রেমের যথাযথ প্রকাশ হইতেছে না—তাহা কবিরা অনুভব করিয়াছেন। রচনার মধ্যেই অনুভব করা যায় তাঁহাদের প্রাণের আকুলি-বিকুলি। সোজা ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া কেহ কেহ ঠারে ঠোরে বক্রোক্তি-ব্যঞ্জনার সাহায্যে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কেহ কেহ উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক ইত্যাদি অলঙ্কারের মালা গাঁথিয়াছেন, মনে করিয়াছেন—একটি তরঙ্গ যেমন রাজহংসকে অন্য তরঙ্গের দিকে আগাইয়া দেয়, একটি অলঙ্কৃতি তেমনি ভাবটিকে অন্য অলঙ্কৃতির দিকে আগাইয়া দিবে—এইভাবে শেষ পর্যন্ত সবগুলি মিলিয়া ভাবটিকে উপলব্ধির অধিগম্য ও আস্বাদ্য করিয়া তুলিবে। আর একটি চেষ্টা অন্তর্নিহিত সুরের আবেদনের দ্বারা। প্রকাশের ভাষায় এই মিস্‌টিক সুরটি পাওয়া যায় চণ্ডীদাসের অনেকগুলি পদে। চণ্ডীদাসের ভাষার সুরই আমাদিগকে লৌকিক জগৎ হইতে লোকাতীত স্তরে লইয়া যাইতে পারে। সেইজন্যই বোধ হয়, চণ্ডীদাসের পদের সব চেয়ে বেশি আদর হইয়াছে।

পরবর্তী কবিরা দেখিলেন—সর্বজনের উচ্ছিষ্ট ভাষায় মহাপ্রেমের প্রকাশ সম্ভব নয়—তাই বোধ হয় ব্রজবুলির আশ্রয় লইলেন, তাহাতে অধিকতর ব্যঞ্জনার এবং ভাষাগত দূরত্বের দ্বারা রোমান্সের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এ ভাষা তো মর্মের গভীরতার ভাষা নয়। সেজন্য ব্রজবুলির পদগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোমান্টিক ঐশ্বর্য বহন করিয়াছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ পদগুলির মত মিস্‌টিক মাধুর্যে গহন হইতে পারে নাই। সংস্কৃতে রচিত পদগুলি রসঘন ও গাঢ়বন্ধ—

কিন্তু তাহাতে ভাষাগত ব্যবধান এতই অধিক যে ঐগুলি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে রোমান্টিক ও মিস্টিক দুই বৈভবই হারাইয়াছে। ঐগুলি কেবল বিদ্বজ্জনের মনীষার উপভোগ্য হইয়া থাকিয়া গিয়াছে, বৈষ্ণব চতুষ্পাঠীতে আস্বাদ্য হইয়াছে,—বৈষ্ণবসমাজে আরাধ্য হয় নাই।

চণ্ডীদাসের পর জ্ঞানদাস, বলরামদাস ও নরোত্তমদাস মহাপ্রেম-লীলার পক্ষে কতকটা উপযোগী ভাষা ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন। ভক্ত-কবিরা যথাযথ ভাষণের দ্বারা যাহা পারেন নাই, প্রকাশের ব্যাকুলতার দ্বারা তাহা পারিয়াছেন ব্যঞ্জনায় ও ইঙ্গনায়। মোট কথা, পাঠকের মনোভূমি পূর্ব হইতে লীলারসে পরিষিক্ত না থাকিলে কবিদের অসম্যক্ প্রকাশ পাঠকচিত্তে ভাববীজ বপন করিতে পারে না। বিশেষতঃ রাধাপ্রেম বুঝাইতে কবিদের চিরপ্রচলিত কামনাময় প্রেমের ভাষাই প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। পূর্ব হইতে পাঠকের মতি ভক্তি-গঙ্গানীরে শুচি, লীলাতত্ত্বের চন্দনে অনুলিপ্ত ও নিষ্ঠার শুচিবাসে পিহিত হইয়া না থাকিলে ঐ ভাষা তাহার অঞ্জলিতে চন্দনাক্ত গীতিপুষ্পদাম রূপে সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। এজন্যও পদাবলী-সাহিত্যকে অর্ধসৃষ্টি বলিতে হয়।

বক্রোক্তির সাহায্যে বিদ্যাপতি তাঁহার পদগুলিকে রোমান্টিক করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু বহুপদকে মিস্টিক করিয়া তুলিতে পারেন নাই। বোধ হয়, সে উদ্দেশ্যও তাঁহার ছিল না। তাঁহার শিষ্য গোবিন্দদাস বক্রোক্তি, অলঙ্কৃতি ও ভাষার পারিপাট্যের সহায়তায় মহাপ্রেমলীলাবর্ণনায় বরং অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃত শ্লোকের গাঢ়বন্ধতাকে তরলায়িত করিয়াও তিনি যে কলধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার আবেদন মূল শ্লোকের আবেদনের চেয়ে ঢের বেশী।

উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।

তদ্বাপীষু পয়স্তদীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন—
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয় বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তে'নিলঃ।

ইহার ভাবার্থ—এ দেহ পঞ্চত্ব পা'ক, আমার দেহে পঞ্চভূতের যে অংশগুলি আছে সেগুলি পঞ্চভূতে মিশিয়া যাক। তবুও বিধাতার কাছে এই বর চাই, তাহার বাপীতে আমার দেহের জলীয়াংশ, তাহার মুকুরে আমার দেহের জ্যোতিরংশ, তাহার অঙ্গনাকাশে আমার দেহের নাভসাংশ, তাহার গমন-পথে আমার দেহের মৃদংশ ও তাহার তালবৃন্তে আমার দেহের বায়বাংশ যেন মিশিয়া যায়।

ইহাতে গভীর প্রেম প্রকাশিত হইল কি? গোবিন্দদাস ইহাকে যে বাণীরূপ দিয়াছেন, তাহাতে কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন দেখা যাক।

যাহাঁ পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যে সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোউ তথি মাহ॥
এ সখি বিরহমরণ নিরদ্বন্দ্ব।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোউ তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তথি হোউ মৃদু বাত॥
যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোউ তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥

রূপের সংস্কৃত শ্লোকে যাহা আলঙ্কারিক তথ্যমাত্র, তাহা গোবিন্দদাসের পদে রসে পরিণত হইয়াছে।

গোবিন্দদাস বিরহ-মরণের নির্দ্বন্দ্বতা দেখাইয়া একটি কলিকাকে মধুগন্ধে চতুর্দশ দলে বিকসিত করিয়া তুলিয়াছেন।

আধুনিক রূপ—যেথা যেথা প্রভু অরুণ চরণে যাইবে হাঁটি।
সেথা সেথা সখি আমার অঙ্গ হউক মাটি॥
যেই সরোবরে নিতি নিতি প্রভু সিনান করে।
আমার এ দেহ হউক সলিল সে সরোবরে॥
বিরহ মরণ দ্বন্দ্ব ঘুচাতে যাক জীবন।
গোকুলচন্দ্র সাথে নবভাবে হোক মিলন॥
যেই দরপণে নিজ মুখ দেখে প্রভু আমার।
অঙ্গের জ্যোতি মোর পাক ঠাঁই মাঝারে তার॥
যেই বীজনীতে প্রভু নিজ দেহ করে ব্যজন।
তাহার মাঝারে মোর দেহ হোক মৃদু পবন॥
শ্যাম জলধর প্রভু যেথা যেথা করে বিহার।
সেথায় সেথায় হউক গগন দেহ আমার॥
আমার এ দেহ মিলায়ে এমনি পঞ্চভূতে।
নূতন করিয়া পায় যেন সেই নন্দসুতে॥
কনক গৌরি গোবিন্দদাস তোমারে ভণে।
সেই মরকততনু তোমা ছাড়ি রবে কেমনে? (ব্রজবাঁশরী)

অনির্বচনীয়তা—স্নিগ্ধ মনোভাব হইতে মহাপ্রেমের ক্রমোদ্বর্তন দেখাইবার জন্য বৈষ্ণবাচার্যগণ একটি রূপকের আশ্রয় লইয়াছেন—ইক্ষু হইতে মিছরিদানার ক্রমপরিণতি।

বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
সা শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমুখের বাণী—

সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তারে প্রেমনাম কয়॥

প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে স্নেহ মান ও প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

রাধার প্রেম ও শ্রীচৈতন্যের প্রেম—এই মহাভাব। শ্রীচৈতন্যের এই মহাভাবাবেশ যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—এই মহাভাব অনির্বচনীয়—ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পদকর্তারা এই মহাভাবের স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন—ইহা অনির্বচনীয়। কবিরা কেহ উপমার দ্বারা, কেহ অতৃপ্তির ভাষায়, কেহ প্রকাশ-ব্যাকুলতার দ্বারা আভাস দিতে চেষ্টা করিয়া ইহার অনির্বচনীয়তাই স্বীকার করিয়াছেন।

জয় জয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম অদভুত।
নিতুই নূতন প্রেম অনুরাগযুত॥

রূপের ভাষায়—

জং সববদএ উপভুজ্যমানবিব অভুত্তরুবব জেবব ভোদি।
(নিয়ত উপভুজ্যমান হইলেও অভুক্তপূর্ব বলিয়া মনে হয়)
সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।

ন কেঅলং লোওত্তরস্স বত্থুনো গাঢ়ানুরাঅস্স বি জেণ নিঅগো-অরো জণো কৃখণে কৃখণে অউরুব্বো অউরুব্বো করীঅদি।

কেবল লোকোত্তর বস্তু নয়, গাঢ় অনুরাগের ধর্মই এই—প্রিয়জনকে সম্মুখে দেখিলেই ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব অপূর্ব বলিয়া মনে হয়।
(ললিতমাধব।)

এই অনুরাগ বুঝাইবার ভাষা নাই। বিদ্যাপতির নীর ও ক্ষীরের উপমায় চাতুর্যই প্রকাশিত হইয়াছে—প্রেমের স্বরূপ প্রকাশিত হয় নাই। বিদ্যাপতি আর একস্থলে লিখিয়াছেন—

দুহুঁ রসময় তনু গুণে নাহি ওর।
লাগল দুহুঁক না ভাঙ্গল জোড়॥
কো নাহি কয়ল কতহুঁ পরকার।
দুহুঁ জন ভেদ করই নাহি পার॥

রাধাকৃষ্ণ নিত্যকাল অবিচ্ছেদ্য প্রেমে আবদ্ধ—কোন পার্থিব বাধা এই অপার্থিব মিলনের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না। ইহার বেশি ব্যঞ্জনা ইহাতে নাই।

গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

দরশনে নহত নয়ন ভরি তিরপিত
পরশনে না রহে গেয়ান।

মানসলোকে রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ নাই। বিচ্ছেদে একে অন্যের অন্তরে বিরাজ করে—'স্বপনে না হেরত আন।'

গোবিন্দদাস শেষ পর্যন্ত বলিলেন—

অমিলন মিলন দুহুঁ ভেল সমতুল
গোবিন্দদাস ভালে জান।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমে মিলন-অমিলন দুইই সমান। প্রাকৃত প্রেমের সঙ্গে মহাপ্রেমের এইখানেই প্রভেদ। কবিবল্লভ বলিয়াছেন—

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয়॥

তিলে তিলে যাহা নবনবায়িত তাহার ব্যাখ্যান কি করিয়া সম্ভব? যে প্রেম কখনও বৈচিত্র্যহীন বা পুরাতন হয় না, তাহাতে একটা তৃপ্তির ছেদ থাকিতে পারে না। তাই 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া' রাখিলেও হিয়া জুড়ায় না—জনম অবধি রূপ দেখিয়াও নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না। কবিবল্লভ এখানে লাখ লাখ যুগের কথা বলিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেম অনাদি, অনন্ত, চিরন্তন ইহাই ব্যঞ্জিত করিয়াছেন। জ্ঞানদাস লিখিয়াছেন—

আঁখে রৈয়া আঁখে নয় সদা রয় চিতে।
সে রস বিরস নয় জাগিতে ঘুমিতে॥
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধাঁধি।
তিলে কতবার দেখোঁ স্বপনসমাধি॥

ইহাতে উল্লিখিত কবিদের কথারই প্রতিধ্বনি হইয়াছে।

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।

নরনারীর হৃদয়াবেগের ভাষায় ও ভঙ্গীতে ইহার প্রকাশ দেওয়ার চেষ্টা হইলেও ইহা অমানুষিক ও অপার্থিব। ব্যতিরেক অলঙ্কারের সাহায্যে চণ্ডীদাস এই প্রেমকে ত্রিভুবনাতীত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন—

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
ভানু কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এককণা॥
কুসুমে মধুপ কহি সেহো নয় তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

যে জন সাঁতার জানে না সে যেমন পাথারে পড়িয়া আকুলি বিকুলি করে, বলরাম দাস এই প্রেমের গভীরতা বুঝাইতে তেমনি আকুলি বিকুলির ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের মুখে।

বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কল্পকাল যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিয়া তোমারে দেখি স্বপন সমান॥

দরপণ নীরস সুদূরে পরিহরি।
কিছার কমলের ফুল বটেক না করি ॥
ছি ছি শরতের চাঁদ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা ॥
যতনে আনিয়া সখি ছানিয়ে বিজলী।
অমিয়ার সাঁচে যদি রচিয়ে পুতলী ॥
রসের সায়র মাঝে করাই সিনান।
তভু তো না হয় তোমার নিছনি সমান ॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহ পরতীত।
হারাও হারাও হেন সদা করে চিত ॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নয় থির ॥

এই প্রেম অপার্থিব, লোকাতীত ও অতীন্দ্রিয়। এই ভাবে কবিরা মহাপ্রেমের আভাস দিতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া শেষ পর্যন্ত অনির্বচনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পাঠক একজনের পদ হইতে নয়, বহুজনের পদ হইতে মহাপ্রেম সম্বন্ধে একটা আভাস মাত্র পাইতে পারিবেন। যাহা সাধনার দ্বারা উপলব্ধব্য তাহা কবিদের অসম্যক্ প্রকাশ হইতে কি করিয়া পাইবেন ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লৌকিকতা—পদাবলীর কবিত্বরস পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে হইলে লীলাতত্ত্বেরও জ্ঞান থাকা চাই। পদাবলীকে সাধারণ নরনারীর প্রাকৃত প্রেমের কবিতা মনে করিয়া উপভোগ যে করা যায় না তাহা নহে। নরনারীর প্রেম-জীবনের বীজনিহিত অঙ্কুর হইতে চরম পরিণতি পর্যন্ত সমস্ত বৈচিত্র্যের এমন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বিলাস জগতের অন্য কোন প্রেমসাহিত্যে আছে কিনা জানি না। পদাবলী সর্বযুগের সর্বদেশের প্রেমিক-প্রেমিকার মর্মের গভীরতম প্রদেশের সকল অনুভূতিকে ভাষা দিয়াছে। প্রেমের এমন গভীর আর্তি, আকুলতা, আকূতি, আত্মবিস্মরণ ও আত্মবিসর্জন কোন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। যে আবেদনের সর্বজনীনতা ও অভিব্যক্তির চিরন্তনতা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ—পদাবলীতে তাহার অভাব নাই। সাহিত্যরসিকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

কিন্তু "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

আধ্যাত্মিকতা—পূর্বেই বলিয়াছি পদাবলী সাধারণ প্রেমকবিতা মাত্র নয়। ইহার একটা আধ্যাত্মিক সার্থকতা আছে। এই সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিলে পদাবলীর সাহিত্য-রসোপলব্ধি সম্পূর্ণাঙ্গ হইবে। তাহাতে ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ব্যঞ্জনাঘন স্তরে আরো এক-গ্রাম উপরে উঠিয়া যাইবে। পদাবলীর রচনার অঙ্গে সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত কোথাও নাই। ইহা থাকিলে সাধক-কবিদের মতে রসাভাস ঘটিত। আধ্যাত্মিক সার্থকতা পদাবলীর অঙ্গীভূত নয়—ব্যঙ্গীভূত। ইহা লীলাতত্ত্ব হইতে আরোপিত অথবা লীলা-তত্ত্বজ্ঞ পাঠকের মন হইতে সঞ্চারিত। তত্ত্বজ্ঞ পাঠকের কাছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা—তরুণ-তরুণীর প্রেমবিলাসমাত্র নয়, সচ্চিদানন্দেরই লীলাবিলাস।

কীর্তনসঙ্গীত ও আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত—পদাবলী-সাহিত্যে অলৌকিক ব্যঞ্জনা দিয়া গিয়াছেন শ্রীচৈতন্যদেব কীর্তনসঙ্গীতের মধ্য দিয়া। নামকীর্তন শ্রীচৈতন্যের আগেও ছিল। রসকীর্তন বা পদাবলী-কীর্তনের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার সহযোগিগণ। এই কীর্তনসঙ্গীতের অভিনব দেশকালাতীত সুর ও কাকুর আকৃতি পদাবলীকে যে লোকোত্তর ব্যঞ্জনা দান করে—তাহা আমাদের চিত্তকে এই লৌকিক জগৎ হইতে অনেক উর্ধ্বে তুলিয়া ধরে। কীর্তনসঙ্গীতের মধ্য দিয়া আমরা যদি পদাবলী উপভোগ করি, তাহা হইলে আমরা যে কবিত্বের আস্বাদ লাভ করি, তাহা সাধারণ রোমান্টিক কবিতায় পাই না। ইহা ছাড়া, কীর্তনসঙ্গীতের আবেষ্টনী, লক্ষ্য, উপলক্ষ ও গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা প্রারম্ভ—সমস্ত মিলিয়া আমাদের চিত্তে একটা আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। তাহাই পদাবলীতে সঞ্চারিত হইয়া তাহার আস্বাদ্যমানতাকে লোকাতীত করিয়া তুলে।

কীর্তনসঙ্গীত শুনিতে শুনিতে আমাদের মত অভক্ত লোকদেরও দেহে ও মনে যে সাত্ত্বিক রসের সঞ্চার হয় তাহা ব্রহ্মাস্বাদজনিত নয় বটে, তবে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরের' উন্মেষজনিত বটে।

বাচ্যাতীত ইঙ্গিত—ব্রজলীলার কোন পদের কোন অংশে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার কোন ইঙ্গিত নাই তাহাও সত্য নয়। অবশ্য রসাভাস বাঁচাইয়া যতটুকু সম্ভব ততটুকুই কোন কোন পদে আছে। অনেক সময় রচনার মধ্যে অপ্রাকৃত কিছু থাকিলে তাহা পাঠকের মনকে সাধারণতঃ বাচ্যাতীত অর্থের দিকে লইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সোনার তরী—ঘন বর্ষা—পাকা ধান—সোনার ধানে সোনার তরী বোঝাই—ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী—সোনার তরীর নিরুদ্দেশ প্রয়াণ—শূন্য নদীর কূলে ধানের অধিকারী পরিত্যক্ত। এই সকলের মধ্যে যে একটি অসাধারণতার অনুক্রম রহিয়াছে—তাহাতে পাঠকের মন বাচ্যার্থ অতিক্রম করিয়া যাইতে বাধ্য। কবি অবশ্য ইহাতেই

নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি তরীটিকে কাঠের তরী না করিয়া সোনার তরী বানাইয়াছেন। গোড়াতেই কবি সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—মনে থাকে যেন ইহা সোনার তরী, তাহাই মনে রাখিয়া ইহার অর্থ সন্ধান করিও।

পদাবলীর মধ্যে অভিসারের পদগুলিতে সংস্কৃত কবিদের অনুকৃতি থাকিলেও আমরা একটা অসাধারণ ও অপ্রাকৃত অনুক্রম পাই—অভিসারের পথকে বহু বিঘ্নবিপত্তির সমবায়ে এমনি দুর্গম এবং রাধাকে এমনই আত্মবিস্মৃতা করিয়া তোলা হইয়াছে যে, ঐ পদগুলিতে নায়কের উদ্দেশে নায়িকার চিরপ্রচলিত অভিসারের বর্ণনামাত্র মনে করিয়া আমাদের চিত্ত বিশ্রাম করিতে পারে না। এখানে যেন মনে হয় নায়ককে অসীম অনন্ত, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পূর্ণ, নিত্য এমনই একটা কিছু ভাবিলেই কবির অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা না থাকিলেও প্রত্যেক কাব্যরসিক চিত্ত এরূপ ক্ষেত্রে লোকাতীত ব্যঞ্জনার সন্ধান করিয়া পদের কবিত্বরস উপভোগ করিবে।

ভণিতায় ইঙ্গিত—পদাবলীর ভণিতাগুলি অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সংক্ষিপ্ত ২।৪টি কথায় পদকর্তারা স্পষ্টই বুঝাইয়াছেন—তাঁহারা কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অনাসক্ত বা উদাসীন বর্ণনাকারী শিল্পী নহেন—তাঁহারা ঐ লীলা নিজেরাও উপভোগ করিতেছেন, তাঁহারা লীলাসহচর বা লীলাসহচরী। তবে এ কোন্ লীলা যে লীলায় সাধক-ভক্তকবি লীলাসঙ্গীর অভিনয় করিতেছেন? ভণিতায় আভাসিত পদকর্তাদের সখীভাবই সমস্ত পদটিকে প্রাকৃত ও লৌকিক স্তর হইতে লোকাতীত স্তরে উদ্‌বর্তিত করিতেছে।

আবেষ্টনীর ইঙ্গিত—তাহা ছাড়া, বৃন্দাবনের জীবনধারা এবং পরিবেষ এমনই অপ্রাকৃত যে কোন পদের বাচ্যার্থেই পাঠকচিত্তের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইতে পারে না। রাধাকৃষ্ণের লীলাতত্ত্ব আমরা বুঝি আর না বুঝি—লীলা-ক্ষেত্রটা যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন,—সাধারণ বনও নয়, সাধারণ লোকালয়ও নয়; গোপীগণ যে সাধারণ গোয়ালিনী মাত্র

নয়—মায়াকলিত বিগ্রহ ; বংশীধ্বনিটা যে সাধারণ রাখালিয়া বাঁশীর তানমাত্র নয়—একথা মনে না আসিয়া পারে না।

যে ভাবস্বপ্নের আবেষ্টনের মধ্যে এই বৃন্দাবনী লীলা, তাহার মধ্যে মানবহৃদয় ছাড়া বাস্তব কিছু নাই, রক্তমাংসের একটা মানুষ নাই, সবই যেন মায়াবিগ্রহ। পদাবলী-পাঠকের চিত্তে এ সব কথা স্বতই আবির্ভূত হয়।

রসের ইঙ্গিত—পদাবলী-সাহিত্য প্রধানতঃ আদিরসের রচনা, কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া একটা অলৌকিক কারুণ্যধারা প্রবাহিত। যে ধামকে অবলম্বন করিয়া পদাবলী রচিত সে ধাম ত কালিদাসের অলকাপুরীর মত আনন্দধাম। সেখানে রোগ শোক দারিদ্র্য বঞ্চনা অপমান ইত্যাদি প্রাকৃত দুঃখের রেখাটিও নাই। তবে এ কারুণ্য কিসের জন্য ?

শ্রীকৃষ্ণকে সখা বলিয়া ডাকিতে যে সুবল-শ্রীদামের চোখে জল আসে, গোপালের গায়ে হাত দিলে যশোদার চোখে যে জল আসে ইহা কোন্ কারুণ্য ? বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজগোপীদের মন যে-কোন্ অজ্ঞেয় রহস্যময় বেদনায় উন্মনা হইয়া উঠে। ইহা কোন্ বেদনা ? যে কারুণ্যে রাধাশ্যাম 'দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে', 'নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানে'—সে কারুণ্য কিসের ? ভাবসম্মেলনের উল্লাসও গভীর কারুণ্যেরই নামান্তর। মাথুরের হাহাকার কি যমুনার এপার ওপার ব্যবধানটুকুর জন্য ? জনম অবধি রূপ দেখিয়াও যে নয়ন তৃপ্ত হয় না, লাখ লাখ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রাখিয়া যে হৃদয় জুড়ায় না—তাহা কোন্ অতৃপ্তির বাণী ? এ সকল প্রশ্ন পাঠকের মনে আসা স্বাভাবিক। মনে আসিলেই স্বতই মানবজীবনের চিরন্তন অপূর্ণতা, সসীমতা, অসহায়তা, অস্বস্তি ও অশক্তির বেদনার সুরই সমস্ত পদাবলীর মধ্যে আমরা শুনিতে পাই। মানবাত্মার এই বেদনাই মাথুর।

হৃদয়ে যে-কোন মধুর বৃত্তি গভীর গাঢ় ও অন্তর্গূঢ় হইলেই আমরা পূর্ণের সান্নিধ্য লাভ করি—তখনই আমরা নিজেদের অপূর্ণতা উপলব্ধি

করি। সেই উপলব্ধি যে কারুণ্যের সৃষ্টি করে, ব্রজের কারুণ্যও কি তাহাই নয়?

রূপানুরাগের ইঙ্গিত—বৈষ্ণব কবির রূপানুরাগ প্রাকৃত প্রেমের রূপানুরাগের মত নয়। যে রূপ দেখিয়া রাধা মুগ্ধ, সে রূপ কামনাময় দেহকে-ত আশ্রয় করে নাই—তাহা দেহকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বপ্রকৃতিময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে রূপ আকাশে, মেঘমালায়, বনের তমালশ্রীতে, যমুনার জলোচ্ছ্বাসে, ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের চিক্কণতায় ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্যামরূপের এই বিশ্বাত্মকতা বহু কবিতাতেই দেখা যায়। চণ্ডীদাসের রাধা বলেন—

'দিক্ নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।'

এই রূপদর্শনের অনুরাগ প্রাকৃত অনুরাগের মত নয়। এই অনুরাগের বিভাবও স্বতন্ত্র। এই অনুরাগের যে বেদনা তাহা প্রেমার্তি মাত্র নয়। প্রেমার্তির বর্ণনা আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে যথেষ্টই পড়িয়াছি। ইহার সঙ্গে সে সবের মিল হয় না। এ বেদনার কবি কালিদাস নহেন, চণ্ডীদাস। এই যে অনুরাগ ইহা একের প্রতি অনুরাগ, কিন্তু সমগ্র সংসারের প্রতি—নিজের দেহের প্রতি—নিজের জীবনের প্রতিও বিরাগ। রাধা তাই যোগিনী, মহাবৈরাগিণী। এই দিক হইতে চিন্তা করিলে পদাবলী শৃঙ্গার বা করুণরসেরই কাব্য নয়, শান্তরসের কাব্য—বৈরাগ্যেরই কাব্য। বৈরাগ্যের কাব্য বলিয়াই ইহার আধ্যাত্মিক সার্থকতা আছে। বৈরাগ্যের কাব্য বলিয়াই বৈরাগীদের দ্বারা রচিত হইয়া বৈরাগীদের উপভোগ্য হইয়া আছে।

অর্থের ইঙ্গিত—পদাবলীর কোন পদের অর্থবোধগত উপভোগ একদিনে সমাপ্ত হয় না। জীবনের দশা, প্রকৃতি ও গতি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক একটি পদের নব নব সার্থকতা আবিষ্কার করিতে পারিবেন। ঘষিতে ঘষিতে যেমন চন্দনের গন্ধের বিস্তার হয়, তেমনি প্রত্যেক উৎকৃষ্ট পদ ধীরে ধীরে পাঠকের মনে নব নব অর্থের বিস্তার করিবে। জীবনের অপরাহ্নে যখন জীবন ও ভুবন গেরুয়া

রঞ্জিত হয়—তখন সকল পাঠকের মনেই পদের শেষ অর্থখানি যে দিকে যাওয়ার কথা সেই দিকেই যাত্রা করে।

পদাবলীর আধ্যাত্মিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—যৌবনে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার উপর একটি কবিতা লেখেন—তাহার প্রথম পংক্তি 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?' প্রশ্নচ্ছলে তিনি আধ্যাত্মিকতাকেই বৈষ্ণব কবিতার মুখ্য উপজীব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াই একথা বলিয়াছিলেন—প্রাকৃত প্রেমের লীলাবিলাসরূপে ইহার গৌণ সার্থকতাও আছে।

রবীন্দ্রনাথের দুইটি পংক্তি পদাবলীর রসব্যাখ্যায় মূলসূত্রস্বরূপ এবং তাঁহারই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ ধরা যাইতে পারে :

১। দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।

২। যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পুজা।

তিনি বলিয়াছেন, ইহা 'বড় শক্ত বুঝা।' বড় শক্ত বুঝা বলিয়াই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রকৃত অর্থ আধুনিক পাঠক বুঝিতে পারে না।

যে সকল পাঠক 'বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গানকে' পদাবলীর মুখ্য উপজীব্য মনে করেন না—তাঁহাদের মনে প্রশ্ন জাগিবে—শুধু যৌবনের (বা সংসারের) তরে বৈষ্ণবের গান ?—উত্তর কিন্তু একই। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে সে তত্ত্ব এযুগের পাঠকদের অতি অল্প কথায় যেভাবে বুঝাইয়াছেন—সেভাবে কোন বৈষ্ণব গোস্বামী বুঝাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। "অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও অসীম এবং আকাশই, সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অসীম ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। মানবমনে অসীমের সার্থকতা সীমা-বন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই অসীম প্রেমের বস্তু হয়। নতুবা প্রেমাস্বাদ সম্ভবই নয়। অসীমার মধ্যে সীমাও নাই, প্রেমাও নাই। সঙ্গীহারা অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ লাভ করিতে চায়—প্রেমের জন্য। ব্রহ্মের কৃষ্ণরূপ ও রাধারূপের মধ্যে এই তত্ত্বই নিহিত। অসীম ও

সীমার মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে—সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।”)

বৈষ্ণব পদাবলীকে প্রাকৃত প্রেমের বিভিন্ন স্তরের অভিব্যক্তি মনে করিলেও সাহিত্যরস উপভোগ করা যে যায় না তাহা নয়—তবে তাহা অসম্যক্‌রূপে চর্ব্যমাণ হওয়ায় পরিপূর্ণ রসদান করে না। রসজ্ঞ পাঠকের মন তাহাতেই বিশ্রান্ত হইতে পারে না। সকল পদের না হউক, কোন কোন পদের সুর (যেমন চণ্ডীদাসের প্রধান প্রধান পদের) বাচ্যার্থ ছাড়িয়া দেশকাল উত্তরণ করিয়া উঠিয়াছে। বহু পদের ভণিতাতেও লোকোত্তর ইঙ্গিত আছে একথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহার উপর আছে লীলারসাবিষ্ট কবিমানসের সৃষ্ট অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের আবেষ্টনী। কাজেই পাঠকের চিত্ত সহজেই বাচ্যার্থ ছাড়াইয়া উঠে। এজন্য কোন পাঠক ব্রজলীলাকে রূপক, কোন পাঠক সিম্বল, কোন পাঠক অপূর্ণের পূর্ণতালাভের আকুল আগ্রহ (yearning for something afar from the sphere of our sorrow) প্রাকৃত প্রেমের ভাষায় অভিব্যক্ত বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ কবিগুরুর মত বলিবেন—“অসীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।”—এই সত্যই পদাবলীতে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। পাঠক যাহাই মনে করুন—তিনি এইগুলিতে একটি লোকোত্তর ব্যঞ্জনা না খুঁজিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না। সাহিত্য-রসবোধের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ইঁহাদের অনেকের মতে পদাবলী transcendental কাব্যসাহিত্য। এই ধরণের সুর ধ্বনিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত চরণগুলিতে—

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায় শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো যে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে
এখনো প্রেমের খেলা সারাদিন সারা বেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে।

লীলাতত্ত্ব ও তাহার দ্বারা আরোপিত আধ্যাত্মিকতা—আরো নিঃশেষ করিয়া রসসম্ভোগ করিতে হইলে অর্থাৎ উহাকে মিস্‌টিক কাব্য হিসাবে উপভোগ করিতে হইলে লীলারসের রসিক হইতে হইবে। আমাদের চিত্ত এমনি সংস্কারাচ্ছন্ন—আমাদের চেতোদর্পণ এমনই অমার্জিত যে, সহজে সে উজ্‌জ্বল রসের উজ্‌জ্বলতা তাহাতে প্রতিফলিত হয় না। এজন্য প্রথমে ভাগবতাদি ধর্মগ্রন্থের বাণীকে আপ্তবাক্যস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে—বৈষ্ণবগুরুগণের উপলব্ধ সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। এই বিশ্ব যে ব্রহ্মের সৃষ্টি (creation) বা অভিব্যক্তি (manifestation) বা বিবর্তন (evolution) নয়—ইহা যে তাঁহার লীলামাত্র, এ সত্য উপলব্ধি করা সহজ নয়। এজন্য আপ্তবাক্য বা আর্ষবাক্যে বিশ্বাস করিতে হইবে। সাধারণ পাঠক যদি transcendental কবিতা হিসাবে পদাবলীর রস উপভোগ করেন, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। এই বৈজ্ঞানিক যুগে আপ্তবাক্যনিষ্ঠতা প্রত্যাশা করা ভুল। বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যেই অনেকে উজ্‌জ্বল রসের অন্তর্নিহিত সার্থকতা ও গূঢ়রহস্য মনে প্রাণে উপলব্ধি করেন না—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যরস পর্যন্ত উপলব্ধি করেন।

মানুষ ভালবাসে, জ্ঞানলাভ করে, কাজ করে আর খেলায় মাতে। জ্ঞান, কর্ম আর প্রেম এই তিনটি বৃত্তি লইয়া তাহার সত্তা। কর্মের মূলে আছে অভাব, প্রয়োজন ও দুঃখ। যে ভগবানের এ সব কিছুই নাই, কর্মমার্গে তাঁহার সন্ধান বৃথা। জ্ঞানের পথে তাঁহার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু জ্ঞান সকল মানুষের অধিগম্য নয়। তাই জ্ঞানপথে তাঁহার সন্ধান সর্বজনীন নয়। প্রেমই সর্বদেশের সর্বযুগের সর্বস্তরের মানুষের সাধারণ জীবনধর্ম। প্রেমই মানুষকে জ্ঞানপথ হইতে আহ্বান করিয়া কর্ম হইতে বিশ্রাম দিয়া লীলায়

মাতাইতে পারে। লীলাই মানুষের অহৈতুকী আত্মাভিব্যক্তি। ভগবান্‌কে তাই ভক্তিপথের সাধকগণ প্রেমময় ও লীলাময় বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, প্রেমের বিবিধ লীলার মধ্য দিয়াই তাঁহার সান্নিধ্যলাভ ঘটিতে পারে। বৈষ্ণব ভক্ত ও কবিগণ তাই প্রেমলীলার রস উপভোগ করাই সাধনভজন মনে করিয়াছেন।

এই বিশ্ব লীলাময় ভগবানের লীলাবিলাস। কিন্তু লীলার রস পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্য তিনি সসীমকে আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ নরদেহ ধারণ করিয়াছেন। হইতে পারেন তিনি বিশ্বম্ভর, হইতে পারেন তিনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তিনি যখন একবার লীলায় নামিয়াছেন এবং আমাদের লীলায় ডাক দিয়াছেন—তখন তাঁহার ঐশ্বর্য বা ভগবত্তা কেন স্বীকার করিব ? তাঁহাকে ভয়ই বা করিব কেন ? পাছে অপরাধ হয় এই ভাবিয়া কুণ্ঠাই বা প্রকাশ করিব কেন ? তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের সঙ্কোচই বা কী ? খেলার সাথী যেই হউক তাহার সঙ্গে আমাদের যে আচরণ সেই আচরণই তাঁহার প্রাপ্য। তিনি ইহাতে রাগ করিতে পারেন না—তাহা হইলে তিনি লীলাময় নহেন—ছলনাময়। নিজের ভগবত্তা তাঁহাকে ভুলিতে হইবে। বৈষ্ণব ভক্তগণ বলেন, বৃন্দাবনলীলায় তিনি সেই ভগবত্তা ভুলিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ভগবত্তা ভোলা আর লীলায় মাতার গানই পদাবলী।

রবীন্দ্রনাথ ও লীলাতত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

১। আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাইত আমি এসেছি এই ভবে।

২। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।
তাইত তুমি রাজার রাজা হ'য়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি'
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে
প্রভু নিত্য আছ জাগি।

৩। দয়া ক'রে ইচ্ছা ক'রে
আপনি ছোট হয়ে,
এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।
তাই তোমার মাধুর্য-সুধা
ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা
জলে স্থলে দাও যে ধরা কত আকার ল'য়ে॥
বন্ধু হয়ে পিতা হয়ে জননী হয়ে
আপনি তুমি ছোট হয়ে এস হৃদয়ে।

এই সকল গানে রবীন্দ্রনাথ ভগবান্‌কে লীলাময় রূপেই কল্পনা করিয়াছেন—ইহা বৈষ্ণব-রসতত্ত্ব-সম্মত, কিন্তু সেইসঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন—

আমিও কি আপন হাতে করব ছোট বিশ্বনাথে?
জানাব আর জানব তোমায় ক্ষুদ্র পরিচয়ে?

এই উক্তি লীলাতত্ত্বের সহিত সমঞ্জস হয় না। লীলাময়ের সঙ্গে শান্ত বা দাস্য ভাবে পরিচয় উচ্চাঙ্গের ভক্তির কথা নয়। বৈষ্ণব সাধক বলিবেন—তিনি যদি লীলার জন্যই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার লীলাসঙ্গী বা সঙ্গিনী হওয়াই ত তাঁহার পক্ষে পরম প্রীতিকর। লীলায় যোগ না দিলে তাঁহার সঙ্গে সংযোগ কি করিয়া সম্ভব? তিনি আসিলেন খেলা খেলিতে, আমি কি তাঁহার খেলায় যোগ না দিয়া ফুলচন্দন দিয়া তাঁহার পূজা করিতে থাকিব অথবা জোড়হাতে দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্তব করিব? তাঁহার লীলায় যোগ দেওয়া এবং সেই লীলা উপভোগ করা ছাড়া আমার করিবার কি আছে? আমাকেও ভুলিতে হইবে যে তিনি ত্রিভুবনেশ্বর। লীলার রঙ্গভূমে আবার ছোট বড় কি?

শেখরের পদে সখী রাধাকে বলিয়াছেন 'মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর।' এই রাধার মতোই পাটাবুকো এই পদকর্তারা।

ভগবানের সঙ্গে আচরণে ব্যবধান জয় করিবার এত সাহস আর কোন কবি, কোন ভক্ত কি দেখাইতে পারিয়াছেন ?

সাহসের সহিত এই ব্যবধানটা জয় করাই উচ্চতর বৈষ্ণব সাধনা। পদকর্তারা সকলেই লীলাসঙ্গী। তাঁহারা তাঁহাদের পদাবলীর রসসঙ্কেতের দ্বারা আমাদিগকেও লীলাসঙ্গী হইতে আহ্বান করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ আর একটি গানে বলিয়াছেন—

সুরের ঘোরে আপনারে যাই ভুলে
বন্ধু বলি ডাকি মোর প্রভুকে।

সুরের ঘোর কাটিয়া গেলেই বন্ধু আবার প্রভু হইয়া যান। কবি-সখা হইয়া পড়েন দাস। বৈষ্ণব কবিদের এই সুরের ঘোর একেবারেই কোনদিন কাটে নাই, তাই তাঁহাদের প্রভু চিরদিনই সখাই থাকিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ লীলাময়ের লীলায় ভক্তের দাস্যভাবের কথাই বলিয়াছেন। এই দাস্যভাবই আমাদের সংস্কারগত ভাব। এই ভাবকে ত্যাগ করা কঠিন। সেজন্য বৈষ্ণব সাধকগণ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের মধ্যেও এই দাস্যভাব নিগূহিত আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার সেবা-পরিচর্যা করিতেই স্বতই ইচ্ছা হয়। ব্রজের সখারা কাঁধেও চড়িয়াছেন, আবার দাসত্বও করিয়াছেন। সখীরা যৎপরোনাস্তি তিরস্কারও করিয়াছেন, আবার সেবাও করিয়াছেন। পদকর্তারা সখীস্থানীয় হইয়াও অনেক ভণিতায় দাস্যভাব প্রকাশ করিয়াছেন। নিজেদের নামের সঙ্গে দাস শব্দ যোগ করিয়াও দাস্যভাবকে স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীরাধা বলিতেছেন—

কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি কহে যবে প্রাণেশ্বরী
মোর হয় দাসী অভিমান।

—চৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীরাধা যখন উপেক্ষিতা হইয়াছেন, অনুতপ্তা হইয়াছেন, বিরহাতুরা হইয়াছেন, শরণাগতা হইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রেমমাধুর্যের নিম্নতলস্থ দাসীভাব জাগিয়া উঠিয়াছে।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

শ্রীকৃষ্ণ নিজেও শ্রীমতীর প্রতি দাস্যভাব নিবেদন করিয়া বলিতেছেন—

কিশোরীর দাস আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার,
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে
বিফল ভজন তার।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উত্তমা ভক্তির লক্ষণ এই—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।

কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

চতুর্বর্গ লব্ধ হয় বেদাচারে ক্রমে,
রসময় সেবা ছাড়া মিলে না পঞ্চমে।

বৈষ্ণব সাধকগণ দাস্যভাবকে অস্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে উচ্চতর ভাব সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই ভাবগুলির মধ্যে দাস্যভাব নিগূহিত আছে। বৈষ্ণব কবিরা শ্রীকৃষ্ণরাধার লীলাসঙ্গী, সেজন্য তাঁহাদের ভাব প্রধানতঃ সখ্যভাব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভক্তিমার্গে ভিন্ন ভিন্ন রসস্তর—আমরা সাধারণ মানুষ ভয়ে ভক্তি করি, আমরা যাঁহার কৃপা প্রার্থনা করি তাঁহাকে ভক্তি করি, যাঁহার অনুগ্রহ আমরা পাই কৃতজ্ঞতাবশেও তাঁহাকে ভক্তি করি। বৈষ্ণব সাধনায় কোন প্রার্থনা নাই, কোন কৃপালাভের প্রশ্নই উঠে না, এমন কি মোক্ষ পর্যন্ত প্রার্থনীয় নয়—'মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।' ভুক্তিবাঞ্ছার মত মুক্তিবাঞ্ছাও পরিত্যাজ্য। কাজেই ভয়মিশ্রা ভক্তি, কৃতজ্ঞতামূলক ভক্তি, সকাম ভক্তি, মোক্ষমূলা ভক্তি ইত্যাদির স্থান বৈষ্ণব পদাবলীতে নাই।

আমরা যাঁহার মাহাত্ম্যে বা ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হই, বিনা প্রয়োজনেও আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি, তাঁহার উপাসনা করি। ইহাই শান্ত-ভাবের উপাসনা। ঐশ্বর্যবোধ ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে, ইহাতে উপাস্য আত্মার আত্মীয় হইয়া উঠিতেছেন না। কাজেই, ইহা পুরুষোত্তমে অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তি নয়। ভক্ত-ভগবানের এই সম্বন্ধে ভগবান্‌কে লীলাময় বলিয়া স্বীকার করা হয় না। এই ভক্তির স্থান পদাবলীতে নাই।

দাস্যভাবে উপাস্যের সেবা করিয়া আমরা আনন্দ পাই—এই আনন্দই পুরস্কার। অন্য কিছু প্রার্থনীয় নাই। এই দাস্যভাবকে বৈষ্ণব সাধক একপ্রকার প্রেম বলিয়া স্বীকার করেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ বৈষ্ণব এই ভাবেরই উপাসক। মন্দিরে মন্দিরে দেবসেবার মধ্য দিয়া এই ভাবই প্রকটিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তিসাধনায় ইহাও নিম্নস্তরের হইলেও প্রেমই। তবে, ইহাতে ঐশ্বর্যবোধের ব্যবধান রহিয়াছে, ঐশ্বর্যবোধে রাগোদয়ের সঙ্কোচন হয়। পদাবলীতে এই ভাবের স্বতন্ত্র স্থান নাই। কিন্তু উচ্চতর স্তরের প্রেমের মধ্যে এই ভাব নিগূহিত আছে। ঐশ্বর্যবোধ তিরোহিত হয় সখ্যভাবে, ভ্রাতৃভাবে

বা সন্তানভাবে ভজনায়। ব্রজজনের ভাব এই সখ্যভাব বা বাৎসল্য-ভাব। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ,
তাঁরে ঈশ্বর করি না মানে ব্রজজন।
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে,
কেহ সখাজ্ঞানে জিনি চড়ে তাঁর কান্ধে।

এই দুইটি ভাব পদাবলীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সবচেয়ে প্রশস্ত স্থান অধিকার করিয়াছে মধুরভাব। উপাস্যকে পতিভাবে নয়, দয়িতবল্লভ বা প্রেমাস্পদভাবে ভজনা করিয়া আত্মবিস্মরণ ও আত্মসমর্পণই এই ভাব। এই ভাবেরও দুইটি স্তর, একটি মোদনাখ্য—যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চন্দ্রাবলীর মনোভাব—আর একটি মাদনাখ্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার মনোভাব। এই ভাবে ঐশ্বর্যবোধ নিশ্চিহ্নভাবে বিলুপ্ত। দয়িতের সঙ্গে কোন ব্যবধানই নাই। ইহাতে 'না সো রমণ না হাম রমণী—নাসৌ রমণো নাহং রমণীতি' ভাবই এই মহাপ্রেমের সারকথা। কবিকর্ণপূর শ্রীরাধার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ
মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমপি নৌ ধীরপি হতা।

এই ভাবের লীলার চূড়ান্ত দেখানো হইয়াছে জয়দেবের 'দেহিপদ-পল্লবমুদারম্' এই বাণীতে।

এইভাবে ভজনের নাম রাগানুগমার্গের ভজন। চৈতন্যদেব এই ভাবকে জীবনে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—তাঁহার জীবনে ইহার সব লক্ষণগুলি প্রকট হইয়াছিল। ইহা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়—অন্যের পক্ষে ইহাকেই চূড়ান্ত আদর্শ মনে করিয়া সাধনপথে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া জীবনে উপলব্ধির প্রয়াসের নাম রাগানুগা ভক্তির সাধনা। পদাবলীই এই ভজনের তন্ত্রমন্ত্র। পদাবলীর কবিরা

রাধার সখী, সহচরী বা দূতীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া সাধনা করিয়াছেন। এই সাধনার বাঙ্ময় রূপ পদাবলী।

উপরে যে সকল রসের কথা বলা হইল, তাহাদের মধ্যে শান্তরসের সাধনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাধনার অঙ্গীভূত নয়। এই সাধনা রামানুজ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের। এই সাধনার উপাস্য দ্বিভুজ মুরলীধারী নহেন, চতুর্ভুর্জ গদাচক্রধারী বিষ্ণু। বিদ্যাপতির এই ভাবের পদ আছে। অন্যান্য কবিরও প্রার্থনার পদ আছে,—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে। সেগুলি শান্ত ও দাস্যভাব মিশ্রিত।

সখীভাব—রাধার সখীদের ভাবকে কি নামে অভিহিত করা যাইবে? কোন কোন লীলায় সখীরা দাসীত্ব করিতেছে, কোন কোন লীলায় ইহারা রাধাকৃষ্ণের নর্মসখী, আবার কোন কোন লীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইহাদের কান্তাভাব।

সখীর কৃত্য সম্বন্ধে রসশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা।
অভিসারো দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণসমর্পণম্ ॥
নর্মাশ্বাসনং পথ্যঞ্চ হৃদয়োদ্‌ঘাটপাটবম্।
ছিদ্রসংবৃতিরেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা ॥
শিক্ষাসংগমনকালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ।
তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা ॥
নায়িকাপ্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়াঃ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন ॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হইতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥

সখীদের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা নয়, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা, অতএব ইহা কাম নয়, প্রেমই। কিন্তু সখীদের ভাবকে পুরা কান্তাভাব বলা যায় না। ইহা দাস্যভাবও নয়। 'তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ' দাস্য-ভাবের বিরোধী। অতএব ইহাকে সখ্যভাবই বলিতে হয়। সখাদের ভাবও সখ্যভাব—সখীদের ভাবও সখ্যভাব। তবে সখীদের ভাব সখাদের ভাবের চেয়ে ঢের বেশী উচ্চে অবস্থিত। সখীভাব যেন কান্তাভাব ও সখ্যভাবের মাঝামাঝি স্তর।

প্রতিবাৎসল্য রস—আর একটি ভাবের কথা পদাবলীতে একেবারে স্থান পায় নাই—তাহা মাতৃভাব ও পিতৃভাব—এক কথায় প্রতিবাৎসল্যভাব। শাক্ত পদাবলীতে মহামায়াকে মাতৃভাবে ভজনার কথা দেখা যায়। রাধাসুন্দরীকে কখনও কোন কবি মা রাধা বলিয়া কল্পনা করেন নাই বা শ্রীকৃষ্ণকে 'হে পিতঃ' বলিয়া আহ্বান করেন নাই। জগদম্বার স্বামী হিসাবে মহাদেব আমাদের দেশে পিতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। নতুবা পিতৃভাবে ভজনার কথা আমাদের কোন সাহিত্যেই নাই। বাংলাসাহিত্যে শিবের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধটা নাতি-ঠাকুরদাদা সম্বন্ধের মত। খৃষ্টধর্মের অনুসরণে ব্রাহ্মসমাজে ভগবান্ পিতৃত্ব লাভ করিয়াছেন—কিন্তু বাৎসল্য লাভ করেন নাই। বৈষ্ণব জগতে ইহার কোন স্থান নাই। ভ্রাতৃভাব সখ্য ও বাৎসল্য-ভাবের মিশ্রণ—ইহা বলরাম-চরিত্রে দৃষ্ট হয়।

পদাবলীর রসানুগত বিভাগ—পদাবলীকে রসের দিক্ হইতে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ বাৎসল্যরসের পদ, সখ্যরসের পদ ও মধুররসের পদ। এইগুলি ছাড়া, কতকগুলি প্রার্থনার পদ আছে। আর কতকগুলি পদ আছে সেগুলির সহিত হয় বৃন্দাবনী প্রকৃতির, নয় ত বৃন্দাবনবাসীদের সম্বন্ধ। এইগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতোক্ত বিবিধ লীলার কথা বলা হইয়াছে। মধুররসের পদাবলীই কবিত্বরসে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আসল পদাবলী বলিলে মধুররসের পদাবলীই বুঝায়।

মধুররসের পদাবলী পূর্বরাগ, অভিসার, মান, রসোদ্গার, আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি বিবিধ প্রকরণ শাখায় বিভক্ত। শ্রীরাধাকে মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা ইত্যাদি বিবিধ ধরণের নায়িকারূপে পরিকল্পনা করিয়া পদাবলী রচিত হইয়াছে—অতএব নায়িকাভেদেও পদাবলীর একটা বিভাগ ঘটিয়া যায়।

// **গৌরপদাবলী**—রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার পদের অনুকরণে গৌরলীলার পদাবলী রচিত হইয়াছে। গৌরলীলার পদাবলী লইয়া এ পুস্তকে আলোচনার স্থান নাই। গৌরলীলার পদরচনা মুরারি গুপ্ত, নরহরি, বাসু ঘোষ, নয়নানন্দ ইত্যাদি গৌরাঙ্গের সমসাময়িক কবি হইতে আরব্ধ হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর গৌরলীলার পদ বহুল পরিমাণে রচিত হইয়াছে। কবিত্বের দিক্ হইতে বিচার করিতে হইলে চৈতন্যোত্তর কবিদের গৌরলীলার পদগুলিই চমৎকার। বলা বাহুল্য, কীর্তনসঙ্গীতের ক্রমোৎকর্ষের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। গৌরলীলার পদগুলি বিবিধ শ্রেণীর :—

(১) শ্রীচৈতন্যের রূপ ও মহিমার বর্ণনা ;
(২) শ্রীচৈতন্যের লৌকিক জীবন, সন্ন্যাস ও নামকীর্তনের বর্ণনা ;
(৩) নদীয়া-নাগরীভাবকে আশ্রয় করিয়া রচিত পদাবলী ;
(৪) ব্রজের বিবিধ লীলারঙ্গের প্রকরণ অনুসরণে রচিত পদাবলী ;
(৫) শচীমাতার বাৎসল্য ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ অবলম্বনে রচিত পদাবলী ;
(৬) শ্রীচৈতন্যের সহচরগণের উদ্দেশে ও সম্বন্ধে রচিত পদাবলী।

এইগুলির মধ্যে প্রধানতঃ প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদাবলী ব্রজ-পদাবলীর সঙ্গে স্থান পাইয়াছে গৌরচন্দ্রিকারূপে। পদাবলীর

প্রকরণ-বিভাগ কীর্তনসঙ্গীতের জন্য পরিকল্পিত। প্রত্যেক প্রকরণের বাছাই-করা কতকগুলি করিয়া পদ লইয়া কীর্তনের এক-একটি পালা রচিত হইয়াছে। পূর্বরাগ, মান, মাথুর ইত্যাদিকে এক-একটি লীলা বলা হয়। এক-একটি লীলা অবলম্বনে বিন্যস্ত এক-একটি প্রকরণের পদাবলীর বিবিধ সুরতালের সহিত গাওয়াই লীলাকীর্তন।

গৌরচন্দ্রিকা—প্রত্যেক লীলা-প্রকরণের প্রারম্ভে তদ্‌ভাবানুগ গৌরচন্দ্রিকা সংযুক্ত হইয়াছে এবং কীর্তনের প্রারম্ভেই গীত হয়। শ্রীমতীর যে ভাবটিকে আশ্রয় করিয়া লীলাবিশেষের পদ সংকলিত হইয়াছে—শ্রীচৈতন্যের জীবনে ঠিক সেই ভাবের বিলাস যে পদে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে—সেই পদই ঐ ভাবপ্রকরণের গৌরচন্দ্রিকা হইয়াছে। গৌরচন্দ্রিকা শ্রবণ করিলেই বুঝা যায় কোন্ লীলাপ্রকরণের কীর্তন গাওয়া হইবে। ব্রজলীলার সঙ্গে ভাবসাম্য রক্ষা করিবার জন্য যে অনেক পদ যে কবিরা চেষ্টা করিয়া লিখিয়াছেন তাহা বুঝা যায়। সেজন্য বহু অস্বাভাবিক ভাবও গৌরাঙ্গের জীবনে আরোপিত হইয়াছে। বিবিধ রসের ও ভাবের কীর্তনগানের চাহিদাতেই বিবিধ রস ও ভাবের গৌরপদাবলী রচিত হইয়াছে। কীর্তনের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গেই গৌরপদাবলীর সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে। নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, পরবর্তী যুগে লোচনদাস চৈতন্যের রসজীবনে রাধা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ-ভাবেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। সেজন্য ব্রজগোপীদের ভাবে নদীয়া-নাগরীদের বিভাবিতা কল্পনা করিয়া বহু রাগরসের পদ তাঁহারা রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা কেবল চৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিতেন না—নদীয়াকে নব-বৃন্দাবন মনে করিতেন।

বাসু ঘোষ শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবের পদও রচনা করিয়াছিলেন অনেক। এইগুলিও গৌরচন্দ্রিকারূপে গৃহীত হইয়াছে। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"গৌরচন্দ্রিকা গান করিবার পদ্ধতি শ্রীচৈতন্যের সময়ে বর্তমান ছিল না। শ্রীচৈতন্য লীলাকীর্তনের প্রবর্তক হইলেও কীর্তনসঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি হয় তাঁহার তিরোধানের পরে। কীর্তনগানের

শ্রীবৃদ্ধির সহিত গৌরচন্দ্রিকার সমাদর বাড়িয়া যায়।" খগেনবাবু আরও বলিয়াছেন—"রাগরাগিণীর কলাকৌশল দেখাইবার পক্ষে গৌরচন্দ্রিকাই প্রশস্ত।"

কীর্তনগানের আগে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার সার্থকতা একাধিক। একটি সার্থকতা এই—রাধাকৃষ্ণের লীলাসঙ্গীতে কোথাও ঐশ্বর্য আরোপিত হয় নাই, তাহাতে এই সঙ্গীতকে প্রাকৃত প্রণয়ের লালসা-মূলক সঙ্গীত মনে হইতে পারে। গৌরচন্দ্রিকা উদ্‌গীত হইয়া প্রথমতঃ একটা আধ্যাত্মিক পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করে। তাহাই মূল রাগলীলা-সঙ্গীতকে একটা mystic interpretation দান করে। শ্রোতা শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তজীবনের লীলাবিলাসকেই বৃন্দাবনলীলায় রূপে-রসে পরিমূর্ত ভাবিতে পারে। বলা বাহুল্য, কীর্তনগানের নিজস্ব কলাসৌষ্ঠব ও সুরের mystic appealও ইহার সহায়তা করে। শ্রীকৃষ্ণই যে গৌরাঙ্গরূপে অভিনব লীলা করিয়াছেন লীলাগানের অনুরূপ গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা সকলকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। ব্রজলীলার রস যিনি নিজের জীবনে পরিপূর্ণ-ভাবে উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারই ভাবে শ্রোতৃগণকে তন্ময় ও বিভাবিত করাও ইহার উদ্দেশ্য। গৌরাঙ্গদেবকে স্মরণ করিলে চেতোদর্পণ মার্জিত হয়, তাহার ফলে স্বচ্ছ নির্মল চিত্তে ব্রজলীলার প্রকৃত স্বরূপটি প্রতিফলিত হইতে পারে। রায় রামানন্দের কথায় গৌরচন্দ্রিকা ব্রজলীলার পরমান্নে একবিন্দু কর্পূরের কাজ করে। এই একবিন্দু কর্পূরে সমগ্র লীলার মাধুরীসম্পুটই সুবাসিত হয়।

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলার চমৎকারিত্ব যেরূপভাবে আস্বাদন করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ করেন নাই। বস্তুতঃ সেই নিখিল রসমাধুরী-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নিজ রসমাধুর্য নিজেই আস্বাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারই অনুগত হইয়া রসাস্বাদন করিবার যে প্রতিজ্ঞা গায়ক ও ভক্তগণ করেন, তাহা তত্ত্বের দিক্ দিয়া ও রসের দিক্ দিয়া সর্বথা

যোগ্য বলিয়া মনে হয়। তারপর কৃষ্ণলীলা গান করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক। শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে স্মরণ করিলে হৃদয় নির্মল হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই কীর্তনের অধিদেবতা। সেইজন্যও মহাপ্রভুর নাম ব্যতীত যে কীর্তন হয়, তাহা বিবেকী শ্রোতৃসমাজে গ্রহণীয় নয়। প্রতিমা বহুমূল্য মণিমরকতে নির্মিত হইতে পারে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করিলে যেমন তাহার পূজা হয় না তেমনি গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা প্রস্তাবনা না করিয়া কীর্তনগান করিতে নাই।"

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন—

"অন্য সমস্ত কারণ ছাড়িয়া দিলেও শুধু কৃতজ্ঞতার দিক্ দিয়া গৌরচন্দ্রিকার আদর হওয়া উচিত। বাঙ্গালী অকৃতজ্ঞ নহে। তাহারা অন্যের সম্পত্তি ব্যবহার করিতে হইলে তাহার নাম করিতে ভুলে না। সুতরাং যে করুণাবতার কীর্তনের ভাগীরথী সারা বঙ্গে আনয়ন করিয়া এদেশ ধন্য করিয়াছিলেন, কীর্তনের প্রারম্ভে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী দু-ফোঁটা চোখের জল কেন-না ফেলিবে?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরকীয়াবাদ ও লৌকিক বিচার—লৌকিক সমাজনীতির আদর্শে পদাবলীর মধুররসের বিচার করিতে গেলে রসাভাস হইবে। রাধা-চন্দ্রাবলী ও ব্রজগোপীগণ পরোঢ়া বা পরকীয়া। তাহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় সামাজিক আদর্শের বিচারে দূষণীয়। মনে রাখিতে হইবে—এ শ্রীকৃষ্ণ কোন লৌকিক জগতের পুরুষ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—রাধা-তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তি। মানস বৃন্দাবনে ভগবান্ প্রেমলীলা আস্বাদনের জন্য দ্বিভুজ মুরলীধর হইয়া অবতীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন নিত্য। আর বিবাহ একটা সামাজিক সংস্কার মাত্র। ঐ নিত্যমিলন কোন সামাজিক সংস্কারের অধীন নয়। প্রাকৃত-জগতের অনুশাসন অপ্রাকৃত-বৃন্দাবনে প্রয়োগ করা চলে না।

রূপ গোস্বামী পরকীয়াবাদের সঙ্গে সামাজিক সংস্কারের একটা সন্ধি করিতে চাহিয়াছেন। তিনি তাঁহার নাটকে রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দিয়াছেন। আবার তিনি শ্রীরাধার পরকীয়া অভিমান ও স্বকীয়াত্ব-বিস্মৃতিকে যোগমায়াকৃত প্রতিভাস বলিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন—উপপতিত্ব সংস্কার প্রাকৃত নায়কের পক্ষেই খাটে।

ন কৃষ্ণে রসনির্যাসস্বাদার্থমবতারিণি।

আত্মানন্দ আস্বাদনের জন্য অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা প্রযোজ্য নয়। কবিরাজ গোস্বামী রূপ গোস্বামীর অনুবর্তিতায় যোগমায়ার দোহাই দিয়া বলিয়াছেন—

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥

প্রকট লীলায় যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণে গোপীগণের উপপতি ভাবের মায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রজবধূদের পরবধূত্ব অপবাদমাত্র, বাস্তব নয়। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥

পরকীয়াবোধ না হইলে অতি রসের উল্লাস বা মহাভাবের পরাকাষ্ঠা সম্ভব নয়। কবিত্বের দিক হইতে অনায়াসে বলা যায়—

পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
কাব্য বিনা অন্যত্র ঘটায় রসাভাস॥

রুদ্রট ইত্যাদি আলংকারিকরা একথা স্বীকার করেন। জীব গোস্বামী বলেন—অপ্রকট ব্রজধামে এই মহাভাবের পরাকাষ্ঠা স্বকীয়াতে অস্বাভাবিক নয়। ইনিও যোগমায়ার দোহাই দিয়াছেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন,

একাত্মনীহ রসপূর্ণতমেঽত্যগাধে
একাসুসংগ্রথিতমেব তনুদ্বয়ং নৌ।
কস্মিংশ্চিদেক-সরসীব চকাশদেক
নালোত্থমব্জযুগলং খলু নীল-পীতম্॥

রাধাকৃষ্ণ এক মৃণাল হইতে সমুদ্গত একটি নীল একটি পীত পদ্মের মত নিত্যমিলিত। রাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলনের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ইহা একটি উপমা।

প্রকৃতপক্ষে রাধাকৃষ্ণ একাত্মক, লীলার মধ্য দিয়া অদ্বৈতের দ্বৈতভাব কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। দ্বৈতভাবে দুই শরীরে রূপ ধারণ না করিলে লীলা হয় না। দ্বৈতভাবকে সুপ্রকট করিবার উদ্দেশ্যে কল্পিত ব্যবধানকে দূরতর করিবার জন্যই দুইয়ের মধ্যে বৈবাহিক সংস্কারের অভাব পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

কবি বলিয়াছেন—"অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ।" অসীম অনন্ত ভগবান্ সীমার মধ্যে অর্থাৎ মানুষের জীবনকে আশ্রয় করিয়া

আত্মানন্দ উপভোগ করেন। অসীমকে যেমন সীমার ভাষায় ব্যক্ত করা হয়—দিব্যানন্দকেও তেমনি মানবিক ও দৈহিক আনন্দের ভাষায় পদাবলীতে ব্যঞ্জনাগর্ভ রূপ দান করা হইয়াছে।

পরকীয়াবাদ অনির্বচনীয়কে সঙ্কেত, ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনার দ্বারা অধিগম্য করিয়া তুলিবার প্রয়াস। "সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে হারা।" অসীমের মধ্যে হারা হইবার জন্য সসীমের যে স্বতঃসিদ্ধ পিপাসা ও ব্যাকুলতা (yearning) তাহাই পূর্বরাগ, অভিসার ও বিরহের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।* সাধকের এই পিপাসা ও ব্যাকুলতা এতই গাঢ়, গূঢ় ও তীব্র যে নির্বাধ স্বকীয়া প্রেমের ভাষায় ব্যক্ত হয় না বলিয়াই পরকীয়া প্রেমের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"আমরা যাহাকে ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার অন্য নাম ভালবাসা। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই তত্ত্বটি নিহিত আছে। বৈষ্ণবধর্ম সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা তাহার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না—সমস্ত হৃদয় মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ মানবাঙ্কুরটিকে বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না—তখন সে আপনার সন্তানের মধ্যে ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে—প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে—তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করে।"

* অসীমেরও সীমার জন্য ব্যাকুলতা কম নয়। (অভিসার দেখ); কেবল অসীম বলিয়াই তাহার সীমাবিরহ ঐকান্তিক নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের মাথুর বিরহের পদ নাই, কিন্তু ভাবসম্মিলনের আগ্রহের পদ আছে।

এখানে রবীন্দ্রনাথ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের মধ্য দিয়া অনন্তের উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন। পতিপত্নী কথাটা ব্যবহার না করিয়া কবিগুরু প্রিয়তম-প্রিয়তমা কথা ব্যবহার করিয়াছেন কেন তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। যে ভালবাসায় আনন্দের অবধি পাওয়া যায় না, যে ভালবাসার গভীরতায় থাই পাওয়া যায় না, যে ভালবাসায় আত্মদানের অন্ত নাই, সেই ভালবাসাতেই অশেষ, অগাধ, অনন্ত বা অসীমের উপলব্ধি মিলে। তাহাই যদি হয় তবে ভালবাসার বিবিধ প্রবাহের মধ্যে নিবিড়তম, গভীরতম প্রবাহ কোন্‌টি যাহাতে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি ঘটে, যাহাতে থাই না পাইয়া নরনারী একেবারে অনন্তের মধ্যে তলাইয়া যায়? বৈষ্ণব কবিরা বলেন, দুর্লভ প্রিয়তমের জন্য দুর্লভা প্রিয়তমার প্রেম,—সংস্কারমুক্ত মনে বিচার করিয়া দেখিলে পরপুরুষের প্রতি কুলবতীর প্রেম। এই প্রেমই Symbolised হইয়াছে দেশকালাতীত অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের পরকীয়া-প্রেমে। বলা বাহুল্য, অনন্তের উপলব্ধির জন্য যেমন কোন মাতাকে আহ্বান করা হইতেছে না তাহার সন্তানকে ভালবাসিতে, তেমনি কোন কুলনারীকে আহ্বান করা হইতেছে না বা উৎসাহিত করা হইতেছে না পরপুরুষের প্রতি অনুরাগের জন্য। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের মধ্য দিয়া অনন্তকেই উপলব্ধি করিবার জন্যই বৈষ্ণব কবিরা আহ্বান করিয়াছেন সকল পুরুষ ও নারীকে। বৈষ্ণবাচার্যেরা বলেন—

যাকে শুকমুনি
ভাগবতে পরকীয়া বলিলা আপনি।
ইহা ভাবি মঙ্গল ইচ্ছিবা যেইজন।
ভক্তাচার করুন ন তু কৃষ্ণের আচরণ॥

বাধাবিঘ্নসংস্কারের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি হইতে বিমুক্ত হওয়ায় লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের অনুবর্তিনী অদুর্লভা স্বকীয়া রতি, ভাগবত প্রেমের Symbol হইতে পারে না। একমাত্র ব্রজের এই পরকীয়া প্রীতিকে ভক্তিধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া ভক্তাচার করিতে হইবে, জীবনে

অনুকরণ করিলে চলিবে না। যাহারা লীলাতত্ত্ব বুঝে না—তাহারাই ভাববিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের তথাকথিত কাল্পনিক আচরণের অনুকরণ করে। বৈষ্ণব সাধকগণ বলিতে চান—পরপুরুষে অনুরক্তা কুলবধূর আত্মহারা আকুলতাটুকু অধিগত করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর,—তাহার জীবনের আচরণের অনুসরণ করিও না।*

রাসলীলা ও পরকীয়াবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ রাসলীলা-শ্রবণে সন্দিগ্ধচিত্ত হইলে শুকদেব সন্দেহভঞ্জনকল্পে বলিলেন—"যে সকল ব্যক্তি অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদি-পরতন্ত্র বা দেহাত্মবাদী তাহাদের কদাপি মনের দ্বারাও ঐরূপ আচরণ কর্তব্য নয়। যেমন রুদ্র ব্যতিরিক্ত ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মূঢ়তাপ্রযুক্ত ঐরূপ ঈশ্বরের আচরিত কাম্য আচরণ করিলে অচিরে বিনষ্ট হইবে। যদিও ভগবান আপ্তকাম, তথাপি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তাদৃশ ক্রীড়া করিয়াছেন।"

(ভাগবত দশম স্কন্ধ)।

* যাহাই হউক, বৈষ্ণব সাহিত্যের পরকীয়াবাদ আগুন লইয়া খেলা। আগুনের উত্তাপটুকু লইব—তাহার দাহিকা শক্তিকে অস্বীকার করিব—এইরূপ অনুশাসনের দ্বারা মানবিক প্রবৃত্তির বন্যাকে অবরুদ্ধ করা কঠিন। যাহা সাধনালভ্য তাহাকে বোধনালভ্য বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়াই রসপথের পথিকরা কেবল জ্ঞানলাভ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। পরবর্তী বৈষ্ণবরসের অনুবর্তীরা জীবনে ব্রজলীলার অনুরূপ আচরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছে—আচরণের পথে ব্রজলীলাতত্ত্ব হইতেই সমর্থন লাভ করিয়াছে। মধুর ভাবের সাধনার নামে তাহারা পরকীয়ার সন্ধান করিয়াছে—তাহারা পূর্ববর্তী সাধকদেরও পরকীয়া সাধন-সঙ্গিনীর কল্পনা করিয়াছে। কেহ কেহ সখীভাবের সাধনার জন্য নিজের পৌরুষ বিস্মৃত হইয়া নারীত্বের অভিনয় করিয়াছে। পদকর্তারা সখীভাবে আবিষ্ট—এই আবেশের আতিশয্য লোচন-দাসের পদে এবং গৌরনাগরিয়া পদে দেখা যায়। এইভাবে বৌদ্ধ মহাসুখবাদের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া সহজিয়া, আউলিয়া, বাউলিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈরাগ্যের সহিত রসধর্মের সাধনার সামঞ্জস্যসাধন বড়ই কঠিন হইয়াছে—ফলে ইন্দ্রিয়লালসা ইষ্টদেবের আরাধনার উপচার হইয়াও পড়িয়াছে।

রাসলীলা প্রসঙ্গে ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছে, রাসলীলা ঈশ্বরের যোগমায়ার দ্বারা পরিকল্পিত লীলা। অতএব ইহাতে ব্রজগোপীগণের স্বপতি ত্যাগ ইত্যাদির লৌকিক বিচার অনাবশ্যক।

ভাগবতের রাসলীলা বিশ্লেষণ করিলে আমরা যাহা পাই, তাহার সঙ্গে লৌকিক বিচার একেবারেই সমঞ্জস হয় না। শ্রীকৃষ্ণ এমন মুরলীধ্বনি করিলেন—যে তাহা শুনিয়া ব্রজগোপীগণ যেখানে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই পাগলিনী হইয়া বনের দিকে ছুটিল। পরপুরুষের দিকে যে নারী ধাবিত হয়,—সে পতিসেবা করিতে করিতে ছুটিয়া উন্মাদিনী হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া যায় না, শিশুকে স্তন্যপান করাইতে করাইতে তাহাকে রোরুদ্যমান অবস্থায় ফেলিয়া পাগলের মত ছুটে না, এক চোখে কাজল পরিয়া, এক কানে কুণ্ডল পরিয়া, এক পায়ে আল্‌তা পরিয়া, লুলিত কেশে গলিত বেশে, স্খলিত নীবিবন্ধন হাতে ধরিয়া ছুটে না। একসঙ্গে কখন পতিপুত্রবতী নারীরা দল বাঁধিয়াও ছুটে না। ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী যমুনাতীরের বাঁশবন হইতে তৈরী মুরলী নয়—এ মুরলী কোন বাস্তব পদার্থ ই নয়। ব্রজগোপীরা আমাদের লৌকিক জগতের নারীও নয়, শ্রীকৃষ্ণও পরপুরুষ নহেন, পরমপুরুষ। লক্ষ্য করিতে হইবে—কোন কুমারী বা বিধবা নারীর কথা ইহাতে নাই! সকলেই পতিপুত্রবতী, গৃহিণী, গৃহাসক্তা, সংসারধর্মে নিবিড়ভাবে মগ্না। ভাগবতের কবি পতিপুত্রে অননুরক্তা, চঞ্চলচিত্তা, লালসাবতী, পরপুরুষের জন্য প্রতীক্ষমাণা এমন কোন নারীর কথাই বলেন নাই। তিনি রাসলীলাপ্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন—একদিকে সংসার, অন্যদিকে পরমপুরুষের আহ্বান। এই সংসারের বন্ধনজাল বুঝাইবার জন্য পতিপুত্রবতী নারীগণকে নানা কর্মে ব্যাপৃতারূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। পরপুরুষ কখনও একদল স্ত্রীলোক লইয়া লীলা করে না, পরমপুরুষের পক্ষেই তাহা সম্ভব, যদি ঐ স্ত্রীলোকগণ রক্তমাংসে গঠিত না হয় অর্থাৎ যদি ভাববিগ্রহ হয়। আমাদের মতিকে যদি কুলবধূ কল্পনা করা যায়,

তবে মানিতেই হয়,—সংসারই তাহার পতি, গৃহকর্মে কুলধর্মে তাহার স্বাভাবিক প্রথাগত রতি, ভগবান্‌ই তাহার কাছে পরপুরুষ। ভগবদ্‌ভক্তি তাহার পক্ষে পরকীয়া রতি। এই রতির গূঢ়-গহন রহস্য বুঝাইবার জন্য রাধার পরিকল্পনা।

পরকীয়তার আনুরূপ্য—রাধা যমুনায় জল আনিতে যান, রন্ধনশালায় যান, অঙ্গন মার্জনা করেন, আরও অনেক গৃহকর্ম করেন; কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া থাকে সব সময়ই শ্রীকৃষ্ণে। গৃহসংসারে বন্দিনী সংসার-ধর্মরতা কুলবধূর পরপুরুষের চিন্তা আর বিষয়কর্মরত ভক্তের পরম-পুরুষের চিন্তা দুই-এর মধ্যে আনুরূপ্য পরকীয়াবাদের একটা অতিসাধারণ ব্যাখ্যা। পরমহংসদেবও বিষয়াসক্ত ভক্তের কথা বুঝাইতে এই আনুরূপ্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণের শ্লোকটিকে মনে পড়ে—

যুবতীনাং যথা যুনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্‌বৎ মনোভিরমতাং ত্বয়ি॥

এই মনোভিরামত্বকে আরো নিবিড় ও গভীর করিয়া দেখাইতে হইলেই পরকীয়া যুবতীর কথা ও তরুণ পরপুরুষের কথা বলিতে হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেম ও কাম—খাঁটি বাংলাভাষার পদগুলিতে সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব অতি সামান্য। ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলি সংস্কৃত কাব্যধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। সংস্কৃত কাব্যে প্রেম ও কামের মধ্যে একটা সীমারেখা নাই—প্রেম ও কাম অঙ্গাঙ্গিভাবে অনুস্যূত। এখন যেমন Platonic love, বিদেহ প্রেম, নিষ্কাম প্রেম, অতীন্দ্রিয় প্রেম, অবাস্তব প্রেম ইত্যাদি লইয়া কাব্য রচিত হয়, সংস্কৃতে তাহা হইত না। দেহসম্পর্কশূন্য নিরালম্ব প্রেম কাব্যের বিষয়ীভূতই ছিল না। যেখানেই প্রেমের কথা, সেখানেই তাহার উপযুক্ত দৈহিক আবেষ্টনী, আধার, উপচার, উপকরণ ও আনুষঙ্গিকতার কথা আছে। সীতাকে হারাইয়া দণ্ডকারণ্যে দারুণ

বর্ষাগমে রামচন্দ্রের মনে বিরহব্যথার সঞ্চার হইয়াছে। মহাকবি তাহাতে কামার্তিও মিশ্রিত করিয়াছেন। কুমারসম্ভবে মহাযোগীর গৌরীপ্রেমও দেহ-সম্পর্কবর্জিত নয়। সংস্কৃত কবির লেখনীতে হরগৌরীর প্রেমলীলা কামলীলাতেই পরিণত হইয়াছে।

ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলি সংস্কৃত কাব্যধারার দ্বারা আবিষ্ট বলিয়া জয়দেবের গীতগোবিন্দের মতই এইগুলিতে কামলীলারও স্থান হইয়াছে। হরগৌরী বা রামসীতার প্রসঙ্গেও মহাকবিরা সতর্কতার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাতে ইহা ত অপরিহার্য অঙ্গ হইবেই।

রবীন্দ্রনাথ 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটির 'কান্ত পাহুন কাম দারুণ' এই পংক্তির 'কাম দারুণের' স্থলে 'বিরহ দারুণ' সংযোজন করিয়াছিলেন—ইহাই বর্তমান যুগের রসাদর্শের পক্ষে সুসমঞ্জস। বিরহিণীর পক্ষে 'কাম দারুণ' যখন পরম সত্য, তখন তাহাই লিখিতে বৈষ্ণব কবি কোন অসঙ্গতি দেখেন নাই। সংস্কৃত কাব্যের অনুস্মৃতি এবং কাব্যের চিরন্তন ঐতিহ্যের ধারার অনুবর্তনের ফলেই ব্রজবুলির পদাবলীতে কামলীলার বর্ণনা স্থান পাইয়াছে।

ঐশ্বর্যহরণে সম্ভোগবর্ণনার অবতারণা—ব্রজলীলার পদে ঐশ্বর্যভাব মিশ্রিত থাকিলে তাহাতে রসাভাসের সঞ্চার হয়—ইহা একটি অনুশাসন। এই অনুশাসন পদকর্তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নয় ঐশ্বর্যভাব হইতে চিত্তকে বহু দূরে লইয়া যাইবার জন্য কবিরা শ্রীকৃষ্ণকে কেবল প্রাকৃত প্রেমমুগ্ধ মানুষ করিয়া তোলেন নাই, কামুক লম্পট করিয়াও তুলিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্তনের কবি কেবল দেবত্ব হরণ করেন নাই, মনুষ্যত্ব পর্যন্ত হরণ করিয়াছেন। মোট কথা, শ্রীকৃষ্ণকে পুরা রক্তমাংসের মানুষ বানাইবার জন্য কবিরাজরা মকরধ্বজের সহায়তা লইয়া একটু বাড়াবাড়িও করিয়াছেন।

সেবোপচাররূপে সম্ভোগাঙ্গ—পদকর্তারা প্রায় সকলেই

পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরাধিকার সখীর অভিনয় করিয়াছেন। এই সখীভাবে সখ্য, দাস্য ও মধুরভাব তিনই মিশ্রিত আছে। সখীদের প্রধান কাজ রাধাকৃষ্ণের পরিচর্যা।

এই সেবাধর্মের সঙ্গে Anthropomorphic ভাব বিজড়িত আছে। আমাদের লৌকিক জীবনে যাহা যাহা প্রীতিকর, তাহা তাহা দিয়াই পরম প্রিয়ের সেবা বা উপাসনা করারই পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর উপচারের কথা নয়, জাতিগত, শ্রেণীগত বা গোষ্ঠীগতভাবে যাহা মোদনীয়, তাহাই হয় পরমপ্রিয়ের সেবার উপচার। মন্দিরে মন্দিরে দেবদেবীর পূজা ও ভোগের উপচারের কথা স্মরণ করিতে বলি। দেবদাসীর নৃত্যগীত ও রাগানুকূল হাবভাবের কথাও উল্লেখযোগ্য। আরাধ্য যেখানে প্রেমাকৃষ্ট কিশোর-কিশোরী, সেখানে তাহাদের সেবা-উপচারও তদুপযোগী। তরুণ রসবিদগ্ধ নাগর-নাগরীর প্রেমলীলার উপচার যোগানোই সখী-সজনীর কাজ। এইরূপ উপচার যোগাইতে গিয়া কবিদের রচনায় অজস্র কামকেলির উপকরণ আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে কেহ মনে না করেন, কামকেলি বৈষ্ণব কবিদের পরম হৃদ্য বস্তু এবং তাহাই পরম প্রিয়কে উৎসর্গ করিয়াছেন। কামকেলি হৃদ্য বস্তু কবিদের সখীর ভূমিকায়—বাস্তব জীবনে নয়। জীবনে তাঁহারা হয়ত কামকেলি বর্জন করিয়াছিলেন—প্রেমিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের উপভোগ্য হইবে বলিয়াই সখীর ভূমিকায় সম্ভোগের উপচাররূপে তাহাই যোগাইয়াছেন। এদেশে প্রথা আছে যে বস্তু ইষ্টদেবতাকে, যেমন জগন্নাথকে উৎসর্গ করা হয়—তাহা ভক্ত নিজে আর উপভোগ করেন না। সাধক কবিদের সম্বন্ধে একথাও বলা যাইতে পারে।

সম্ভোগাঙ্গের অন্যান্য সার্থকতা—কেহ কেহ অনুমান করেন—প্রাকৃত জনকে লীলাধর্মের পথে আকর্ষণ করিবার জন্য তাহাদের রুচির অনুগত কামলীলার বর্ণনা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে উপন্যস্ত

হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনে রাধাবিরহই পরিপূর্ণভাবে বিলসিত হইয়াছিল। এই রাধাবিরহই পদাবলী-সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ। রাধাবিরহের পদাবলীর দ্বারা ভোগাসক্ত লোকদের লীলাধর্মে দীক্ষা দেওয়া যায় না। সম্ভোগলীলার সাহায্যে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া শেষে বিরহরসের রসিক করিয়া তোলাই সম্ভোগের পদকর্তাদের হয়ত উদ্দেশ্য ছিল।

যাহারা মাংসভোজনলুব্ধ তাহাদিগকে প্রাচীন মনীষীরা বলিয়াছিলেন, "মাংস খাইবে খাও, দেবতার কাছে বলি দিয়া কিংবা দেবতাকে নিবেদন করিয়া খাও।"

অশুচি আমিষও তাহাতে শুচি হইবে। বৈষ্ণব পদাবলীর কামকেলি বর্ণনা কি সেইভাবে পরিকল্পিত? কবিরা হয়ত বলিবেন—সাহিত্যের মধ্যবর্তিতায় শুধু কামকেলির কথাই ত তোমরা শুনিতে চাও? তাহাই যদি উপভোগ করিতে চাও—তবে রাধাকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া উপভোগ কর। পদকর্তারা তোমাদেরই ভোগ্য বস্তু, তাঁহাদের উপাস্য চরণে নিবেদন করিয়া রাখিয়াছেন। রাধার উরোজযুগল কনকশম্ভুত্ব লাভ করিয়া যেমন কৃষ্ণার্পিত পঞ্চবিল্বদলবাসিত হইয়াছে—তাহার সম্ভোগলীলা তেমনি হরিচরণে নিবেদিত হইয়া তুলসীপত্রবাসিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—'পদাবলীর ব্রজলীলা মদনমহোৎসব।' মদনমোহনের মহোৎসব কেন যে মদনমহোৎসবে পরিণত হইল তাহা সংস্কারমুক্ত মনে ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন।

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"মনে রাখিতে হইবে যিনি এই রসের প্রধান স্রষ্টা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তিনি সন্ন্যাসী, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন বিষয়বিরক্ত মহাপুরুষ, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস অসামান্য প্রেরণার অধিকারী। ইঁহারা কোন ষড়্‌যন্ত্র করিয়া লোকের রুচিকে পীড়া দিবেন এবং জন্মার্জিত সংস্কারের মূলচ্ছেদন করিবেন, এমন-ত মনে হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ সম্ভোগাংশের কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই, কিন্তু ইহার জন্য পদাবলীর গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা মনে করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—“বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এমন অংশ আছে যাহা নির্মল নয়……বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে রাধার খণ্ডিতা অবস্থার বর্ণনা আছে। আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার কোন বিশেষ গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের এই কামুক ছলনার দ্বারা কৃষ্ণরাধার প্রেমসৌন্দর্যও খণ্ডিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধিকার এই অবমাননায় কাব্যশ্রী অবমানিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচুর সৌন্দর্যরাশির মধ্যে এ সকল বিকৃতি আমরা চোখ মেলিয়া দেখি না—সমগ্রের প্রভাবে ইহার দূষণীয়তা অনেকটা দূর হইয়া যায়। লৌকিক অর্থে ধরিতে গেলে বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের আদর্শ অনেকস্থলে স্খলিত হইয়াছে। তথাপি সমগ্র পদাবলীপাঠের পর যাহার মনে একটি সুন্দর ও উন্নত ভাবের সৃষ্টি হয় না, সে হয় সমস্তটা ভালো করিয়া পড়ে নাই, নয়ত সে কাব্যরসের রসিকই নয়।”

এখানে কবিগুরু কবিভূমিকাতেই বিচার করিয়াছেন—বৈষ্ণবভাবে আবিষ্ট হইয়া বিচার করেন নাই। পদাবলীকে অবিমিশ্র কবিতা ধরিয়াও উত্তরে বলা যাইতে পারে—

কেবল ব্রজবুলি ভাষার দ্বারা নয়, প্রভূত আলঙ্কারিকতার দ্বারা কবিরা সম্ভোগাংশের রুচিবিগর্হিত ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা ঐ অংশের পদগুলিকে রসসাহিত্যের পদবীতে উন্নীত করিয়া কেবলমাত্র বিদগ্ধজনেরই উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছেন—সাধারণের ঐগুলিতে প্রবেশাধিকার নাই। কলাসরস্বতীর পাদমূলে রতিদেবী দাসীর আসনটুকু পাইয়াছেন। তাঁহার মরালের শ্বেতপক্ষ-বিস্তারে রাগোৎফুল্লকণ্ঠ কপোতকপোতীর কলকেলি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

সাহিত্যের দিক্ হইতে বৃন্দাবনের সম্ভোগলীলা চিরবিচ্ছেদের

আগে আদিকবিবর্ণিত ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রণয়কেলিরই মত। বিচ্ছেদ-কারুণ্যের গভীরতার আস্বাদ দিবার জন্যই যেন মিলন-নিবিড়তার অবতারণা। ক্রৌঞ্চীর করুণ আর্তনাদে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে তাহার ক্ষণিক সম্ভোগের স্মৃতি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কেবল মাথুর বেদনার কথা নয়, পদাবলী আগাগোড়া বেদনারই গান। পূর্বরাগ হইতে মাথুর পর্যন্ত কোথাও বেদনার বিচ্ছেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শ্রবণ হইতে রাধার প্রাণে 'সোয়াথ' নাই। রাধার বেশভূষায় অনাসক্তি, আহারে বিরতি, হাস্যপরিহাসে বিতৃষ্ণা জন্মিল। চিত্রদর্শনে শ্রীমতী বলিয়াছেন—হায় হায় সরলবুদ্ধি আমরা কি করিয়া বুঝিব—ইহাত চিত্র নয়—ইহা 'নিবিড় বড়ববহ্নিজ্বালা কলাপ-বিকাস।' বংশী কর্ণে দংশন করিল—সে বিষের জ্বালায় রাধা অস্থির, "উড়ু উড়ু আনচান ধক্ ধক্ করে প্রাণ"। লালসার অবলম্বন যে রূপ—সে রূপ ত মলিন হইয়া গেল, বাঁধুলী ফুলের মত অধর ধুতুরার মত পাণ্ডুর হইয়া গেল। রাধার অন্তরে এই যে রূপানল জ্বলিল—তাহা ধূপানল হইয়া ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণের দশাও তথৈবচ। 'শ্যামর অঙ্গ ঝামর' হইয়া গেল।

যদি বা দূতীর সাহায্যে পরস্পরের মনের কথা জানাজানি হইল, রাধা কি করিয়া প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হইবেন? 'দুর্জনের' নয়নপ্রহরী চারিদিকে। শ্রীমতী ব্যাধের মন্দিরে যেন কম্পিতা হরিণী। "শানানো ক্ষুরের ধার স্বামী দুরজন"। একদিকে কুলশীল—অন্যদিকে কালা। ক্ষুরের উপর রাধার বসতি। তারপর কলঙ্কের জ্বালা আছে। কিন্তু কালার পিরীতি ঘরে থাকিতে দেয় না। তাই দুর্গম বনপথে অভিসার। কণ্টকাকীর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল বনপথ। প্রকৃতির বাধার অন্ত নাই। শীতের রজনী, দুর্বিষহ শীতল সমীর, তুহিনপাত; গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে শিরে প্রখর তপন, পদতলে তপ্ত বালুকা। আর বর্ষায় পঙ্কিল শঙ্কিল বনবাট—আকাশে বজ্রগর্জন। অভিসারে গিয়াও দয়িতকে পাওয়া যাইবে এমন কোন স্থিরতা নাই। প্রতীক্ষার বেদনা আছে। 'সুদীঘল' রাত্রির প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলি এক একটি

কল্প বলিয়া মনে হয়। অশ্রুতে সম্ভোগতল্পের সহিত সম্ভোগকল্পও ভাসিয়া যায়। 'চৌরি পিরীতি' যতই মধুর হউক, পদকর্তারা ইহাকে সুলভ করিয়া দেখান নাই। পদাবলীতে বিরহেরই প্রাধান্য। সম্ভোগের বা মিলনের পদের তুলনায় বিরহের পদের সংখ্যা ঢের বেশি। বিরহের বেদনার সঙ্গে অনুতাপ ও আত্মধিক্কারের বেদনা আছে। লাজে তিলাঞ্জলি দিয়া রাধা যাহার জন্য কলঙ্কের ডালা মাথায় লইলেন, সে যদি উপেক্ষা করে তবে সে বেদনা রাখিবার ঠাঁই নাই। অভিমানিনী রাধা শ্যামের সামান্য উপেক্ষাও সহ্য করিতে পারেন না। ক্ষণে ক্ষণেই তাঁহার মনে হইয়াছে ধৃষ্ট শঠ বুঝি তাহাকে ভুলিয়া গেল। এই চিন্তায় রাধার বিরহবেদনা দ্বিগুণিত। তখন বিরহতন্বী রাধার আক্ষেপবহ্নি শত শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

গভীর প্রেমের একটা লক্ষণ অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তির বেদনা রাধার কণ্ঠে হাহাকারে পরিণত হইয়াছে। রাধার কেবলই কাঁদন আসে। কিন্তু লোকভয়ে প্রাণ খুলিয়া রাধা কাঁদিতেও পারে না— "চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে"। রাধা রন্ধনশালায় গিয়া ধোঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদেন। মধুর মিলনের স্মৃতির বেদনাই কি কম নিদারুণ!

সঙ্কেত করিয়া মিলিতে না পারিলে আঙিনার কোণে বঁধুয়াকে ভিজিতে দেখিলে রাধার বুক ফাটিয়া যায়। আবার সঙ্কেতস্থলে গিয়া শ্যামের দেখা না পাইলে শ্যামের জন্য উদ্বেগের অন্ত নাই। সঙ্কেতস্থলে প্রতীক্ষার বেদনার সঙ্গে সংশয়ের বেদনা আছে। আবার অঙ্গে সম্ভোগচিহ্ন বহন করিয়া শ্যাম প্রভাতের সময় প্রতীক্ষমাণার কাছে আসিয়া দেখা দিয়া যখন সংশয়কে সত্য করিয়া তোলেন—তখন রাধার কি বেদনা তাহা সহজেই অনুমেয়। খণ্ডিতার বেদনা দুর্বিষহ হইলেই মানের পালা। স্বখাত হইলেও মান একটা ব্যবধান। ইহা স্বয়ংবৃত বিরহ। প্রিয়তমকে দণ্ডিত করার জন্য নিজে দারুণতর দণ্ডভোগ। মানের ব্যবধানের বিরহ দেশকালগত সাধারণ বিরহের চেয়েও

দারুণতর। মানের গান বিরহেরই গান—তাই বেদনাঘন। মান-ভুজঙ্গের দংশনজ্বালা ত কম নয়। “কবলে কবলে জিউ জরি যায় তায়”।

মানের পর অবশ্য মিলন হইয়াছে। এ মিলনে মানের বিষাদচ্ছায়া একেবারে তিরোহিত হয় না। সেজন্য এই মিলনের সম্ভোগকে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ বলে। রাধামোহন ইহাকে বলিয়াছেন—‘চরবন তপত কুশারি’ অর্থাৎ তপ্ত ইক্ষুচর্বণ।

সম্ভোগের মধ্যে প্রেমবৈচিত্ত্য আছে। শ্যামের ভুজপাশে রহিয়াও রাধা—“বিলপই তাপে তাপায়ত অন্তর বিরহ পিয়ক করি ভান”। মিলনেও স্বস্তি নাই, বিচ্ছেদের ভয়—হারাই-হারাই ভাব। “প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের ডরে”। “দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া”। চরম প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এ মিলনে তৃপ্তি নাই। “লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া” রাখিয়াও হিয়া জুড়ায় না।

তারপর মাথুর-বিরহের কথা আর কি বলিব? জগতের সাহিত্যে এই বেদনার তুলনা নাই। রূপ গোস্বামীর একটি শ্লোক তুলিয়া একটু আভাস দিই—

উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রাসাদপি ক্ষোভণঃ
দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হৃন্মগ্নশল্যাদপি।
তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকানিচয়তোঽপ্যুচ্চৈর্মমায়ং বলী
মর্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুলপতের্বিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ॥

[পুটপাক হ’তে তাপসঞ্চারী
হলাহল হ’তে মোহনকারী,
হৃদয়মগ্ন শূল হ’তে কটু
বজ্র হ’তেও হৃদ্‌বিদারী,
বিসূচিকা হ’তে ক্রূর দুঃসহ
গোকুলপতির বিরহখেদ,
বলবান্ হ’য়ে মহাবিক্রমে
মর্মগ্রন্থি করিছে ভেদ।]

পদাবলী-সাহিত্যে লালসার গীত যে নাই তাহা নয়। সেগুলির কথা আগেই বলিয়াছি। তবে সেগুলি যেন বিরহকেই গভীরতর ও দুঃসহতর করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে একটা বিপরীত প্রত্যন্ত সৃষ্টির জন্য রচিত। অন্য-দিকে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কে অনেকস্থলে যৌনবোধস্পর্শ-শূন্য করাও হইয়াছে। নামানুরাগ বা বংশীরবানুরাগের পদগুলি এই শ্রেণীর। আক্ষেপানুরাগের অনেক পদও তাহাই। চণ্ডীদাসের অধিকাংশ পদে লালসার চিহ্নও নাই। লোচন বলিয়াছেন—

আমারে, নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে।

রায় রামানন্দ বলিয়াছেন, সে যে রমণ, আর আমি যে রমণী এই দ্বৈতভাব পর্যন্ত আমি হারাইয়াছি। এমন কি বিদ্যাপতি পর্যন্ত রাধার প্রেমের স্বরূপকে শেষ পর্যন্ত নির্লালস করিয়া চিত্রিত করিয়া বলিয়াছেন—"অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই"। বৈষ্ণব পদাবলীর যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহা বিপ্রলম্ভাত্মক অনুরাগের বেদনারই গান।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এখন পদাবলীর মোটামুটি একটা বিশ্লেষণ দেওয়া যাইতেছে। পদাবলীতে চতুঃষষ্টি রসের বিলাস প্রদর্শিত হইয়াছে। কবিকর্ণপূর এই চতুঃষষ্টি রসকে প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ বা বিরহ চারি ভাগে বিভক্ত ঃ পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। প্রিয়সঙ্গমের পূর্বে যে রতি তাহাই পূর্বরাগ। কবিকর্ণপূর এই পূর্বরাগের বিভাগ আটটি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—১। সাক্ষাৎ দর্শন, ২। চিত্রপটে দর্শন, ৩। স্বপ্নে দর্শন, ৪। বন্দী বা ভাটমুখে শ্রবণ, ৫। দূতীমুখে শ্রবণ, ৬। সখীমুখে শ্রবণ, ৭। গুণিজনের গানে শ্রবণ ৮। বংশীধ্বনি শ্রবণ। কবিকর্ণপূর কেবল নামশ্রবণে পূর্বরাগসঞ্চারের কথা বলেন নাই।

নামানুরাগ—চণ্ডীদাস নামানুরাগকে প্রাধান্য দিয়াছেন। চণ্ডীদাসের রাধা বলিয়াছেন—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি করে নয়নে দেখিয়া গো
যুবতীর ধরম কৈসে রয়॥

রূপ গোস্বামীর ললিতমাধবে রাধা, সখী ললিতাকে এই কথাই বলিয়াছেন—

রাধা (সরোমাঞ্চম্)—ললিদে, কো ক্খু কহ্নো ত্তি সুণীঅদি। জেণ কেঅলং কণ্ণস্স চেচঅ অদিধী হোন্তেণ উম্মত্তী কিজ্জামি।

ললিতা, কে এই কৃষ্ণ, কেবল যাহার নাম আমার কর্ণের অতিথি হওয়ামাত্র আমাকে উন্মত্তা করিয়া তুলিল।

ললিতার বদলে কুন্দলতা ইহার উত্তর দিয়াছেন—সহি, এসো লোওত্তরস্স বথ্থুণো নিসগ্গ, জং সব্বদএ উপভুজ্জমানব্বি অউরুব্বো জেব্ব ভোদি।

ইহার তাৎপর্য—সখি, তুমি নিত্যকাল যাহার সঙ্গে মিলিত তাহার নাম ত তোমার নিত্যসঙ্গী। তবে অলৌকিক বস্তুর স্বভাবই এই যে, ইহা সর্বদা উপভোগ করিলেও মনে হয় পূর্বে যেন ইহার আস্বাদই পাওয়া যায় নাই।

কৃষ্ণপ্রেম যে লোকাতীত বস্তু রূপ গোস্বামী এই কথাই কুন্দলতার মুখ দিয়া শুনাইয়া দিলেন। নামশ্রবণে যে অনুরাগ তাহা দেহাত্মকতা-বর্জিত। নাম শুনিয়া অবধি এ নাম রাধার 'বদন ছাড়িতে নাহি পারে।'

প্রভাতে উঠিয়া জটিলার ভয়ে করয়ে গৃহের কাম।
হাতেতে করিছে মনেতে ভাবিছে মুখেতে জপিছে নাম॥

রূপ গোস্বামী এই নামের আকর্ষণী শক্তি বুঝাইতে বিদগ্ধমাধবে লিখিয়াছেন—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীং রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী॥

যদুনন্দনদাস এই শ্লোকের মূল রসবস্তুকে তরলায়িত করিয়া আমাদের সকলের উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাড়ায় অতিশয়।

নাম সুমাধুরী পিয়ে ধরিবারে নারি হিয়ে
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয় ॥
কি কহব নামের মাধুরী।
কেমন অমিয়া দিয়া কে জানি গড়ল ইহা
কৃষ্ণ এই দু-আঁখর করি ॥
আপন মাধুরী গুণে আনন্দ বাড়ায় কানে
তাতে কানে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কান যবে হয় তার নাম
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে ॥
কৃষ্ণ দু-আঁখর দেখি জুড়ায় তাপিত আঁখি
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি তবে কৃষ্ণরূপ দেখি
নাম-তনু ভিন্ন নাহি ভায় ॥
চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে প্রবেশ করয়ে তবে
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহ্লাদন
নাম করে প্রেম উনমাদ ॥
যে কানে পরশে নাম সে তেঁজয়ে আন কাম
সমভাব করয় উদয়।
সকল মাধুর্যস্থান সব রস কৃষ্ণনাম
এ যতুনন্দন দাসে কয় ॥

যে নাম সকল ইন্দ্রিয়গণের প্রহ্লাদন ও পরম প্রেমের উন্মাদন, তাহা অলৌকিক—অপ্রাকৃত। তাহা চর্মকর্ণে শ্রুত নয়—মর্মকর্ণেই আকর্ণিত।

স্বপ্নানুরাগ—স্বপ্নে শ্যামের রূপ দর্শনে পূর্বরাগ-সঞ্চারের কতকগুলি পদ আছে, তন্মধ্যে জ্ঞানদাসের "মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা" পদটি সর্বোৎকৃষ্ট।

ঘন ঘোর শ্রাবণ রজনীতে বিগলিত চীর অঙ্গে শ্রীরাধা পালঙ্কে সুপ্ত। চারিদিকে বর্ষারজনীর মুখরিত আবেষ্টনী সুখস্বপ্নের পক্ষে অনুকূল। বারিধারার রিমিঝিমি শব্দ, ঘন দেয়া গরজন, শিখরে শিখণ্ড-রোল, মত্ত দাদুরী বোল, কোকিলের কুহরণ, ঝিল্লীর ঝঙ্কার, ডাহুকীর উৎক্রোশ—সমস্ত মিলিয়া এই আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়া ঘুমঘোর ঘনাইয়া তুলিয়াছে। এমন সময়ই ঘুমঘোরে শ্রীমতী স্বপ্নে দেখিলেন—

রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
আমা কিন' বিকাইনু বোলে॥

জ্ঞানদাস সুখস্বপ্নভঙ্গের কথা আর বলেন নাই। কিন্তু স্বপ্নের পক্ষে যাহা অনিবার্য তাহা চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—এই স্বপ্ন শ্রীমতী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের পর হারাইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন—

কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল বাজিলে যেমন হয়,
চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে আর কি পরাণ রয়।

তিনি আরও বলিয়াছেন—শ্রীমতী স্বপ্নের নেত্র হইতে প্রিয়তমকে হারাইলেন, কিন্তু স্বপ্নপথে মর্মে প্রবেশ করিয়া কালোমাণিক কালা তাঁহার গৌর অঙ্গকে কালো করিয়া দিলেন—

এই ত রসের কূপ।
এক কীট হয়ে আর দেহ পাওয়ে ভাবিয়ে তাহার রূপ॥

কবির বক্তব্য—শ্রীমতী সেই হইতে কৃষ্ণময়ী হইয়া গেলেন।

তারপর শ্যামের চিত্রপট-দর্শনে রাধার অনুরাগ-সঞ্চারের কতকগুলি পদ আছে। এইগুলি এবং বন্দীমুখে, দূতীমুখে, সখীমুখে গুণকীর্তন শুনিয়া পূর্বরাগ সঞ্চারের পদগুলিতে চমৎকারিতা বিশেষ

কিছু নাই। এগুলি যেন সংস্কৃত কবিদের পরিকল্পিত পূর্বরাগ-সঞ্চারপদ্ধতির অন্ধ অনুকৃতি মাত্র। ইন্দ্রজালের সাহায্যে রূপদর্শনের কথা একমাত্র দীন চণ্ডীদাসের পদেই আছে।

রূপ গোস্বামী পূর্বরাগের উদ্দীপন-বিভাবগুলির সাহায্যে চমৎকার রসসৃষ্টি করিয়াছেন একটি শ্লোকে—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং।
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ॥
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ সকৃদ্‌বীক্ষণাৎ।
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥

এই শ্লোকে চমৎকার কবিকৌশল আছে। রাধা বলিতেছেন—কৃষ্ণ এই অক্ষরদ্বয় শুনিয়া মন চুরি গেল। অন্য একজনের মুরলীধ্বনি শুনিয়াও ঐ দশা হইল। আবার একজনের চিত্রপট দেখিয়া তাহার অনুরক্ত হইয়া পড়িলাম। হায়, তিনজন পুরুষে আমার এককালে অনুরাগ জন্মিল—ইহার চেয়ে যে মরণ ভালো ছিল। যদুনন্দন দাস এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়া শেষে ভণিতায় শ্রীমতীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন—

গোবিন্দদাস কহয়ে শুন সুন্দরি অতয়ে করহ বিশোয়াস।
যাকর নাম মুরলীরব তাকর পটে ভেল যো পরকাশ॥

এইরূপ আশ্বাস দানই ত দরদী সখীর কাজ। এই আশ্বাসটুকু না দিলে পদকর্তার সখীধর্মচ্যুতি ঘটে।

বংশীর দৌত্য—রূপ দেখিবার আগে বাঁশী শুনিয়া যে অনুরাগ তাহা নামানুরাগের মতই দেহাত্মকতাবর্জিত। এই অনুরাগ রাধার রতিকে প্রাকৃত প্রেমের অতীত স্তরে উন্নীত করিতেছে। কবিরা শ্রীরাধিকাকে আত্মবিস্মৃতারূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার নিত্যসঙ্গিনী বংশীধ্বনি শুনিয়া 'মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্' জননান্তর সৌহৃদের মত সে কথা যেন তাঁহার মনকে

পর্য্যুৎসুকী করিয়া তুলিতেছে। রূপ গোস্বামীর রাধিকা মুরলীধ্বনি শুনিয়া বলিতেছেন—

রাধা—নাদঃ কদম্ববিটপান্তরতো বিসর্পন্
কো নাম কর্ণপদবীমবিশন্ন জানে।
হা হা কুলীনগৃহিণী গণগর্হণীয়াং
যেনাদ্য কামপি দশাং সখি লম্ভিতাস্মি।

ললিতা—হলা এসো মুরলীরও।
রাধা—অজড়ঃ কম্পসংবাদী শস্ত্রাদন্যো নিকৃন্তনঃ।
তাপনোঽনুষ্ণতাধারঃ কোঽয়ং বা মুরলীরবঃ॥

হলা, ণাহং মুরলীণাঅস্স অণহিন্না। তা অলং বিপ্পলম্ভেণ ফুটং এসো কেণ বি মহানাঅরেণ কোবি মোহনমন্তো পঠীয়দি।

যদুনন্দন দাস এই অংশকে যে চমৎকার পদে পরিণত করিয়াছেন —তাহাই বংশীরবানুরাগের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ।

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্যপদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥
সখিহে, নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হা হা কুলাঙ্গনা মন গ্রহিবারে ধৈর্যগণ
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলে তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিত্তে ধরি থেহ॥
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।

জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি তনু শীতল করিয়া ॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়য়ে আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়ে ওর ॥
কোন সুনাগর সেই মহামন্ত্র পড়ে যেই
হরিতে আমার ধৈর্য যত।
দেখিয়া এ সব রীত চমক লাগয়ে চিত
দাস যদুনন্দনের মত।

[পদকল্পতরুর পাঠ না লইয়া পদরত্নসারের পাঠ উৎকলন করা হইল, নতুবা ভণিতা পর্যন্ত পৌঁছায় না।]

যদুনন্দন দাস 'বিষামৃতে একত্র করিয়া' এই কথাটি সংযোগ করিয়া বংশীধ্বনির প্রকৃত পরিচয়ই দিয়াছেন। ইহাতে ইহার স্বরূপ আরো পরিস্ফুট হইয়াছে। একাধিক কবি এই বংশীধ্বনিকে 'বংশীর দংশন' বলিয়াছেন। ইহার জ্বালা শ্রীমতী ছাড়া কেহই জানে না। এই জ্বালার কথা বহু পদেরই উপজীব্য। কমলাকান্ত দাসের রাধিকা বলিয়াছেন—

না জানি সজনি হেন ধ্বনি শুনি যেন কাঁপে মোর গা।
বসন খসিল কেশ আউলাইল চলিতে চলে না পা।
নয়নের বারি নিবারিতে নারি বয়ানে না সরে কথা।
না জানি কেমন করিছে জীবন মরমে হৈল ব্যথা ॥
সঙ্গের সঙ্গিনী যতেক রমণী সভাই শুন্যাছে ধ্বনি।
একা কেন মোর দহে কলেবর যেমন দংশিল ফণী ॥

এ বংশী যে একেবারে আত্মহারা করে—

শুনইতে মধুর মুরলী রব থোর।
খসয়ে কাঁখের কুম্ভ নীবিনিচোর ॥
সখি হে বংশী দংশিল মোর কানে।

ডাকিয়া চেতন হরে   পরাণ না রহে ধড়ে
তন্ত্রমন্ত্র কিছুই না মানে।

তন্ত্রমন্ত্রে কি হইবে ? ইহা যে মহানাগরের মোহনমন্ত্র।

বংশীধ্বনিমুগ্ধ শ্রুতি স্বতই নেত্রকে রূপদর্শন-লালসায় ব্যাকুল করিতেছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে রূপ গোস্বামী বংশীকেই প্রধান দূতী বলিয়াছেন।

না জানি কেমন সেই কোন জন এমন শব্দ করে।
না দেখি তাহারে হৃদয় বিদরে রহিতে না পারি ঘরে॥

এই বংশী ধ্বনি যাহার কর্ণে দংশন করে সে আর ঘরে থাকিতে পারে না। দেশে দেশে যুগে যুগে কত শচীমাতার অঞ্চলবন্ধন ছাড়াইয়া কতজনই না বংশীর বেড়াজালে বাঁধা পড়িয়া পথে বাহির হইয়াছেন। এ বংশীধ্বনি শুনিয়া, 'সতী ভুলে নিজ পতি মুনি ভুলে মৌন। শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণও॥'

অনন্তদাস এই ব্রজবেণুকে অনন্তের বিশ্ববেণুরূপে কল্পিত করিয়াছেন—

মুরলীর আলাপনে পবন রহিয়া শুনে যমুনায় বহই উজান।
না চলে রবির রথ বাজী নাহি পায় পথ দরবয়ে দারু ও পাষাণ॥
শুনিয়া মুরলী ধ্বনি ধ্যান ছাড়ে যত মুনি তপজপ কিছুই না ভায়।
তৃণমুখে ধেনু যত উর্ধ্বমুখে রহত বাছুরী দুগ্ধ নাহি খায়॥

ইহা ভাগবতেরই প্রতিধ্বনি—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত-বেণুগীত-
সম্মোহিতার্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপম্
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্। (শ্রীমদ্‌ভাগবত)

নবম পরিচ্ছেদ

রূপানুরাগ—পদাবলী-সাহিত্যের প্রথম উপজীব্য শ্রীরাধার পূর্বরাগ। এই প্রসঙ্গে সাক্ষাৎ দর্শনে যে রূপানুরাগ তাহাই প্রধান।

শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম দেখিয়া শ্রীরাধার যে রূপমুগ্ধতা ও তজ্জনিত তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ও আত্মবিস্মৃতি, তদবলম্বনে অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচিত হইয়াছে। রাধার রূপমুগ্ধ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের রূপের যে অসামান্যতা—তাহা রাধার মনের মাধুরী দিয়া গড়া। কবিরা নানা ভাবে এই ভাববিগ্রহের বর্ণনা করিয়াছেন। কবিরা নানা বিচিত্র আবেষ্টনীতেও শ্রীকৃষ্ণকে রাধার দৃষ্টিপথে আনিয়াছেন।

বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

কালিন্দীতীর ধীর চলি যাতা।

জ্ঞানদাস বলিয়াছেন—

তরু অবলম্বন কে।
হৃদয়-নিহিত মণিমাল বিরাজিত সুন্দর শ্যামর দে।

যদুনাথ বলিয়াছেন—

কি পেখলুঁ যমুনার তীরে।

বংশীবদন বলিয়াছেন—

যমুনা যাইতে পথে   দু' সারি কদম্ব আছে
তাতে চড়ে সে কোন দেবতা।

গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়।

আর একস্থানে গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল কিশলয়দলে করু দংশ॥

বলরাম দাস বলিয়াছেন—

অঙ্গ মোড়া দিয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চায়।

এক এক কবি রাধাকেও এক এক অবস্থায় কল্পিত করিয়া শ্যামকে দেখাইয়াছেন।

লোচনদাসের রাধা বলিতেছেন—

যমুনার জলে যাইতে সজনি কালোরূপ দেখিয়াছি।

জ্ঞানদাসের রাধা বলিতেছেন—

জলে যাইবার কালে নয়, জল ভরিয়া ফিরিয়া আসিতে সে রূপ চোখে পড়িল—

সে জল ফেলিয়া যাই লোকলাজ ভয় পাই
কি করিব কিবা লয় মন।

অনন্তদাসের রাধা বলিতেছেন—

নাহিতে নাহিতে রঙ্গে জলদ শ্যামের অঙ্গে
দিঠি পড়িয়া গেল মোর।

রাধার মুখ দিয়া কবিরা শ্রীকৃষ্ণের রূপ নানা পদে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই অপ্রাকৃত রূপের বর্ণনার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া তাঁহারা সংস্কৃত কবিদের ভঙ্গী, পদ্ধতি ও অলঙ্কৃতি অনুসরণ করিয়াছেন—উপমায় বুঝাইবার জন্য তাঁহাদের কল্পনা সৌন্দর্য-জগতে, তন্ন তন্ন সন্ধান করিয়াছেন সুকুমার, পেলব, মোহন বস্তুর আহরণে। তন্ন তন্ন শব্দের অর্থ 'তাহা নয়, তাহা নয়'—এইভাবে পরিহার। ফলে, ব্যতিরেক অলঙ্কারেরই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে খুব বেশি। কয়েকটি পদে রূপমুগ্ধতার নিজস্ব ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে—শত সহস্র উপমা, ব্যতিরেক ইত্যাদি অলঙ্কারে সে রূপটি ফুটে নাই। আমি তাহারই ২।৪টি নিদর্শন দিব এখানে। জ্ঞানদাস বলিয়াছেন এক কথায়—

লাবণ্যে ঝরয়ে মকরন্দ।

গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

সই, কিবা সেই নয়ন চাহনি।
হাসির হিলোলে মোর পরাণ পুতলি দোলে,
দিতে চাই যৌবন নিছনি॥

কিংবা

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মুরুছা পায়॥

রাধামোহন বলিয়াছেন—

পদনখচন্দ্র আনন্দসুধা ঝরু স্থাবরজঙ্গম পান।

বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

কি কহব রে সখি কানুক রূপ,
কো পাতিয়াব স্বপনস্বরূপ।

অনুপ্রাসের যাদুকর জগদানন্দ বলিয়াছেন—

ভামিনী-সরমভরমভয়ভঞ্জন ভূষণে ভরু সব অঙ্গ।

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়।

গোবিন্দদাস আর একস্থলে বলিয়াছেন—

যে অঙ্গে পড়ে এ দিঠি সেই অঙ্গে রয়।

মনে হয়, যদি সর্বাঙ্গ নয়ন হইত তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া সে রূপসুধা পান করা যাইত। 'প্রতি অঙ্গে দেখি কত শশী।'

জ্ঞানদাস বলিয়াছেন—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
বিদরিয়া যায় হিয়া কি যে করে প্রাণ॥

এই প্রসঙ্গে বলরাম দাসের পদটি চমৎকার—

কিবা সে মোহন বেশ দেখিতে মূরছে দেশ
না রহে সতীর সতীপনা।
ভরমে দেখিলে যারে জনম ভরিয়া সই
ঝুরিয়ে মরয়ে কতজনা॥
কি করিলুঁ কিবা হৈল কেন বা সে বারাইলুঁ
কি শেল হানিয়া গেল বুকে।
জাতিকুলশীল শিরে বজর পড়িল সই
কানুরে দেখিয়া চোখে চোখে॥
খাইতে সোয়াস্ত নাই নিদ দূরে গেল গো
হিয়া ডহ ডহ মন ঝুরে।
উড়ু উড়ু আনছান ধক ধক করে প্রাণ
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে॥
রসের মূরতি সে দেখিলে না রহে দে
বাতাসে পাষাণ হয় পানি।
বলরাম দাস বলে সে অঙ্গ পরশ হ'লে
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি।

সমস্তগুলিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে—

কবিরাজ গোবিন্দদাসের—

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যবধরি পেখলুঁ কান।

—এই পদটি অন্যত্র উৎকলিত হইল। ছন্দোমাধুর্যের দিক্ হইতে অনন্তদাসের নিম্নলিখিত চরণগুলি সুন্দর। ইহা কলঝঙ্কারের সাহায্যে রূপের অপূর্বতার প্রকাশ—

বিকচ সরোজ ভান মুখমণ্ডল
দিঠি বঙ্কিম নট খঞ্জন জোড়।
কিয়ে মৃদু মাধুরি হাস উগারই
পী পী আনন্দে আঁখি পড়ল হি ভোর॥

অঙ্গদ বলয় হার মণিকুণ্ডল
চরণে নূপুর কটি-কিঙ্কিণী কলনা।
অভরণ বরণ কিরণে অঙ্গ চরচর
কালিনি জলে যৈছে চান্দকি চলনা॥

আকর্ষকের আকর্ষণের দুর্নিবারতা পরীক্ষিত হয় আকৃষ্টের চিত্তের বিমুগ্ধতা ও অভিভবের দ্বারা। রাধার জীবনে যে অসামান্য প্রভাব সঞ্চারিত হইল, তাহার দ্বারাই শ্যামের রূপের অসামান্য মাদকতা ও মোহনতা দ্যোতিত হইয়াছে। অনতিস্ফুটযৌবনা অজ্ঞাতরাগাস্বাদা রাধার জীবনে যে অসাধারণ ও অস্বাভাবিক বিপর্যয় ঘটিল, তাহার বর্ণনাই শ্যামের রূপের অসাধারণতা, অপূর্বতা ও উন্মাদিকা আকর্ষণী শক্তি সূচিত করিতেছে। কবিরা শ্রীকৃষ্ণের রূপের প্রভাবকে এমনি দুর্নিবার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে রূপ দেখিলে কোন নারীর কুলশীল-লজ্জাভয় কিছুই আর থাকিতে পারে না। ইহার অনিবার্য পরিণতি আকৃষ্টার শরম, ভরম, গুরুজনভয়, সতীধর্ম সমস্ত পায়ে ঠেলিয়া শ্যামের উদ্দেশে অভিসার।

ঘনশ্যাম বলিয়াছেন—

মৃদু মৃদু ভাষ হাস উপজায়ল দারুণ মনসিজ আগি।
যাকর ধূমে ধরমপথ কুলবতী হেরই রহু পুন ভাগি॥

এই কথারই পুনরুক্তি আছে বহু পদে।

শ্রীরূপ বলিয়াছেন—

কোঽয়ং যুবা জগদনঙ্গময়ং করোতি।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ—শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ রাধাকে স্বচক্ষে দর্শন হইতেই সঞ্জাত। শ্রীকৃষ্ণ কেবল রাধিকার রূপদর্শনেই মোহিত হ'ন নাই—তাঁহার হাবভাব, গতিবিধি, অঙ্গচালনার ভঙ্গী ইত্যাদিও রতিরসের উদ্দীপন বিভাবের কাজ করিয়াছে। এই শ্রেণীর বিভাবের বর্ণনাতেও বিদ্যাপতিই অদ্বিতীয়।

বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

গেলি কামিনি গজহু-গামিনি বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-শায়ক কুহকী ভেলি বরনারী॥
জোড়ি ভুজযুগ মোড়ি বেঢ়ল ততহি বয়ন সুছন্দ।
দাম-চম্পকে কাম পূজল যৈছে শারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে শারদ ঘন জনু বেকত করল সুমেরু॥

সংস্কৃত কবিদের অনুস্মৃতি হইলেও উৎপ্রেক্ষাগুলিতে কবির কৃতিত্ব আছে। কবির অলঙ্করণের কৃতিত্ব প্রদর্শনই উদ্দেশ্য নয়, ভাবভঙ্গীর রাগোদ্দীপকতা প্রদর্শনই উদ্দেশ্য। জ্ঞানদাসের এ বিষয়ে মৌলিকতা আছে—

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরি মাঝ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত মুখ মুচকাই॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে যেন অমিয়া উঘাড়ি॥

শেষাংশের উৎপ্রেক্ষা বিদ্যাপতির উৎপ্রেক্ষাগুলিকেও যেন ম্লান করিয়া দিয়াছে।

শৈশব-যৌবনের বয়োদোলায় আন্দোলিতা শ্রীরাধার হাবভাবভঙ্গীর বর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছেন—

খেনে খেনে নয়নকোণে অনুসরই।
খেনে খেনে বসনধূলি তনু ভরই॥
খেনে খেনে দশনক ছটাছট হাস।
খেনে খেনে অধর আগে করু বাস॥
হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোর।
খেনে আঁচর দেই খেনে হয় ভোর॥

চণ্ডীদাসেরও মৌলিকতা লক্ষণীয়—

(১) বসন খসয়ে অঙ্গুলি চাপয়ে কর সে করচে থুইয়া।
দেখিয়া লোভয়ে মদন শোভয়ে কেমনে ধরিব হিয়া॥

(২) পথে জড়াজড়ি দেখিনু নাগরী সখীর সহিতে যায়।
সকল অঙ্গ মদনরঙ্গ হসিত বদনে চায়॥

(৩) সই, মরম কাঁহলুঁ তোরে।
আড়নয়নে ঈষৎ হাসিয়া আকুল করিল মোরে॥
ফুলের গেঁড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচযুগ-বসন ঘুচায়ে মুচকি মুচকি হাস॥

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা কেবল হাবভাবে নয়, বসনভূষণেও শ্যামকে মুগ্ধ করিতেছেন—

বাম অঙ্গুলিতে মুদরি সহিতে কনককটোরি হাতে।
সঁীথায় সিন্দুর নয়নে কাজর মুকুতা শোভিত নথে॥

শ্রীরাধা 'স্বাঙ্গৈর্বিভূষিতা'। তাঁহার ভূষণের কি প্রয়োজন আছে? তবু বিদ্যাপতি হাবভাবের সঙ্গে বেশভূষা মিলাইয়া মোহনতার সৃষ্টি করিয়াছেন—

আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি আধহি নয়নতরঙ্গ।
আধ উরোজে হেরি আধ আঁচর ভরি তবধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কনক কটোরা অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন ফাঁদ পশারল কাম॥

অঙ্গের এই আধ-নগ্নতা আধ-মগ্নতা রতিরসের দুর্নিবার উদ্দীপক।

বয়ঃসন্ধি—শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগপ্রসঙ্গে রাধার বয়ঃসন্ধি-বর্ণনার পদগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি পদে কেবল দশান্তরের বর্ণনা—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রমপরিপুষ্টির কথা। পর্যায় ও পরিবৃত্তি অলঙ্কারের সাহায্যে সংস্কৃত কবিদের অনুসরণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও হাবভাবের রূপান্তর দেখানো হইয়াছে। জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—

কৌটিল্যমাসীৎ সহজং কচেষু যৎ
তৎ সাংপ্রতং বাচি বিলোকনেঽর্পিতা।

ইহা পর্যায় অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত।

বাঙালী বিদ্যাপতির একটি পদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইনকে ক্ষীণ উনহি অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরণ প্রকট ফির উহ্নকে গেল॥
চরণচলন গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতল যাব॥

ইহা পরিবৃত্তি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত।

সাহিত্যদর্পণের নিম্নলিখিত শ্লোকটি হইতে কবিরা বয়ঃসন্ধির পদাবলীর প্রেরণা পাইয়াছেন—

মধ্যস্থ প্রথিমানমেতি জঘনং বক্ষোজয়োর্মন্দতা।
দূরং যাত্যুদরঞ্চ রোমলতিকা নেত্রার্জবং ধাবতি॥
কন্দর্পং পরিবীক্ষ্য নূতনমনোরাজ্যাভিষিক্তং ক্ষণা-
দঙ্গানীব পরস্পরং বিদধতে নির্লুণ্ঠনং সুভ্রুবঃ॥

রূপবর্ণনায় অলংকৃতি—ভারতীয় সাহিত্যে উৎপ্রেক্ষা, উপমা ও ব্যতিরেক অলঙ্কারের সাহায্যে নায়িকার রূপবর্ণনার গতানুগতিক প্রথা আছে। পদাবলীর বয়ঃসন্ধি-বর্ণনাতে ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগপ্রসঙ্গে অলঙ্কারের আতিশয্য দৃষ্ট হয়। এই প্রথায় রাধার অঙ্গসৌষ্ঠবের বর্ণনায় বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। অলঙ্কারগুলি মামুলি ধরণের নয়। সংস্কৃত কবির অলঙ্করণ বিদ্যাপতির হাতে নবকলেবর লাভ করিয়াছে মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ—

অপরূপ পেখলুঁ রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণহীন হিমধামা॥

নয়ননলিন দউ অঞ্জনে রঞ্জই ভাঙু বিভঙ্গী বিলাসা।
চকিত চকোর জোড় বিধি বান্ধল কেবল কাজরপাশা॥
গিরিবর গুরুআ পয়োধর পরশিত গিম গজমোতিম হারা।
কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভু 'পরি ঢারত সুরধুনীধারা॥

বিদ্যাপতির—

যাহাঁ যাহাঁ পদযুগ ধরই। তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥

এবং তাঁহার অনুকরণে গোবিন্দদাসের রচিত—

যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জোতি।
তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি॥

এই দুটি পদও উল্লেখযোগ্য।

রূপদর্শনের প্রভাব—রাধা একবার যৌবনের আবির্ভাব অনুভব করিয়া চাপল্য পরিহার করিতেছেন—আর বার ভুলিয়া যাইতেছেন তাঁহার যৌবনোন্মেষ হইয়াছে—এই দোটানার ভাবটিকে কবিরা রচনায় উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। এ যেন শৈশব-যৌবনের হিন্দোললীলা।

নিরজনে উরজ হেরত কত বেরি।
হাসত আপন পয়োধর হেরি॥

বালিকাদের সঙ্গে রাধা বালিকার মত খেলা করে, তরুণীদের সঙ্গে হাস-পরিহাস করে। কেহ যদি শ্লিষ্ট বচনে পরিহাস করে তবে 'কাঁদন মাখি হাসি দেয় গারি'—কাঁদনমাখা সুরে হাসির সঙ্গে গালি দেয়।

কবহু বাঁধয়ে কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহু উঘাড়ি॥
পেখলুঁ ব্রজ নবনারী।
তরুণিম শৈশব লখই না পারি॥

রাধার এই বয়ঃসন্ধিকালের হাবভাবগুলি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে দোলাচলবৃত্তি করিয়া তোলে। অনুরাগ না বিরাগ তিনি বুঝিতে পারেন না।

কিয়ে অনুরাগিণী কিয়ে বিরাগিণী বুঝইতে সংশয় ভেল।

সদ্যঃস্নাতা রাধা—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে নানা রসময় আবেষ্টনীতে নানা রাগোদ্দীপিকা দশাতেই দেখিয়াছেন, কিন্তু রাধার রূপ শ্রীকৃষ্ণকে সবচেয়ে মুগ্ধ করিয়াছে স্নানপথে ও স্নানের ঘাটে। বলা বাহুল্য, কবিত্বের দিক্ হইতে রসও বেশ জমিয়াছে বিতথ কেশ-বাসে স্নানার্থিনীর আধ-নগ্ন আধ-মগ্ন রূপবৈচিত্র্যকে অবলম্বন করিয়া।

স্নানপথের চিত্র—

সহচরি মেলি চললি বররঙ্গিণী কালিন্দী করই সিনান।
কনয়া শিরীষ কুসুম জিনি তনুরুচি দিনকর কিরণে মৈলান॥
সজনি, সো ধনী চিতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি চঞ্চল নয়নক ওর।
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর উতপত বালুক বেল॥
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজ তুহুঁ পাতুক করি নেল।
—গোবিন্দদাস

অর্থাৎ

সখীগণ সাথে চলে রঙ্গিণী নদীতে করিতে স্নান।
কনক শিরীষ জিনি তার তনু খর রবি করে ম্লান॥
সজনি—সে ধনী চিত্ত-চোর।
চোরের পন্থা মোরে দেখাইল চোরা কটাক্ষ ওর॥
তপ্ত বালির পথে সুকোমল চরণে সে ধীরে যায়।
সখি এ সজল দিঠি পঙ্কজ পানুই হ'লো সে পায়।

প্রখর রৌদ্রে পীড়িতা রাধাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় যেন করুণায় বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে। এই করুণা রতিরসেরই সঞ্চারী ভাব।

স্নানের ঘাটের চিত্র—

শুনহে সুবল পরাণ সাঙাতী কে ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে পায়ের উপর পা॥

সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে পড়েছে চিকুররাশি।
কান্দিয়া আঁধার কনক চাঁদার শরণ লইল আসি॥
চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিতে মোর।
সেই হতে মোর হিয়া নহে থির মনমথ জ্বরে ভোর॥
—চণ্ডীদাস (মতান্তরে লোচনদাস)

কবিত্বের দিক্ হইতে এই চিত্রটির তুলনা হয় না।

স্নানান্তের চিত্র—

যাইতে পেখলুঁ নাহলি গোরি।
কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি॥
কেশ নিঙাড়িতে বহে জলধারা।
চামরে গলয়ে যেন মোতিম হারা॥
অলকহিঁ তীতল তহিঁ অতি শোভা।
অলিকুল কমল বেড়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দূরে মণ্ডিত পঙ্কজ পাতা॥
সজল চীর রহ পয়োধর সীমা।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হীমা॥
ও নুকি করইতে চাহে কি দেহা।
অবহুঁ ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা॥
ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনে লাগল ভাব ও রূপ নেহারি॥—বিদ্যাপতি।

বর্ত্তমান যুগের ভাষায়

হেরিনু নাহিয়া যায় গোরোচনা গোরী,
কোথা হতে এত রূপ হরে তনু ভরি।

জলধারা বয় কেশ নিঙাড়িতে তার,
চামরে ঝরিছে যেন মুকুতার হার।
সিক্ত অলক দুলে কপোলেরে শোভি,
অলিকুল শতদলে যেন মধুলোভী।
নয়ন অরুণ হ'ল গলিয়া কাজল,
সিন্দূরে রঞ্জিত যেন বা কমল।
লিপ্ত সজল বাস পয়োধরভারে,
কনক বিল্ব যেন শোভিছে তুষারে।
নিজেরে ধনীর দেহে লুকাইতে চায়।
এখনি ত্যজিবে ধনী তাই ভয় পায়॥
ক্ষণিক এ রস, ফিরে না পাইবে আর,
এত ভাবি কাঁদে বাস গলে জলধার।
বিদ্যাপতি কহে শুনহে মুরারি,
বসনেও ভাব লাগে ও রূপ নেহারি।

দশম পরিচ্ছেদ

রূপমুগ্ধা রাধা—এই রূপমুগ্ধা রাধার চিত্তের চাঞ্চল্য বহু উৎকৃষ্ট পদের উপজীব্য। রাধার মনের এই অবস্থার বর্ণনায় চণ্ডীদাসের সমকক্ষ কেহ নাই।

১। ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদম্বকাননে চায়॥

২। রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।

পদ দুইটি সুবিখ্যাত, সেজন্য পদ দুইটি উৎকলন করিলাম না। উজ্জ্বল নীলমণির নিম্নলিখিত পদটির সহিত ইহার ভাবসাম্য আছে।

ত্বমুদবসিতান্নিষ্ক্রামন্তী পুনঃ প্রবিশন্ত্যসৌ
ঝটিতি ঘটিকামধ্যে বারান্ শতং ব্রজসীমনি।
অগণিতগুরুত্রাসশ্বাসান্ বিমুচ্য বিমুচ্য কিং
ক্ষিপসি বহুশোনীপারণ্যে কিশোরি দৃশোর্দ্বয়ং॥

এই শ্লোক হইতে চণ্ডীদাসের পদ—না—চণ্ডীদাসেরই পদ হইতে এই শ্লোক?

রাধার এই ভাবান্তর ও আত্মবিস্মৃতি সখীদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। সখীদের কৌতূহল, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা এই প্রসঙ্গে বহু পদের বিষয়-বস্তু হইয়াছে।

সখী যেন কিছুই জানে না, এই ভান করিয়া রাধাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—

চৌদিকে চকিত নয়নে ঘন হেরসি ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাঁতি বুঝই না পারিয়ে কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ॥
সুন্দরি, কী ফল পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গুপত প্রেম ধন জানলুঁ হিয়া মাহা সাঁচি॥

এ তুয়া হাস মরম পরকাশই প্রতি অঙ্গভঙ্গিম সাখী।
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই এতদিনে পেখলুঁ আঁখি ॥
গহন মনোরথে পন্থ না হেরসি জীতলি মনমথরাজ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ মৌনহিঁ সমঝলুঁ কাজ ॥

বর্তমান বাংলা ভাষায়—

চারিদিকে ঘন ঘন চকিত নয়নে চাহ
ঢাকিছ আবার ঢাকা অঙ্গ।
বচনভঙ্গী তব আমাদের বোধাতীত
কোথায় শিখিলে এই রঙ্গ ?
সুন্দরি, সখী সনে কি ফল প্রতারি' ?
শ্যামের পিরীতি ধন বুকে তব সুগোপন
খাঁটি যা তা বুঝিতে যে পারি।
মরম প্রকাশে তব হাসি, দেহে প্রতি নব
ভঙ্গিমা দেয় তার সাক্ষ্য।
গাঁটে তব সোনা বাঁধা ঝলকে বদনেতে তা যে,
কি হবে শুনে ও মুখে বাক্য।
গহন কামনাবনে পথ খুঁজ অকারণে
জিনিয়াছ মন্মথরাজ।
গোবিন্দদাস কয় কাজ নাই উত্তরে
মৌনেই হইয়াছে কাজ।

আসল কথা বুঝিয়াও সখী জিজ্ঞাসা করিতেছে—

কেনে তনু মোড়সি করি কত রঙ্গ ?
কেন— ঘামকিরণ বিনু ঘাময়ে অঙ্গ ?

উত্তর না পাইয়া সখী বলিতেছে—

ভাব কি গোপসি গোপত না রহই।
মরমক বেদনা বদন সব কহই ॥

চণ্ডীদাসের সখীর উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া ঘনশ্যামের সখী বলিতেছে—

নয়নক নীর থির নাহি বান্ধই ঘন ঘন মেটসি তাই।
সচকিত লোচনে জলদ নেহারসি মাগসি হাত বাড়াই॥
ক্ষণে ঘর বাহির করসি নিরন্তর খেনে খেনে দশ দিশি হেরি।
ময়ূর ময়ূরী সনে হাসি সম্ভায়ষি কণ্ঠ হেরসি ফেরি ফেরি॥
কেলিকদম্ব পুনহি পুন হেরসি ঘন ঘন তেজসি শ্বাস।
কালিন্দী নামে রোই উতরোলসি ভণ ঘনশ্যামর দাস॥

সনাতনের সখী বলিয়াছেন—

রাধে নিগদ নিজং গদমূলম্।

তাঁহার অনুকরণে বহু পরবর্তী কবিরাজদের সখীরাও শ্রীরাধার অভিনব ব্যাধির নিদান সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়াছেন। প্রয়োজন না থাকিলেও কোন কোন পদে বৈদ্য, ওঝা ইত্যাদির শরণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

একজন অতি দরদী সখী বলিতেছেন—কহিতে লজ্জা করিও না। তোমার জন্য অসাধ্য সাধন করিতে প্রস্তুত আছি।

এ তুয়া সঙ্গিনি রঙ্গিনি রসিকিনি কহিলে কি আওর লাজে।
ফণি মণি ধরব শমন ভবনে যাব যৈছে সিধারব কাজে॥
হাম আগুয়ানী আগুনি পৈঠব বৈঠব যোগিনি সাজে।
তন্ত্রমন্ত্র যত শত শত ঢূঁড়ব বূড়ব সাগর মাঝে॥

এই ভাবে সখীরা নানা রূপে রাধাকে আশ্বস্ত করিতেছেন। শ্যাম-রূপানলে সন্তপ্তা ও অনুতপ্তা রাধা বলিতেছেন—

কেন গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনা ঘাটে সেখানে ভুলিনু বাটে
তিমিরে গরাসল মোরে॥

সখীরাও অনেক সময় শ্রীমতীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—যাহা হইবার হইয়াছে—আর যমুনার ঘাটে যাইও না, সেখানে কদম্ব তরুমূলে 'চিকনকালা করিয়াছে থানা।'

কেন সে রূপ দেখিলাম বলিয়া একদিকে যেমন রাই অনুতাপ করিয়াছেন—অন্যদিকে তেমনি ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখা হইল না বলিয়াও তাঁহার অনুতাপের অন্ত নাই। কখনও বলিতেছেন—'ঘোমটা হইল কাল' কখনও বলিতেছেন—'ননদিনী হইল জঞ্জাল।' কখনও বলিতেছেন—

দারুণ দৈব কয়ল তুহুঁ লোচন তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরিষে তুহুঁ দিঠি পূরল কৈছে হেরব মুখ চাই ॥
তাহে গুরু দুরজন লোচনকণ্টক সঙ্কট কতহুঁ বিথার।
কুলবতী বাদ বিবাদ করত কত ধৈরজ লাজবিচার ॥

কখনও তিনি নিমেষরহিতা মীনপত্নীগণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমতী কখনও মন্মথকে, কখনও বিধাতাকে, কখনও নিজের অদৃষ্টকে, কখনও নিজের নারীজন্মকে ধিক্কার দিতেছেন। শ্রীমতী আর ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া সখীদের স্পষ্টই বলিলেন—

হা হা প্রাণ প্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানুপ্রেম বিনে মোর তনুমন জারে ॥
দিবানিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাই।
যথা গেলে কানু পাব তথা উড়ি যাই ॥

তোমরা একটা উপায় কর।

মুকুন্দ এই চারি চরণ অদ্বৈতাচার্যের গৃহে গান করিয়া শ্রীচৈতন্যকে উদ্দণ্ড কীর্তনে মাতাইয়াছিলেন। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ বলেন এই ভণিতাহীন পদটি চণ্ডীদাসের।

সখীরা শ্যামের কাছে গিয়া রাধার অবস্থা জানাইল—'রাই উন্মত্তা হইয়া বিলাপ করিতেছে, বনে গিয়া তমালতরু আলিঙ্গন করিয়া বিভোর হইয়া থাকে, বসনকেও গুরুভার বলিয়া মনে করে, কদম্ববন পানে চাহিয়া থাকে, আর তাহার অঙ্গে কদম্ব ফুটে, অকারণে হাসে, অঙ্গে অতিশয় তাপ ; গায়ের কাঁচা সোনার রঙ্ আর নাই,—

না করে ভোজনপান নিন্দ গেল অন্য স্থান,
না শুনয়ে বচন কাহার।

রাইএর বিরহদশা বর্ণনার কতকগুলি পংক্তি এই—

১। খনে খনে বর তনু ঝামর ভেল।
২। দূরে গেও বসন দূরে গেও লাজ ॥
৩। নাহ না চিহ্নই কালো কি গোর।
৪। বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল ॥
৫। অনুখণ ধরণি শয়নে অভিলাষ।
৬। চরণে লিখয়ে মহী নিশবদ হোই।
৭। দেখিয়া মেঘের জাল উড়িবারে চাহে পাখা করি।
৮। মাধব, কি তুয়া নয়ন সন্ধান।
কুল-গিরি বাজ লাজ বনকণ্টক
ভেদি পরাণ পর হান ॥
৯। তপত কনয়া তনু কাজর ভেল জনু।
১০। অরুণ অধর বান্ধলী ফুল পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল ॥
১১। অঙ্গুলি-অঙ্গুরী বলয়া ভেল।

বিরহিণীর দশ-দশার সবগুলিই অর্থাৎ লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য, তানব বা শীর্ণতা, জড়িমা, বৈয়গ্র্য বা ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ—শ্রীমতীর সবই ঘটিয়াছে, কেবল জীবনান্ত বাকি আছে। পদকর্তারা রসশাস্ত্রে উল্লিখিত বিরহের দশাগুলির সমস্ত লক্ষণ সখীদের মুখ দিয়া বিবৃত করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের সখী এককথায় বলিল—রাই শ্যামময়ী হইয়া গিয়াছে।

লোচনে শ্যামর বচনহি শ্যামর শ্যামর চারু নিচোর।
শ্যামর হার হৃদয়মণি শ্যামর শ্যামর সখী করু কোর ॥
মাধব, ইথে জনি বোলবি আন।
অচপল কুলবতী—মতি উমতায়লি কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান ॥

মরমহি শ্যামর পরিজন পামর ঝামর মুখ-অরবিন্দ।
ঝর ঝর লোরহি লোলিত কাজর বিগলিত লোচন-নিন্দ॥
মনমথ সাগর রজনী উজাগর নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর।
গোবিন্দদাস কতহুঁ আশোসায়ব মিলবহুঁ নন্দকিশোর॥

বর্তমান বাংলায়

লোচনে শ্যামের রূপ বচনে শ্যামের নাম শ্যামল বসন চারু অঙ্গে।
শ্যামফুলমালা গলে বুকে শ্যামমণি জ্বলে শ্যামা সখী ধরে উৎসঙ্গে॥
আন কথা বলো না মাধাই।
সতীকুল কামিনীর মতি উন্মাদিলে কি মোহিনী জান তা শুধাই॥
রাধার মরমে শ্যাম পরিজন দুর্জন নিষ্প্রভ মুখ-অরবিন্দ।
ঝর ঝর আঁখিজলে চোখের কাজল গলে তার সাথে লোচনের নিন্দ॥
মদনসাগর প্রায়, রাতি জাগরণে যায়, হে নাগর, রয়েছ বিভোর।
ভণে গোবিন্দদাস কত দিব আশ্বাস মিলিবে সে নন্দকিশোর।

শ্যামের ছলনা—সখীর আবেদনের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণকে পদকর্তারা বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য শঠ ও ছলনাময় করিয়া তুলিয়াছেন। এই ছলনারও একটা আধ্যাত্মিক সার্থকতা আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

কৈছন ইহ রাধা নাম। কভু নাহি শুনি গুণগাম।
পরনারী নয়নে না হেরি। ঐছন না বোলব ফেরি।

ইহা রায় রামানন্দের একটি সংস্কৃত শ্লোকেরই অনুসৃতি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'আমি ত তাহার মনে রতিভাবের সঞ্চার করি নাই। আমি কি অপরাধ করিলাম?'

তাই সখী বলিয়াছেন—

কাঁহা কুমুদিনী কাঁহা উয়ল হিমকর কাঁহা কমলিনী কাঁহা সূর।
ঝাট ঘটিত কর পরশন দরশনে পরিবাদহিঁ জগ পূর॥
মাধব, দেহ তুহুঁ শ্যামল মেহ।
দূর সঞে গরজি গরজি দরশাওত ঐছন মোর সিনেহ॥

হে মাধব, হিমকর যেমন কুমুদিনীকে, সূর্য যেমন কমলিনীকে, জলধর যেমন ময়ূরীকে (মোর-কে) দূর হইতেই প্রেমাকুল করে, তুমি তেমনি করিয়াই তাহাকে প্রেমাতুরা করিয়াছ।

সখী কখনও শ্যামকে তিরস্কার করিতেছেন, কখনও দশমী দশায় উপনীতা শ্রীমতীর জন্য কৃপাভিক্ষা করিতেছেন, কখনও বলিতেছেন—

যাচিত রতন উপেখয়ে যো জন
কভু নহে তাহারি কল্যাণ।

এই পদগুলিতে একই কথা বার বার পুনরুক্ত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে গোবিন্দদাস ও রাধামোহনের পদগুলিই উল্লেখযোগ্য।

শ্যামের প্রকৃত দশা—সখী অকারণেই এত অনুনয় বিনয় করিতেছেন। শ্যামের অবস্থা রাই-এর মতই শোচনীয়। অমন যে চপল নটরাজ, রাধার জন্য ব্যাকুল হইয়া মাধবী-তরুতলে চিবুকে বাঁশীর ঠেকনা দিয়া তিনি যোগীর মত ধ্যান করিতেছেন। এই চিত্রটি অপূর্ব।

রাধার নিকটে সখী শ্যামের অবস্থা বর্ণনা করিলেন—

কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নিরঝর ঝর কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ জ্বলতহিঁ চন্দনপঙ্ক॥
অব অবধারলুঁ রে—কানু তুয়া পরশক রঙ্ক।
নায়রি কোরে তো বিনু মুরুছই অপরুব মতন আতঙ্ক॥
জনু নব জলধর ধরণি লোটায়ত আকুল চিকুর বিথার।
রাধা নামে নয়ন ঘন বরিখয়ে আরতি কহই না পার॥
ধনি ধনি তুহুঁ ধনি রমণি শিরোমণি কানু সে তোহারি একন্ত।
তুয়া পদপঙ্কজ ভাগে নাহি ছোড়ত গোবিন্দদাস মতিমন্ত॥
কি হবে চন্দ্রকরে ঝর ঝর নির্ঝরে কিশলয় ফুলের পালঙ্কে।
কি হবে মলয়ানিলে ? অনলের জ্বালা জলে। গায়ে তার মলয়জপঙ্কে॥
তোমারি পরশ যাচে কালা।
নাগরী অঙ্ক'পরি মূর্ছিত তোমা স্মরি অপরূপ মদনের জ্বালা॥

শ্যামের আরতি ও পীরিতির কথা শুনিয়া শ্রীমতী আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু সখীরা যখন শ্যামের সঙ্গে মিলন ঘটাইতে চাহিলেন, তখন শ্রীমতীর কিশোরীসুলভ আতঙ্ক ও উদ্বেগ জন্মিল। তাহা ছাড়া, শ্রীমতী ভাবিলেন—তাঁহার ত বিজয়লাভ হইয়াছে—ইহার চেয়ে বেশি আর চাই কি? আমি যাহাকে ভালবাসিয়াছি—সেও আমাকে ভালবাসে, নারীজন্মের ব্রত ত উদ্‌যাপিত হইল। ইহার বেশি হইলে কলঙ্ক আছে, অপযশ আছে।

রাধার ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে পারে, সখীদের ব্রত এখনো উদ্‌যাপিত হয় নাই। রাধা-শ্যামের মিলন ঘটাইলেই ত সখীদের আনন্দ, প্রাণের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি, সখীজীবনের সার্থকতা। তাই তাহাদের অধ্যবসায়ের অবধি নাই—তাহাদের ছুটি নাই, ছুটাছুটিরও বিরাম নাই। সখীরা অনেক করিয়া বুঝাইলেন—

এ ধনী কমলিনী শুন হিত বাণী। প্রেম করবি যব সুপুরুষ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল। দহইতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভূত। যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সুত॥

সুপুরুষের প্রেম কখনও ছাড়িও না। আর তাহা ছাড়া—'চৌরি পীরিতি হোএ লাখগুণ রঙ্গ।' কুলবতী সতী সে রঙ্গের আস্বাদও জানে না। কানু তোমার জন্য নারীব্রত আশ্রয় করিয়াছেন। ইহা একেবারে বিপরীত ব্যাপার।

চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা-অবলম্বনকারী মঝু মনে লাগল ধন্ধা।

ধাঁধা লাগিবারই কথা। চাতক অম্বুদের জন্য তৃষিত হইয়া থাকে ইহাই ত চিরন্তনী রীতি, কিন্তু এ যে দেখিতেছি অম্বুদই চাতককে চাহিতেছে।

'মাধব বধিলে কি সাধিবে সাধে
সুন্দরি তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
কানুক নবমী দশা হেরি সহচরি ধরই না পার পরাণ॥

ইহার পর আর কি কথা আছে? রাই-এর জন্য কানু প্রাণ দিতে বসিয়াছে—কি নিদারুণ কথা! আর কিছু বলিতে হইল না।

সখীশিক্ষা—এইখানে কিছু সখীশিক্ষা আছে। সখীরা উপদেশ দিতেছেন—'রাধে, সহজে ধরা দিও না, বেশি সুলভ হইও না, নিজের মান বাড়াইয়া লইও।'

শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ।
আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
হেরইতে পিয়ামুখ মোড়বি গীম॥
পরশিতে দুহুঁ করে ঠেলবি পাণি।
মৌন করবি কহুঁ পুছইতে বাণী॥
যব হাম সোঁপব করে কর আপি।
সাধসে ধরবি উলটি মোহে কাঁপি॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রসবাট।
কামগুরু হোই শিখায়ব ঠাট॥

এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। রাধিকা স্বভাবতই নবোঢ়া নায়িকার মত মুগ্ধা—সঙ্গমভীতা। রাধার 'লেহ' যতদূর আগাইয়াছে দেহ ততদূর আগায় নাই। জীবন যতটা আগাইয়াছে, যৌবন ততটা আগায় নাই। তাই রাই ধ্বস ধ্বস অন্তরে সখীদের সঙ্গে শ্যামের রসকুঞ্জ পানে—

খেনে খেনে চৌঙকি পাদ পালটায়।
খেনে কাতর দিঠে সখীমুখ চায়॥
সখীগণ পুনপুন করে আশোয়াস।
রহি রহি ধনি হিয়ে উপজে তরাস॥

বিদ্যাপতি শ্লেষের দ্বারা বলিয়াছেন—এ যেন হরি (সিংহ) হরিণীর মিলন। সখীরা ব্যাধের মতন হরিণীকে ধরিয়া হরির মুখে

সমর্পণ করিল। গোবিন্দদাসও শ্লেষ-প্রয়োগে বলিয়াছেন, ভুজঙ্গরাজ (অন্যার্থে—রসবিদগ্ধের শিরোমণি) যেন হরিচন্দন শাখায় বেষ্টন করিল।

সখীরা শ্যামকেও সতর্ক করিয়া দিয়া বলিল—

কমলিনী কোমল কলেবর। তুহুঁ যে ভুখিল মধুকর।

অতএব—'পিব মধুপ বকুলকলিকাং দূরে রসনাগ্রমাত্রমাধায়।'

শিরীষ কুসুম জিনি তনু। থোরি সহবি ফুলধনু॥

অর্থাৎ কিনা—পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ।

শিরীষ কুসুম কথমপি সয় অলির চরণ-ভার
বিহগের ভার অসহন হয় তার।

মুগ্ধা নায়িকা রাধা—তারপর মুগ্ধা নবোঢ়া নায়িকার প্রিয়-সমাগমে যে দশা সংস্কৃত সাহিত্যে বিবৃত ও পারিবারিক জীবনে হয়ত অভিজ্ঞাত, পদকর্তারা সেই দশার বর্ণনা করিয়াছেন অনেকগুলি পদে। একটি পদ এই—

ধরি সখি আঁচরে ভই উপচঙ্ক।
বৈঠে না বৈঠয়ে হরি পরিযঙ্ক॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রস অভিলাষে আগোরল নাহ॥
লুবধল মাধব মুগধিনী নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঁয়ারী॥
পরশিতে তরসি করহিঁ কর ঠেলই।
হেরইতে বয়ন নয়নজল খলই॥
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপ।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ॥
শূতলি ভীত পুতলি সম গোরি।
চিত নলিনী অলি রহই আগোরি॥

গোবিন্দদাস কহই পরিণাম।
রূপক কূপে মগন ভেল কাম।

(রাধার সৌন্দর্যসম্ভোগে কৃষ্ণের এমনি পরিতৃপ্তি হইল যে কামের প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি কামনাতীত অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ করিলেন।)

মনে পড়ে রসমঞ্জরীর একটি শ্লোক—

হস্তে ধৃতাপি শয়নে বিনিবেশিতাপি
ক্রোড়ে কৃতাপি যততে বহিরেব গন্তুম্।
জানীমহে নববধূরথ তস্য বশ্যা
যঃ পারদং স্থিরয়িতুং ক্ষমতে করেণ॥

রাধার চিত্তও এখন পারদের মত। ইহাকে স্থিরত্ব দান কি করিয়া সম্ভব হইবে? আর একটি শ্লোকের কথা মনে হয় সাহিত্যদর্পণের—

দৃষ্টা দৃষ্টিমধোদদাতি কুরুতে নালাপমাভাষিতা।
শয্যায়াং পরিবৃত্য তিষ্ঠতি বলাদালিঙ্গিতা বেপতে॥
নির্যান্তীষু সখীষু বাসভবনান্নির্গন্তুমেবেহতে।
জাতা বামতয়ৈব সংপ্রতি মম প্রীত্যৈ নবোঢ়া প্রিয়া॥

কবি বলিতেছেন, নবোঢ়ার এই বামতা নবোঢ়া বধূতে যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে তাহা প্রীতির কারণই হয়। এই প্রীতি erotic নয়, æsthetic, তাই গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

রূপক কূপে মগন ভেল কাম।

বড়ু চণ্ডীদাসের গোঙার গোবিন্দ ও গোবিন্দদাসের বিদগ্ধ গোবিন্দের সম্ভোগে এইখানে তফাৎ।

সখীগণ তাহাদের মুগ্ধা সখীটিকে ভুজঙ্গম-ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া কি করিয়া দূরে যাইবে? তাই তাহারা আনাচে কানাচে রহিয়া গেল। চমৎকার অজুহাত! লীলাবিলাসিনী সখীদের এত অধ্যবসায়

কি সখীকে শ্যামের ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া সরিয়া পড়ার জন্য ? দূতী তাহাই করে, কিন্তু পদাবলীর সখী তাহা করে না।

রসোদ্‌গার—তারপর রসোদ্‌গারের পালা। শ্যামের সঙ্গে প্রথম মিলনের পরে শ্রীমতী ভাবান্তরিতা। লোকলজ্জা তিনি এখনো জয় করেন নাই—গুরুজনভয়ও তাঁহার আছে, সতীধর্ম ও কুলশীলের সংস্কারও তাঁহার মনে জাগিতেছে। কিন্তু প্রাণাধিকের সহিত সম্ভোগের আস্বাদ পাইয়া তাঁহার মনে আনন্দেরও অবধি নাই। এই যে অন্তরে হর্ষ বাহিরে ঔদাস্য, শ্রীরাধার এই চিত্রটি পদাবলী-সাহিত্যে অপূর্ব। সখীরা প্রশ্ন করিয়া উত্তর না পাইয়া বলিল—

গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই এতদিনে পেখলুঁ আঁখি।

শ্রীমতী মনের ভাব ও অঙ্গের উপভোগ-চিহ্নগুলি গোপন করিতেছেন, সখীদের কাছে তাঁহার এই 'অবহিত্থা' দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। কারণ—

নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতটং নির্মৃষ্টরাগোঽধরঃ।
নেত্রে দূরমনঞ্জনে পুলকিতা তন্বী তথেয়ং তনুঃ॥

শ্রীমতী যেন স্নান করিয়া ফিরিয়াছেন, অঙ্গে কোন প্রসাধনই নাই। চোর ধরিতে পারিলে গৃহস্থের মনে যে বিজয়োল্লাস জন্মে, সখীরা যেন শ্যামসম্ভুক্তা সাবহিত্থা শ্রীমতীর মনোভাব ধরিতে পারিয়া সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

প্রথম মিলনের রসকাহিনী শুনিতে সখীদের কৌতূহলের অন্ত নাই; গোবিন্দদাসের রাধা এক কথায় চরম উত্তর দিয়াছেন—

দূর কর এ সখি সো পরসঙ্গ। নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ॥
চেতন না রহু চুম্বন বেলি। কো জানে কৈসে রভস রসকেলি॥

অবশ্য শ্রীরাধার এই উত্তর অন্য নায়িকার ধার করা।

ধন্যাসি যা কথয়সি প্রিয়সঙ্গমেঽপি
বিশ্রব্ধ চাটুকশতানি রতান্তরেষু।

নীবিং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েণ
সখ্যঃ শপামি যদি কিঞ্চিদপি স্মরামি ॥

এই কথাই রাধার মুখে উচ্চারিত হইয়া লৌকিক অর্থ পরিহার করিয়া আধ্যাত্মিক সার্থকতা লাভ করিয়াছে। Mystic সাধকেরা তাই মূক, তাঁহারা অন্তরে কি ধন লাভ করিয়াছেন তাহা কখনো বক্তৃতা করিয়া বুঝান না, কখনো তত্ত্ব ব্যাখ্যান করেন না। অনির্বচনীয় দিব্যানন্দে তাঁহারা তন্ময়।

সখীরা শ্রীমতীর এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া নিশ্চয়ই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন—তখন গোবিন্দদাসের রাধা উত্তেজিত হইয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাই চরম কথা।

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যবধরি পেখলুঁ কান।
তবধরি কোটি কুসুম শরে জরজর রহত কি যাত পরাণ ॥
সজনি—জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই তছু পদে মঝু পরণাম ॥
সুনয়নি কহত কানু ঘন শ্যামর মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতি তাক পরশ রসে ভাসত হামারি হৃদয়ে জ্বলু আগি ॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত চপল জিবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে রসবতি রস মরিযাদ ॥

মর্মানুবাদ :

আধের আধের আধ দৃষ্টির কোণ দিয়া
হেরি তারে, তদবধি হায়।
হ'ল দেহ কোটি কোটি ফুলশরে জর জর,
পরাণ ধরাই হলো দায় ॥
সজনি, বুঝিলাম বিধি মোরে বাম।
দুইটি নয়ন ভরি যে তারে হেরিতে পারে
তার পায়ে আমার প্রণাম ॥

মেঘের মতন শ্যাম কয় কোন সুনয়নী
মোর লাগে বিজুলি বিথার।
কোন' রসবতী শুনি ভাসে সে পরশরসে
জ্বলে বুকে অনল আমার।
প্রেমবতী তার প্রেম লাগিয়া জীবন ত্যজে,
চপল জীবনই চায় রাধা।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতী-রসের মর্যাদা॥

সুনয়নীরা বলে শ্যাম বুঝি মেঘের মত—আমি ত দেখি সে বিদ্যুন্ময়। রসবতীরা তাহার স্পর্শরসে ভাসে, আমার ত হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়া উঠে। সুনয়নী রসবতীরা তাহার সোহাগ আদরের কথা বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে পারে—আমি আর কি বলিব? ইহা কি লৌকিক ভাষায় ব্যক্ত করা যায়? এই কথার পর সখীদের আর কিছু জিজ্ঞাসা করাও উচিত নয়—রাধারও আর কিছু বলা চলে না। গোবিন্দদাসের এই চূড়ান্ত পদটির পর বিদ্যাপতির রসোদ্গারের পদগুলি পতৎপ্রকর্ষ।

রসোদ্গারের পদগুলি সাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। উপভুক্তার অঙ্গে সম্ভোগচিহ্ন লইয়া সখীদের রসিকতা ও পরিহাস, শ্রীমতীর অবহিত্থা ও জুগুপ্সার প্রয়াস সংস্কৃত রস-সাহিত্যেরই অনুস্মৃতি। এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলিও বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্য হইতে আহৃত।

ক্রমে রাধিকার ভয়-দ্বিধা দূর হইল। তাহাই স্বাভাবিক। একজন কবি বলিয়াছেন, প্রথম মিলনে কৃতান্তে ও কান্তে প্রভেদ থাকে না বটে কিন্তু বৎসর কালের মধ্যে অখিল জগৎ প্রিয়তমময় হয়।

কৃতান্তঃ কান্তো বা সমজনি ন ভেদঃ প্রথমতঃ
ইতি জগ্রাহ হৃদয়ম্।

ততোঽসৌ মৎপ্রেয়ানহমপি চ তস্য প্রিয়তমা
ক্রমাদ্ বর্ষে জাতে প্রিয়তমময়ং জাতমখিলম্।

রাধার এক মাসেই এক বৎসরের কাজ হইয়া গেল। মিলনাস্বাদ লাভ করিয়া রাধার আরতি সহস্রগুণে বাড়িয়া গেল। গৃহ অগ্নিবেশ্মে পরিণত হইল। রাধা সাহসিকা হইয়া বাসকসজ্জিকা সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতীক্ষমাণার ভয়-দ্বিধা-উৎকণ্ঠা-ব্যাকুলতা-অবলম্বনে বহু উৎকৃষ্ট পদ রচিত হইয়াছে। এই পদগুলির প্রধান প্রেরণা আসিয়াছে গীতগোবিন্দ হইতেই। গীতগোবিন্দেই এই শ্রেণীর পদের সূত্রপাত।

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তং। ত্বদধর মধুর মধূনি পিবন্তং॥
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে।

বাসগৃহে অর্থাৎ বাসকগৃহে। গীতগোবিন্দের এই ভাবই বহু পদে পুনরুক্ত হইয়াছে।

এই বাসকসজ্জার অনিবার্য পরিণতি খণ্ডিতায়, নতুবা মানের আবির্ভাব হয় না। মানই ত রাগরসের চূড়ান্ত। খণ্ডিতার কথা বলিবার আগে অভিসারের কথা বলিতে হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অভিসার—ইংরাজি সাহিত্যে আছে নায়কের Serenade—আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে আছে নায়িকার অভিসার। নায়িকার পক্ষে প্রিয়জনের সঙ্কেতে তাহার কাছে উপগমন খুব সাহসিকার—এমন কি নির্লজ্জতার কাজ। প্রেমমুগ্ধাকে এইরূপ সাহসিকা ও আত্মবিস্মৃতা বানাইয়া কবিরা অপূর্ব রসসৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে পুরুষ স্থাণু ও নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই জঙ্গমা ও ক্রিয়াশীলা। এই দার্শনিক তত্ত্বই আমাদের দেশের সাহিত্যকে বরাবর আবিষ্ট করিয়া আসিতেছে। পুরুষ যায় হরণের জন্য, আর নারী যায় বরণের জন্য। তাহা ছাড়া, ভারতীয় প্রকৃতির মধ্যে কবিরা দেখিয়াছেন, পর্বতগৃহ হইতে অবতরণ করিয়া নদীগুলি দুই কূল ভাসাইয়া দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্যা হইয়া সমুদ্রের দিকেই ধাবিত হয়। সেই আনুরূপ্যেই সাহিত্যে যেন নায়িকার অভিসার।

পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীরাধার অভিসারই সমগ্র লীলাতত্ত্বের মেরুদণ্ড। অভিসারে গতানুগতিক গৃহশৃঙ্খল, লজ্জাকুলশীল, সংসার-ধর্ম, পরিজন-গুরুজনের ভয় সমস্তই দূরীভূত ও পরাভূত। কণ্টক, উত্তপ্ত বালুকা, সর্প, বজ্র, দারুণ বর্ষা, গভীর শৈত্য, সূচিভেদ্য অন্ধকার ইত্যাদি সমস্ত প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্ন উপেক্ষিত, অভিসারিকার দেহাত্ম-বুদ্ধি পর্যন্ত বিলুপ্ত। ইহাই প্রেমাবেগের চূড়ান্ত। ইহা যেন লৌকিক গণ্ডী উত্তরণ করিয়া আধ্যাত্মিক প্রেমের স্বরূপই প্রকাশ করিতেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের অভিসার লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম করে নাই। কিন্তু পদাবলীর অভিসার লোকোত্তরতা লাভ করিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে—সাহিত্যের অভিসার পথ বিদিশা কি উজ্জয়িনী—এমনি একটি নর-লোকের কোন পৌর পথে আর রাধার অভিসার—অপ্রাকৃত মায়ালোক বৃন্দাবনের পথে।

ব্রজবেণু বা বিশ্ববেণু চিরকালই বাজিতেছে, কয়জনই বা শোনে? যে শোনে সে পাগল হইয়া, সব বাধা পায়ে ঠেলিয়া রাধার মতই তাহার ধ্বনি অনুসরণ করিয়া ছুটে। রাধার অভিসারের চমৎকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে আনন্দের নব নব পর্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে
নিত্য পুষ্প নিত্য চন্দ্রালোকে।
নিত্যই সে একা। সে-ই একান্ত বিরহী
যে অভিসারিকা তারই জয়।
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।
সেও ত নেই স্থির হ'য়ে যে পরিপূর্ণ।
সে যে বাজায় বাঁশী। প্রতীক্ষার বাঁশী,
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা—
পদে পদে মিলেছে একতানে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে। (পুনশ্চ)

রূপাভিসারে শ্যামের পক্ষে যাহা রূপোল্লাস, নিত্যের পক্ষে তাহাই পরিপূর্ণতার আনন্দ। যে পথে অনিত্য জীব নিত্যের অভিমুখে ধাবিত হয় সে পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় নিশিত দুরত্যয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিসারের পথ তাই অতি দুর্গম, বিঘ্নসঙ্কুল। কবিরা দুর্গমতা সৃষ্টিতে স্বাভাবিক সীমা লঙ্ঘন করিয়া সকল প্রকার বাধাবিঘ্নের একত্র সমবায় ঘটাইয়াছেন। প্রাকৃত গণ্ডী হইতে আমাদের চিত্তকে বিচ্ছিত্তি-দানই যেন তাঁহাদের অভিপ্রেত। বিনা সাধনায় এ পথে চলিবার বল ও সাহস পাওয়া যায় না। তাই কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দুস্তর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে মন্দিরে যামিনি জাগি॥

অর্থাৎ— কণ্টক গাড়ি ভুঁয়ে সুকোমল পদতল
মুখর নূপুর চীরে ঝাঁপি।
গাগরীর বারি ঢালি পিছল করিয়া পথ
চলে ধনী অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব, ধনী তব অভিসার লাগি।
দুস্তর পথ 'পরে গতি অভ্যাস করে
গৃহের আঙনে রাতি জাগি॥

নিত্যের অভিমুখে যাত্রা করিতে হইলে এইভাবে তপস্যা করিতে হয়।

কালিদাস রতিবিলাপে তিমিরাবগুণ্ঠিত ঘনশব্দবিক্লব পুরমার্গে অভিসারের উল্লেখ করিয়াছেন। মেঘদূতে কনকনিকষস্নিগ্ধা সৌদামিনীর সাহায্যে সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে উজ্জয়িনীর রাজপথে অভিসারের কথা আছে। বর্ষারাত্রিতে কদম্বের গন্ধে পথ চিনিয়া অভিসারের কথাও সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে অভিসারিকার যে বর্ণনা আছে, পদাবলী সাহিত্যে তাহার সবই আছে এবং তাহার অতিরিক্ত অনেক কিছু আছে। সংস্কৃত কবিরা অভিসারের সময় নির্দেশ করিয়াছেন সাধারণতঃ অন্ধকার নিশীথকাল।

উজ্জ্বল নীলমণিতে অভিসারিকার লক্ষণ—

যাভিসরতে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা॥
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ॥

জ্যোৎস্নারাত্রির অভিসারিকা জ্যোৎস্নী, অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা তামসী। কুলবধূর অভিসারে অধীর মুখর মঞ্জীরাদি

চাভূষণ ত্যাগ করিতে হয়, লজ্জাগুণ্ঠিতা হইয়া প্রিয় সখীকে সঙ্গে করিয়া যাইতে হয়।

পদাবলীর কবিরা জ্যোৎস্না রাত্রিতে, সন্ধ্যাকালে ও মধ্যাহ্নে অভিসারের বর্ণনা করিয়াছেন। অপরাহ্ণে যমুনায় গাগরী ভরিতে যাওয়াও রাধার অভিসার, যে পথে কানাই দানী সাজিয়া পথরোধ করে, সে পথ দিয়া মধ্যাহ্নে দধি-ক্ষীর বেচিতে হাটে যাওয়াও অভিসার, আবার পতির মঙ্গলকামনায় পূর্বাহ্ণে দেবারাধনায় যাত্রাও একপ্রকার অভিসার। পরমেষ্ট ধনের উদ্দেশে অভিসার-যাত্রায় কি আর সময় অসময় আছে—দিন-ক্ষণ আছে—না—উপলক্ষ্যের অবধি আছে? এজন্য কি শাস্ত্র বা পঞ্জীর অনুশাসন খুঁজিতে হয়?

গোবিন্দদাস বলিয়াছেন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে অভিসারের কথা। চন্দন, কর্পূর, মুক্তাহার, কুন্দকুসুম, শ্বেতাম্বর ও শুভ্রজ্যোৎস্নার সহিত মিশিয়াছে রাধার গৌর-দেহের লাবণ্য—তাহার উপর রাধা অবিরল হাস্যে কুন্দ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছেন। শুভ্রে শুভ্রে মিলিয়া গিয়াছে—অভিসারিকাকে আর চিনিবার উপায় নাই।

রঙ্গপুতলি যেন রস মাহা বুর।
(রাঙের পুতলী যেন পারদে মগন।)

জ্যোৎস্নাধবলা রজনীই ত গৌরী রাধার অভিসারের উপযুক্ত কাল। ইহা অবশ্য গোবিন্দদাসের আবিষ্কার নয়। জ্যোৎস্নাভিসারের সংজ্ঞা কবির জানা ছিল।

মল্লিকাচিতধম্মিল্লাশ্চারুচন্দনচর্চিতাঃ।
অবিভাব্যাঃ সুখং যান্তি চন্দ্রিকাস্বভিসারিকাঃ॥

এই অভিসার বর্ণনা "মীলিত" অলঙ্কারের কলাচাতুর্য প্রদর্শন মাত্র।

অন্ধকার রাত্রি ত সকলের দৃষ্টি এড়াইবার উপযুক্ত কাল বটেই। কিন্তু রাধা যে গৌরাঙ্গী, অন্ধকার গগনে অনুরাধার মত রাধা সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তাই গৌরাঙ্গী রাধার সর্বাঙ্গ নীলবসনভূষণে সমাবৃত করিতে হইয়াছে।

নীল নলিনী জনু শ্যামর সায়রে লখই না পারই কোই।

বসন্তনিশীথে গৃহে থাকা যে কঠিন, তাহা সকল কবিই স্বীকার করেন। বসন্তনিশীথের অভিসারে বৈষ্ণব কবিদের ভূষাবৈশিষ্ট্য বা কলাচাতুর্য প্রকাশের প্রয়োজন হয় নাই।

বসন্তনিশীথ অপেক্ষা শীতের নিশীথের অভিসারে বরং বৈচিত্র্য আছে।

রাধার সজনীরা বলেন,—গভীর শীতের রজনীই ত অভিসারের প্রকৃষ্ট কাল। শীতের রজনীতে সকলেই দীপ নিভাইয়া দ্বার-বাতায়ন বন্ধ করিয়া ঘুমে বিভোর হইয়া থাকে, পথেও লোকজন থাকে না, অভিসারের এমন সুযোগ আর কখন মিলিবে? সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া শীতের নিশীথে অবাধে নির্বিঘ্নেই অভিসার চলিতে পারে। পদকর্তারা পৌখলী রজনীতে বনের মধ্যে প্রতীক্ষমাণার বেদনা-বর্ণনার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন। মন্দিরের সুখশয্যা পরিহার করিয়া হিমময়ী রজনীতে হেমময়ী রাধার শ্যামের জন্য প্রতীক্ষা—রীতিমত হৈমবতীর মত তপস্যা। শুধু তাহাই নয়, শীতের রাত্রি সুদীর্ঘ। এমন দীর্ঘ শীতের রজনীতেও শ্যাম যদি কুঞ্জে আসিতে বিলম্ব করেন—তাহা হইলে 'বিদীঘল' রজনীতে 'উজাগরময়ী' রাধার নয়নপল্লবও শিশিরবিন্দুতে ভাসিয়া যায়।

বর্ষার অভিসারই নিদারুণ অভিসার। বর্ষাভিসার প্রসঙ্গে কবিরা পথের দুর্গমতা নানাভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। যতপ্রকার বিঘ্নবাধা ঘটিতে পারে সবগুলিই একত্র গুম্ফিত হইয়াছে। এপথে যাত্রা করিলে ভুবন-জীবনের মায়া একেবারে পরিহার করিতে হয়—এ শুধু সাধনা নয়—ইহা দারুণ আত্মনিগ্রহ। চরম আত্মবিস্মরণের কথা এই প্রসঙ্গে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ। বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ॥

ইহা দেহাত্মবোধ বিলোপেরই কথা। সবার দৃষ্টি এড়াইয়া এই ত অভিসারের প্রকৃষ্ট কাল। ভিতের গায়ে চিত্রিত ফণী দেখিয়া যে ধনী

চমকিয়া কাঁপিতে থাকে—সেই ধনী অভিসার পথকে নিরালোক করিবার জন্য পথের ফণীর মাথার মণির আলোক হাত দিয়া চাপা দিতেছেন। ইহা অবশ্য antithesis-এর চাতুর্য মাত্র। কিন্তু মর্মার্থ এই—রাধা বর্ষার অভিসারের পথে কি অসাধ্য সাধনই না করিয়াছেন! বর্ষানিশীথে দুর্গমপথের অভিযাত্রিণী রাধাকে সখী বলিতেছেন—

মন্দির বাহিরে কঠিন কবাট। চলইতে পঙ্কিল শঙ্কিল বাট॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদল দোল। বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈসে করবি অভিসার। হরি রহু মানস সুরধুনী পার॥
(গোবিন্দদাস)

প্রেমের জন্য কি জীবন দিবি?
শ্রীমতী উত্তর দিতেছেন—
কুল মরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে পঙরলুঁ তাহে কি তটিনি অগাধা॥

ইহা ত' অলঙ্কারের শিঞ্জন মাত্র। আসল কথা—

সজনি মঝু পরীখন কর দূর।
যৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরই হরি সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।

কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছু 'পর তাহে কি জলদ জল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ তাহে কি বজরক আগি॥

বর্ষার দুর্গম পথে শমনভয় দমন করিয়া শ্রীরাধা চলিয়াছেন। ইহাতে প্রেমোৎকণ্ঠার অসাধারণতা সূচিত হইতেছে।

সখী বলিয়াছেন—বর্ষার দুর্গম ঘোর অন্ধকারময় পথ। এ পথে কেহ যে সহায় নাই।

বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

যামিনি ঘোর আঁধিয়ার। মন্মথ হিয়ে উজিয়ার॥
(নন্বস্তি পুষ্পিতশরো মদনঃ সহায়ঃ।)

গোবিন্দদাস মন্মথকে প্রাধান্য দেন নাই, মন্মথমথনকেই প্রাধান্য দিয়া বলিয়াছেন—অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।

গ্রীষ্মের দুপুর বেলার অভিসারও দারুণ আত্মনিগ্রহ।

মাথহিঁ তপন তপত পথবালুক আতপ দহন বিথার।
ননিক পুতলী তনু চরণকমল জনু দিনহি কয়ল অভিসার॥

শ্যামের সঙ্গে মিলন যে কত কৃচ্ছ্রসাধ্য তাহা বুঝাইতে পদকর্তারা প্রয়াসের ত্রুটি করেন নাই। শ্রীমতীর চরণকমলের প্রতি কবির এই যে মমতা তাহা পূর্বসূরিদের অনুস্মৃতি মাত্র নয়। বৈষ্ণব কবি-ভৃঙ্গদের ঐ কমলই যে সম্বল। সর্বত্রই শ্রীমতীর সর্ববিঘ্নবিজয়িনী সর্বভীতিহারিণী আত্মবিস্মৃতি ও বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যতা সুপ্রকট।

সবচেয়ে আত্মবিস্মৃতিব ভাব ফুটিয়াছে ভ্রমাভিসারে। এই ভ্রমাভিসারের বর্ণনায় বংশীবদন বলিয়াছেন—বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীমতীর আর তর সয় না—

রাই সাজে বাঁশী বাজে পড়ি গেল উল।
কি করিতে কিবা করে সব হৈল ভুল॥
করেতে নূপুর পরে পায়ে পরে তাড়।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা॥

কবি অবশ্য ভাগবত হইতে প্রেরণা ও রসশাস্ত্র হইতে উপাদান পাইয়াছেন। ভাগবতে রাসলীলা প্রসঙ্গে এইরূপ বর্ণনা আছে। রসশাস্ত্রে বলে—

বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ।
বিভ্রমোহারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্যয়ঃ॥

একজন কবি রাধাকে ডঙ্কা বাজাইয়া বিজয়িনীরূপে অভিসার করাইয়াছেন। রাধা কুলশীল ভয়-দ্বিধা সব জয় করিয়াছেন, অতএব

তাঁহার অভিসার বিজয়যাত্রা। তাঁহার-ত তস্করীর মত লুকাইয়া যাইবার কথা নয়। তিনি লিখিয়াছেন—

পিঠে দোলে হেম ঝাঁপা রঙ্গিয়া পাটের খোপা
চৌদিকে সখীরা চলে সঙ্গে।
নাসায় মুকুতা সাজে ডম্ফ রবাব বাজে
সভে চলে মদন-তরঙ্গে॥

বিদ্যাপতি রাধিকাকে বড়ই দুঃসাহসিকা করিয়াছেন। তিনি পুরুষবেশে রাধার অভিসারের বর্ণনা করিয়াছেন। রাজপথে পুরজন জাগিয়া আছে—জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা। রাধিকার আর ত্বর সহে না। তিনি—'পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার।'

যদুনাথ দাস, দীনবন্ধু দাস, ঘনশ্যাম দাস ইত্যাদি কবিরা সুবল-বেশে রাধার অভিসার ঘটাইয়াছেন। রাধার বেশ ধরিয়া সুবল আয়ানের ঘরে গৃহকর্ম করিতে লাগিলেন—রাধা সুবলের বেশ ধরিয়া দিবাভাগে অভিসারে চলিলেন।

অভিসারে আত্মবিস্মৃতি বা আত্মসংবৃতির সঙ্গে যে শালীনতা ও সলজ্জতার মাধুর্য জড়িত—বহু পদকর্তা তাহা হরণ করিয়া ছলনার কৌশলকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। এইগুলি কলাচাতুর্যপ্রদর্শনের জন্যই পরিকল্পিত। এইগুলিতে লোকাতীত ব্যঞ্জনা কিছু নাই।

উজ্জ্বলনীলমণিতে রূপগোস্বামী রাগের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষে স রাগ ইতি কীর্ত্যতে॥

অতিশয় দুঃখও প্রেমাতিশয্যে যখন সুখরূপে অনুভূয়মান হয় তখনই রাগ জন্মে। অভিসারে সেই রাগেরই কথা বলা হইয়াছে। বর্ষারাত্রে বহু কষ্টে শ্রীমতী চলিয়াছেন—

তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ চির দুখ অব সুখ ভেল।

শীতের রাতে—

পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হীম হীমকর বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ॥

এমন সময়ে কণ্টক-বাটে তুহিন দলিয়া শ্রীমতী চলিয়াছেন—পথক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া গণ্য করিতেছেন না।

গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

কিযে বিঘিনি যাঁহা নূতন নেহ।

আবার গ্রীষ্মের দুপুরে এত যে পথের কষ্ট—

কানু পরশরসে পরবশ রসবতী পন্থহি গেও সব ভুলি।

অভিসারে বেশভূষা সাজসজ্জার আয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু কোন কোন পদে বিপরীত প্রথার কথাও আছে, তাহাতেই বৈষ্ণব কবিদের প্রকৃত কবিধর্ম প্রকট হইয়াছে।

গোবিন্দদাসের রাধা বলিয়াছেন—

সজনি, কি ফল বেশ বনান।
কানু পরশমণি পরশক-বাধন অভরণ সৌতিনি মান॥
যো তনু পরশে পুলক জনু বাধন ইথে নাহি চমকে পরাণ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনি ধনি কানু মরম তুহুঁ জান॥

কানু-স্পর্শমণির স্পর্শলাভে যে আভরণ বাধার সৃষ্টি করে রাধা তাহাকে সৌতিনী (সতীন) বলিয়া মনে করেন। পুলকাঙ্কুরও পূর্ণ মিলনে বাধা হয়, বেশভূষার ত কথাই নাই।

ইহাতে আধ্যাত্মিক-সাধনায় আচার অনুষ্ঠানের উপচার উপকরণের অসারতা দ্যোতিত হইয়াছে। রাজসিকতার স্পর্শমাত্র থাকিলেও সাত্ত্বিক রাগসাধনার অঙ্গহানি হয়—কবি তাহাই কি বলিতে চাহিয়াছেন বেশবিন্যাসবিমুখতার কথায়?

বাসন্তী সন্ধ্যায় অভিসারিকার ব্যাকুলতা এত বেশি যে সঙ্কেত সময়ের আগেই তিনি কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। কারণ, 'মধুযামিনি অতি ছোট।' শ্রীমতী ঘর-বাহির করিতেছেন আর—"নিমিখ মানয়ে যুগ কোটি।"

শ্রীমতীর কাছে তাঁহার নিজের বেদনা তুচ্ছ। ঘোর বর্ষা-রজনীতে শ্যাম কি করিয়া আসিবেন, সে কথা ভাবিয়া শ্রীমতীর উদ্বেগের অন্ত নাই।

এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনি কেমনে আয়ব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া পথপানে নিরখিয়া॥

শ্রীমতী ভাবিতেছেন—

তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে পন্থ হেরই মোর॥

বাসকসজ্জিকা রাধা লতাগৃহে উৎকণ্ঠিতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু—

কথিত সময়েঽপি হরি-রহহ ন যযৌ বনং।

নির্দিষ্ট সময়ে শ্যাম বনে না আসিলে রাধার বেদনার অন্ত থাকে না। ননীর পুতলি সুকুমারী শ্রীমতীর পক্ষে পিচ্ছিল পঙ্কিল শঙ্কিল পথে অভিসারে আসাই আত্মনিগ্রহের চূড়ান্ত, রাখালবীর অসমসাহসী গোপনন্দনের পক্ষে কিছুই কৃচ্ছ্রসাধ্য নয়। তবু শ্রীমতীর দরদের ও উদ্বেগের অন্ত নাই। ইহা রাগধর্মের অতি উচ্চস্তরের কথা। তবু ইহা চন্দ্রাবলীভাবেরই দ্যোতনা। "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" "মহাভাবস্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীকে" ইহাতে হয়ত পাওয়া যায় না। এই প্রতীক্ষার শেষ হইবে—শ্যাম আসিয়া বিলম্বে কুঞ্জে প্রবেশ করিবেন। রাধার উদ্বেগের অবসান হইলে রাধা কিন্তু অন্য রূপ ধরিবেন। শ্যাম উৎসাহভরে শ্রীমতীর নিকটে আসিয়া বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া দেখিবেন—শ্রীমতী বসনে মুখ ঢাকিয়া বিমুখী

হইয়া বসিয়া আছেন। দেখিবেন—বংশীধ্বনি শুনিয়া বনপথে ধাবমানা গোপবালা—"মহাভাবস্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণী" হইয়া বসিয়া আছেন। এইখানেই বৈষ্ণব রাগসাধনার চূড়ান্ত—অভিসার ইহাতেই পৌঁছিবার পথমাত্র।৬

রাধার এই অবস্থা লইয়া জয়দেবের অনুকরণে অনেকগুলি সুন্দর পদ রচিত হইয়াছে।

জয়দেবের শ্রীরাধা বলিয়াছেন—

অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্॥

গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা বলিয়াছেন—

কানুক বচন অমিয়ারসসেঁচনে বেচলুঁ তনু মন জাতি।
নিজ কুলভূষণ দূষণ করি মানলুঁ তেঞি ভেল ঐছন শাতি॥

যাকর লাগি মনহি মন গোই।
গড়ল মনোরথ না চড়ল সোই॥

যাহার জন্য মনে মনে গোপনে মনোরথ গড়িলাম—সেই তাহাতে চড়িল না। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের দুইটি চরণ বড়ই কবিত্বময়—

কুসুম তুলিয়া বোঁটা ফেলাইয়া শেজ বিছাইনু কেনে।
যদি শুই তায় কাঁটা ভুঁকে গায় রসিক নাগর বিনে॥

বোঁটার সঙ্গে পাছে কাঁটা থাকে এই ভয়ে বোঁটা ফেলিয়া ফুল দিয়া শয্যা রচনা করিলাম, তাহা রসিক নাগরকে না পাইয়া কাঁটায় ভরিয়া উঠিল।

জয়দেবের রাধা ভাবিতেছেন—

অন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিমুদ্ভ্রাম্যতি

শ্রীকৃষ্ণ কি অন্ধকারে বনে পথ হারাইলেন? গোবিন্দদাস শ্রীরাধাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন—হাঁ, শ্যামকান্তির দিগ্‌ভ্রান্তিই

ঘটিয়াছে—অন্য কোন গুরুতর কারণ নাই। শ্রীকৃষ্ণ অন্য কামিনীর দ্বারা মধ্যপথে অবরুদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া জয়দেবের রাধা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীরূপের রাধার মনেও একবার সন্দেহের উদয় হইয়াছে। নরোত্তম দাসের রাধাও বলিয়াছেন—

বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই সাধে নিরমিলুঁ আশাঘর।
কোন কুমতিনি মোর এ ঘর ভাঙিয়া দিল আমারে ফেলিয়া দিগন্তর॥

কিন্তু নরোত্তম দাস চিরদিন রাধাকে আশ্বস্ত করেন, তিনি রাধাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন—

ধৈরজ ধরহ ধনি ধাইয়া চলিলুঁ গো।

সখীরা রাধার দশা দেখিয়া শ্যামকে আনিতে ধাইয়া গেল। বিদ্যাপতির সখীরা শ্যামকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে—

মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ। সুধাসিন্ধু তেজি ক্ষারে তিয়াষ॥
ক্ষীরসিন্ধু তেজি কূপে বিলাস। ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ॥

গোবিন্দদাসের সখী ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন—

তোমার—

নয়নক অঞ্জন অধরে ভেল রঞ্জিত নয়নহি তাম্বূল দাগ।
সিন্দুর বিন্দু চন্দন ঝাঁপল উরপর যাবকরাগ॥

এইরূপ ঝামর দেহ কোন গোঙারীও স্পর্শ করিবে না। কেন আর রাধার প্রতি রসলালসা দেখাইতেছ? সখীদের এই উপালম্ভ সখ্যরসের সখীভাবের চরম কথা। এই বিশুদ্ধ রাগরস সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যভাববর্জিত—কাজেই কৃষ্ণের কর্ণে সুধার মত সুমধুর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

খণ্ডিতা—শ্রীকৃষ্ণ রজনীশেষে আরক্তলোচনে পীতবসনের স্থলে চন্দ্রাবলীর নীলবসন পরিয়া শ্যামর অঙ্গ ঝামর করিয়া রাধার কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত। তাঁহার কপোলে ও কপালে সিন্দূর কজ্জলের দাগ, বুকে কঙ্কণ ও শঙ্খের চিহ্ন। এ সমস্ত চিরপ্রচলিত কাব্যরীতিগত ব্যাপার।

যাহাই হউক, শ্যাম ত হাতেনাতে ধরা পড়িলেন। কিন্তু শ্যামও সহজে দোষ স্বীকারের পাত্র নহেন। ধৃষ্ট নাগর আত্মসমর্থনের চেষ্টা করিলেন। ফলে, রাধাশ্যামের একটা রসকলহ বাধিয়া গেল। কবিদের ইহা একটা মাহেন্দ্র সুযোগ। এই রসকলহই খণ্ডিতা-পর্যায়ের পদাবলী।

শ্রীকৃষ্ণের আত্মসমর্থনের দুই-একটি নিদর্শন এই—

১। ধীর নয়নে ধনি তুয়া পথ হেরইতে কুসুম পরাগ তঁহি লাগি।
নয়নক আরকত বাড়ল সাতিশয় তাহে পুন যামিনি জাগি॥

২। পূজলুঁ পশুপতি যামিনী জাগি। গমন বিলম্বন ভেল তহি লাগি॥

৩। ফাগুবিন্দু দেখিয়া সিন্দূর বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ দাগ মিছাই ভাবহ॥

শ্যাম বংশী ও রাধার চরণ স্পর্শ করিয়া অনেক শপথ করিলেন। কিন্তু রাধা তাহাতে প্রসন্ন হইলেন না। অনন্তদাসের রাধা 'শতঘরিয়া' বলিয়া গালি দিলেন।

চণ্ডীদাসের রাধা সাংঘাতিক কথা শুনাইলেন।

দূরে রহ দূরে রহ প্রণতি আমার।

এই কথায় এমন কি জ্বালা আছে যে ইহাকে সাংঘাতিক বলা হইল? চণ্ডীদাসই বা কানে আঙ্গুল দিয়া ভণিতায় কেন বলিলেন—

ইহা বলিলে কেমনে।
চোর ধরিলেহ এত না কহে বচনে॥

শ্রীমতী অভিমানভরে বলিলেন—এত কাল তোমাকে চুম্বন করিয়াছি—আজ প্রণাম গ্রহণ কর। এই প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া রাধা উচ্চতম প্রেম-সম্বন্ধকে সাধারণ পতি-পত্নীর লৌকিক সম্বন্ধের স্তরে নামাইয়া যে কোপ প্রকাশ করিলেন—এইরূপ কোপ বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মতে আর কিছুতে প্রকাশিত হইতে পারে না। প্রেমের পাত্রকে ভক্তির পাত্র বলিলে তাহাকে বুক হইতে সরাইয়া মাথায় রাখা হয়—তাহাতে নিকটকে দূর করা হয়। ইহাতে অভিমানের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করা হয়। যে ভক্তি প্রেমের তরল রূপ, শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে সেই ভক্তির ভয় দেখাইলেন। দাস্যরস নিম্নস্তরের বস্তু—রাধা দাস্যরসের স্তরে নামিয়া আসিয়া উজ্জ্বল রসের নাগরকে পীড়ন করিতে চাহিলেন। মাধুর্যের ক্ষীর-সরোবরের রাজহংসকে দাস্যরসের ক্ষার-সরোবরে টানিয়া আনার মত দণ্ড আর কি আছে ?

এই রস-কলহে গোবিন্দদাসের দুইটি বিখ্যাত পদ কলাচাতুর্যের অপূর্ব নিদর্শন। শ্রীরাধা বলিলেন—তুমি ত আর শ্যাম নহ, তুমি শঙ্করদেব ; অতএব আমার প্রণম্য। রাত্রি-জাগরণের পুণ্যফলে প্রাতে তোমার দেখা পাইলাম—দূর হইতে হে শঙ্কর, প্রণাম গ্রহণ কর।

আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক ভালহিঁ সিন্দূর দহনা।
চন্দন চান্দ মাহা মৃগমদ লাগল তাহে বেকত তিন নয়না॥
মাধব—অব তুহুঁ শঙ্কর-দেবা।
জাগর-পুণফলে প্রাতরে ভেটলুঁ দূরহি দূরে রহু সেবা॥
চন্দন রেণু ধূসর ভেল সব তনু সোই ভসমসম ভেল।
তোহারি বিলোকনে মঝু মনে মনসিজ মনোরথ সঙে জরি গেল॥
তবহুঁ বসন ধর কাহে দিগম্বর শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দদাস কহই পর অম্বর গণইতে লেখি না লেখি॥

তোমার—আকুল চিকুর চূড়ার উপরে ময়ূরপুচ্ছ ভায়।
মনে হয় যেন জটার উপরে ভুজঙ্গ শোভা পায়।
ভালে সিন্দূর হইয়া অনল
বিস্তার করে কিবা শিখাদল,
শ্বেত চন্দন ফোঁটা তার তলে মৃগমদ তার মাঝে।
তৃতীয় নয়ন যেন প্রকটিত রাজে॥
হে মাধব, তুমি আজিকে প্রমথনাথ।
নিশাজাগরণ-পুণ্যে প্রভাতে পাইলাম সাক্ষাৎ,
দূর হ'তে মোর লহ তুমি প্রণিপাত।
চন্দনরেণু-ধূসর ও তনু বিভূতি ভূষণ ভায়,
তোমার দিঠিতে মনোরথ সনে মনসিজ পুড়ে যায়॥
বসন পরার কথা ত তোমার নয়,
তোমার অঙ্গে লঙ্ঘি নিয়ম নীলবাস কেন রয়?
বসন বলিয়া কেন গণি ওরে ও-ত অন্যের বাস,
পর-বাসে মোরা দিগ্‌বাসই বলি, কহে গোবিন্দদাস॥

আসল কথা, তোমার দৃষ্টিতে আমার মনোমধ্যবর্তী কন্দর্প দগ্ধ হইয়া গেল।

শ্রীরূপের মূল শ্লোক ক্লাসিক গাম্ভীর্যে আরও মনোহর।—

"স্বামিন্! যুক্তমিদং তবাঞ্জননবালক্তদ্রবৈঃ সর্বতঃ
সংক্রান্তৈর্ধৃতনীললোহিততনোর্যচ্চন্দ্রলেখাকৃতিঃ।
একং কিন্ত্ববলোকয়াম্যনুচিতং হংহো পশূনাং পতে
দেহার্ধে দয়িতাং বহন্ বহুমতামত্রাসি যন্নাগতঃ॥

—উজ্জ্বলনীলমণি

রূপের শ্লোকটিতে দিগম্বরত্বের কথা নাই বটে, কিন্তু রসিকতায় শ্রীরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—'শঙ্কররূপ তো ধরিয়াছ একটু অঙ্গহানি আছে—অর্ধাঙ্গে প্রিয়তমাকে বহন করিয়া তো আনিতে পার নাই। আনিলে ভালো হইত।'

গোবিন্দদাসের গোবিন্দ ধৃষ্ট হইলেও বিদগ্ধরাজ। তিনি রাধার শ্লেষ বাক্যের যথাযথই উত্তর দিলেন—আমি শঙ্করত্ব পাইয়াছি। কিন্তু তুমিও যে গৌরীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ—অতএব 'বিবাদেন অলম্'।

সহজই গোরি রোখে তিন লোচন কেশরী জিনি মাঝ খীন।
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে শৈলসুতাকর চীন ॥
সুন্দরি, অব তুহুঁ চণ্ডী বিভঙ্গ।
যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর মোহে দেয়বি আধ অঙ্গ ॥
কালিয়া কুটিল ভাঙুযুগ ভঙ্গিম সম্বরু তাকর দম্ভ।
পশুপতি দোখে রোখ নাহি সমুঝিয়ে হাম নহ শুম্ভ-নিশুম্ভ ॥
দহন মনোভবে তোহি জিয়ায়বি ঈষত হাস বরদানে।
তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডয়ে গোবিন্দদাস পরমাণে ॥

তনুর বর্ণে সহজে গৌরী রোষে তুমি ত্রিনয়না।
তাই দেখিতেছ দেখিতে পায় না যা-সব অন্যজনা ॥
সিংহবাহিনী গৌরীর মত সিংহে করেছ জয়,
অতিক্ষীণ তব কটিতে প্রকট রয়।
বচনে তোমার করি অনুমান হৃদয় পাষাণময়।
পাষাণরাজের তুমি যে দুহিতা নাহি তায় সংশয় ॥
ধরেছ কোপনা চণ্ডীর রূপ, আমি শঙ্কর যবে।
কিঙ্কর তব, অর্ধ অঙ্গ দেবেনাক কেন তবে ॥
কালিয়কুটিল ভ্রূযুগ তোমার দৃষ্টি করেছ ক্রূর।
কৃপাচোখে চাও, তার বঙ্কিম দর্প করহ দূর ॥
কেন কোপবতী যেবা পশুপতি ধরে কি তাহার দোষ ?
নিশুম্ভ নই শুম্ভও নই, তবে কেন এত রোষ ?
পুড়েছে মদন জিয়াইবে তারে স্মিতহাসি বর দানে।
তোমার প্রসাদ হরে সব বাদ গোবিন্দদাস জানে ॥

আসল কথা—শঙ্কররূপী শ্যাম গৌরীরূপা রাধার অর্ধাঙ্গ প্রার্থনা করিতেছেন। এইরূপ অপূর্ব কলাচাতুর্য গোবিন্দদাস ছাড়া আর

তোমার—আকুল চিকুর চূড়ার উপরে ময়ুরপুচ্ছ ভায়।
মনে হয় যেন জটার উপরে ভুজঙ্গ শোভা পায়।
ভালে সিন্দুর হইয়া অনল
বিস্তার করে কিবা শিখাদল,
শ্বেত চন্দন ফোঁটা তার তলে মৃগমদ তার মাঝে।
তৃতীয় নয়ন যেন প্রকটিত রাজে॥
হে মাধব, তুমি আজিকে প্রমথনাথ।
নিশাজাগরণ-পুণ্যে প্রভাতে পাইলাম সাক্ষাৎ,
দূর হ'তে মোর লহ তুমি প্রণিপাত।
চন্দনরেণু-ধূসর ও তনু বিভূতি ভূষণ ভায়,
তোমার দিঠিতে মনোরথ সনে মনসিজ পুড়ে যায়॥
বসন পরার কথা ত তোমার নয়,
তোমার অঙ্গে লঙ্ঘি নিয়ম নীলবাস কেন রয়?
বসন বলিয়া কেন গণি ওরে ও-ত অন্যের বাস,
পর-বাসে মোরা দিগ্‌বাসই বলি, কহে গোবিন্দদাস॥

আসল কথা, তোমার দৃষ্টিতে আমার মনোমধ্যবর্তী কন্দর্প দগ্ধ হইয়া গেল।

শ্রীরূপের মূল শ্লোক ক্লাসিক গাম্ভীর্যে আরও মনোহর।—

"স্বামিন্! যুক্তমিদং তবাঞ্জনবালক্তদ্রবৈঃ সর্বতঃ
সংক্রান্তৈর্ধৃতনীললোহিততনোর্যচ্চন্দ্রলেখাকৃতিঃ।
একং কিন্ত্ববলোকয়াম্যনুচিতং হংহো পশূনাং পতে
দেহার্ধে দয়িতাং বহন্ বহুমতামত্রাসি যন্নাগতঃ॥

—উজ্জ্বলনীলমণি

রূপের শ্লোকটিতে দিগম্বরত্বের কথা নাই বটে, কিন্তু রসিকতায় শ্রীরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—'শঙ্কররূপ তো ধরিয়াছ একটু অঙ্গহানি আছে—অর্ধাঙ্গে প্রিয়তমাকে বহন করিয়া তো আনিতে পার নাই। আনিলে ভালো হইত।'

গোবিন্দদাসের গোবিন্দ ধৃষ্ট হইলেও বিদগ্ধরাজ। তিনি রাধার শ্লেষ বাক্যের যথাযথই উত্তর দিলেন—আমি শঙ্করত্ব পাইয়াছি। কিন্তু তুমিও যে গৌরীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ—অতএব 'বিবাদেন অলম্'।

সহজই গোরি রোখে তিন লোচন কেশরী জিনি মাঝ খীন।
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে শৈলসুতাকর চীন॥
সুন্দরি, অব তুহুঁ চণ্ডী বিভঙ্গ।
যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর মোহে দেয়বি আধ অঙ্গ॥
কালিয়া কুটিল ভাঙ যুগ ভঙ্গিম সম্বরু তাকর দম্ভ।
পশুপতি দোখে রোখ নাহি সমুঝিয়ে হাম নহ শুম্ভ-নিশুম্ভ॥
দহন মনোভবে তোহি জিয়ায়বি ঈষত হাস বরদানে।
তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডয়ে গোবিন্দদাস পরমাণে॥

তনুর বর্ণে সহজে গৌরী রোষে তুমি ত্রিনয়না।
তাই দেখিতেছ দেখিতে পায় না যা-সব অন্যজনা॥
সিংহবাহিনী গৌরীর মত সিংহে করেছ জয়,
অতিক্ষীণ তব কটিতে প্রকট রয়।
বচনে তোমার করি অনুমান হৃদয় পাষাণময়।
পাষাণরাজের তুমি যে দুহিতা নাহি তায় সংশয়॥
ধরেছ কোপনা চণ্ডীর রূপ, আমি শঙ্কর যবে।
কিঙ্কর তব, অর্ধ অঙ্গ দেবেনাক কেন তবে॥
কালিয়কুটিল ভ্রূযুগ তোমার দৃষ্টি করেছ ক্রূর।
কৃপাচোখে চাও, তার বঙ্কিম দর্প করহ দূর॥
কেন কোপবতী যেবা পশুপতি ধরে কি তাহার দোষ?
নিশুম্ভ নই শুম্ভও নই, তবে কেন এত রোষ?
পুড়েছে মদন জিয়াইবে তারে স্মিতহাসি বর দানে।
তোমার প্রসাদ হরে সব বাদ গোবিন্দদাস জানে॥

আসল কথা—শঙ্কররূপী শ্যাম গৌরীরূপা রাধার অর্ধাঙ্গ প্রার্থনা করিতেছেন। এইরূপ অপূর্ব কলাচাতুর্য গোবিন্দদাস ছাড়া আর

কাহারো পদে নাই। বিদ্যাপতির কলাচাতুর্যেও এত মাধুর্য নাই।

শ্রীমতীর কোপ এত সহজে দূর হইবার নয়। বচনচাতুর্য তিনি নিজেও অনেক জানেন। তিনি বলিলেন—

হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্।
তামনুসর সরসীরুহ-লোচন যা তব হরতি বিষাদম্॥
চলহ কপট নট না কর বেয়াজ।
কৈতববচনে অবহুঁ কিয়ে কাজ॥
যো ধনী কামিনী গুণবতী নারী।
হাম নিরগুণ রতিরভসে গোঙারী॥
সোই পূরব তুয়া হিয় অভিলাষ।
বঞ্চলি ইহ নিশি যো ধনী পাশ॥

ইহার পর মানের পালা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিপ্রলম্ভের দ্বিতীয় পর্যায় মান। শ্যামের অন্য নারীসঙ্গ হইতেই শ্রীরাধার মান। মানের দ্বারা সাময়িক বিরহের সৃষ্টি হয়, সেজন্য ইহা বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত। ইহার আটটি ভাগ। প্রত্যেক ভাগেই অন্য নারীসঙ্গমের কথা। শ্রবণ ও চিহ্ন দর্শনের দ্বারা অন্য নারীসঙ্গের কথা মানিনী জানিতে পারে।

১। সখীমুখে শ্রবণ, ২। শুকমুখে শ্রবণ, ৩। কুঞ্জান্তরে মুরলীধ্বনি শ্রবণ, ৪। প্রতিনায়িকার গাত্রে ভোগাঙ্ক-দর্শন, ৫। প্রিয়তমের গাত্রে ভোগচিহ্ন দর্শন, ৬। গোত্রস্খলন, ৭। স্বপ্নে দর্শন, ৮। অন্য নায়িকার সঙ্গে প্রিয়তমকে দর্শন।

প্রিয়তমের গাত্রে ভোগচিহ্ন-দর্শন অবলম্বন করিয়াই অধিকাংশ পদ রচিত হইয়াছে। মানিনীর রোষপ্রকাশ, মানিনীর আক্ষেপ ও মানভঞ্জনই মানপর্যায়ের প্রধান রসবস্তু। কেবল বৈচিত্র্য-সৃষ্টির জন্য মানের ভিন্ন ভিন্ন নিদানের বিধান হইয়াছে। ইহা ছাড়া, অনিদান অভিমান (মানমনিদানম্) আছে।

এইখানেই পদাবলীর রসসৃষ্টি চরমে উঠিয়াছে। মানই প্রধানতঃ পদাবলীর মান রাখিয়াছে। কোন দেশের সাহিত্যে অভিমানকে রসবস্তুস্বরূপ গ্রহণ করিয়া এমন চমৎকার কবিতা রচিত হয় নাই। আশ্চর্যের বিষয়, যে মান—ভারতীয় প্রেমকবিতার 'প্রাণ'—সেই মানের একটা উপযুক্ত প্রতিশব্দ পর্যন্ত ইংরাজি সাহিত্যে নাই। (প্রণয়ের গাঢ়তার সহিতই মানের সম্পর্ক। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রণয়ের গাঢ়তা, গূঢ়তা ও গভীরতা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছে—তাহার ফলে মান ইহাতে এতদূর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে মান প্রণয়লীলার একটা গতানুগতিক অঙ্গ মাত্র। পদাবলী-সাহিত্যে ইহা গতানুগতিকতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া পারমার্থিকতায়

পৌঁছিয়াছে। লৌকিক প্রেমের কবিতা হিসাবেও 'মান' পদাবলীকে একটা অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য-গৌরব ও উচ্চতর মর্যাদা দান করিয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্যে মধুর রসের চরম প্রকাশ মিলনে নয়, বিরহে নয়—চরম প্রকাশ এই মানে। গভীরতম অনুরাগ ছাড়া মানে অধিকার হয় না। গভীরতম অনুরাগ না থাকিলে, প্রিয়তম চরণ ধরিয়া প্রিয়তমার মানভঞ্জন করে না। ঐশ্বর্যবোধ হইতে দূরে যাইতে যাইতে অনুরাগ যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে, তখনই অভিমান করা চলে। মানের আপাত ব্যবধানেই সর্ব ব্যবধানের বিলোপ। এইখানেই শ্রীমতী একেবারে শ্যামময়ী হইয়া পড়েন—তাঁহার বেদ্যান্তর-স্পর্শ-শূন্যতার ভাব জন্মে। এই ভাবই ব্রহ্মস্বাদাভাস।

যে দাস্যভাব প্রিয়জনের সর্ব অপরাধ হাসিমুখে ক্ষমা করে, প্রিয়জনের কৃপাকণা পাইয়াই যাহা ধন্য—তাহাও ভক্তিমার্গের একটা স্তর বটে,—কিন্তু তাহা গভীরতম প্রেমধর্মের লক্ষণ নয়। ইহার মধ্যে ঐশ্বর্যভাব মিশ্রিত আছে। এই ভাব ধর্ম-পত্নীর—ইহা রুক্মিণী-ভাব, এই ভাব অর্ধাঙ্গিনীর সত্যভামা-ভাব নয়। 'অহেরিব গতিঃ' প্রেমের—প্রেমের এই মহাসত্য ইহাতে স্বীকৃত হয় না।

শ্রীরাধা শ্যামের অর্ধাঙ্গিনী, সে শ্যামের কোন অপরাধ নিজের দাক্ষিণ্যে ক্ষমা করিতে রাজী নয়। প্রিয়তমকে দণ্ডিত করার অবাধ অধিকার প্রিয়তমই তাহাকে দিয়াছে। মান করিয়া সে নিজের দক্ষিণার্ধকে দণ্ডিত করে—তাহার বেশি দণ্ডিত করে বামার্ধকে অর্থাৎ নিজেকে। এই পীড়িয়া পীড়িত হওয়া, এই কাঁদাইয়া কাঁদাই ত গভীর প্রেমের ধর্ম! পতি-পত্নীর নিরুপদ্রব প্রণয়ে সমস্যাহীন সুখের সংসারধর্মে আর অভিমানের দীর্ঘশ্বাসের উষ্মায় উত্তপ্ত বৃন্দাবনের কুঞ্জলীলায় এই প্রভেদ। একটা লৌকিক, আর অন্যটা অতিলৌকিক। তবে মানবসংসারেও প্রেমের মধ্যে এই লোকোত্তর আস্বাদ পাইয়া বৃন্দাবনের কুঞ্জের

নিকটবর্তী হয়। লৌকিক জগতের নরনারীও এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত নয়। বৃন্দাবন ত ভৌগোলিক যমুনাতীরেরই নিজস্ব নয়—যেখানেই প্রেমের যমুনা, সেখানেই বৃন্দাবন।

মানিনীর অন্তরের বাণী কি, তাহা অল্পকথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

সব ব্যবধান টুটাবার লাগি নব ব্যবধান ছল।
ক্ষণেকের গূঢ় স্তম্ভন মেঘে বরষিতে অবিরল॥
হৃদি ক্ষত করি কেন দাগা দাগি ?
ও কর সুধার প্রলেপের লাগি,
তব হৃদি-হ্রদে ডুবিয়া জুড়াতে হ'তে তায় শতদল।
বুকে জ্বালি মানানল॥ (ব্রজবেণু)

প্রেমের তুষারশীতল গভীর হ্রদে গাহন করিবার জন্য দেহকে স্বদ্বীপ্ত অনলের দাহনে সন্তপ্ত করাই ত মান।

রাধার নানা কারণে মান,—অকারণে মান, শ্রীকৃষ্ণকে রোষভরে প্রত্যাখ্যান, সখীদের অনুনয় বিনয় ও অনুযোগ, শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিদূষণ, শ্রীকৃষ্ণের নানাভাবে মানভঞ্জন ইত্যাদি লইয়া বহু পদ রচিত হইয়াছে। কবিরা প্রধানতঃ জয়দেব ও অন্যান্য রাগ-রসের কবিদের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু নিজেদের মৌলিকতার দ্বারা কেহ কেহ যথেষ্ট কৃতিত্বেরও পরিচয় দিয়াছেন।

কৃষ্ণ কালো বলিয়া মানিনী রাধা কালোর চিহ্নও রাখিবেন না। তিনি নীল রঙের চুড়ি ছাড়িয়া হাতীর দাঁতের চুড়ি পরিলেন, নীলবসন ত্যাগ করিয়া যোগিনীর মত রক্তবাস পরিলেন। চিবুকের উপর একটি কালো তিল-চিহ্ন ছিল, তৃণাগ্রে চন্দন দিয়া তাহা সমাচ্ছন্ন করিলেন, তমালতরুর গায়ে চূণ লেপিলেন, কালো চুলের প্রতিবিম্ব পড়ে বলিয়া দর্পণ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণনাম করিত পোষা শুকপাখী, পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। এইসকল বর্ণনায় অত্যুক্তি ও অস্বাভাবিক আতিশয্যও আছে, কিন্তু

কবির মৌলিকতাও লক্ষণীয়। শ্রীমতী মান করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া নাই, তিনি শ্যামের শঠতার নিন্দা করিতেছেন, নিজকেও ধিক্কার দিতেছেন।

বিদ্যাপতির শ্রীমতী বলিতেছেন—শ্যামের

অন্তর বাহির সম নহ রীত। পানি তৈল নহ গাঢ় পিরীত॥

তিনি আশা করিয়াছিলেন—

সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাত্তু ঝন্‌ঝনায়তে।—

এই শ্লোকের মর্মার্থ নিজের ভাষায় বলিয়া আত্মধিক্কার দিতে লাগিলেন।

বিদ্যাপতি কোথায় তাঁহাকে বুঝাইবেন, তাহা না করিয়া তিনি মান-বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া বলিলেন—

কুকুরক লাঙ্গুড় নহত সমান।

মানপ্রসঙ্গের পদগুলিতে সখীদের অনুযোগই চমৎকার রসসৃষ্টি করিয়াছে। ঘনশ্যামের সখী বলিতেছে—

সুন্দরি ইথে কি মনোরথ পূর।
যাচিত রতন তেজি পুন মাঙ্গন সো মিলন অতি দূর॥

কোকিলনাদ যখন শ্রবণে প্রবেশ করিবে, দক্ষিণ পবন যখন অঙ্গ স্পর্শ করিবে, কোটি কুসুম-শর যখন হৃদয়ে বর্ষিত হইবে—

তব কাঁহা রাখবি মান। তব কৈসে রাখবি পরাণ॥

* * *

কৈসে চরণে করপল্লব ঠেললি মীললি মানভুজঙ্গ।
কবলে কবলে জিউ জরি যব যায়ব তবহিঁ দেখব ইহ রঙ্গ॥

গোবিন্দদাসের সখী বলিতেছে—

শুনইতে কানু-মুরলিরবমাধুরী শ্রবণ নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলুঁ তব মোহে রোখলি ভোর॥

সুন্দরি, তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়বি জনম গোঙায়বি রোয়॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্যাম জলদ রস আশে।
সো অব নয়ন-নীর দেই সিঞ্চহ কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥

অর্থাৎ—

কানুর মুরলীরব শুনিতে চাহিলি যবে
করিলাম তোর শ্রুতিরোধ।
সে রূপ দেখ বা পাছে চোখে দিনু হাতচাপা,
তখন করিলি মোরে ক্রোধ॥
সুন্দরি, তখনি কহিনু তোরে সেধে।
ভুল করে তার সনে পীরিতি বাড়াস যদি
জনম গোঙাবি কেঁদে কেঁদে॥
রোপিলি যে প্রেমতরু বুকে, শ্যাম জলদের
রসধারা করি তুই আশ।
সে তরুর মূলে আজি অশ্রু সেচন কর
কহে কবি গোবিন্দদাস॥

আবার একথাও সখী বলিয়াছেন—

অপরাধ জানি গারি দশ দেয়বি পীরিতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি॥
পীরিতি ভাঙ্গিতে যো উপদেশল তাকর মুখে দেই আগি।

অর্থাৎ—

অপরাধ হয়ে থাকে গালি দিবি দশবার
পীরিতি ভাঙ্গিবি কেন, বল।
পীরিতি ভাঙ্গিতে তোরে উপদেশ দিল যেবা
তার মুখে জ্বালাই অনল॥

চম্পতির রচনার ক্রম যুক্তিমূলক। বিদ্যাপতি ও চম্পতি যে এক ব্যক্তি নহেন তাহা ইহাতেও প্রমাণিত হয়। চম্পতির সখী রীতিমত যুক্তি দিয়া রাধাকে বুঝাইলেন—দেখ শ্যাম বহুবল্লভ। অখিলজনের

তাপ ও তমঃ বিমোচন করে যে চন্দ্র, সে চন্দ্র যদি এক নলিনী-মুখ মলিন করে, তবে তাহাকে দূষিও না। সকল জীবনের জীবনস্বরূপ যে সমীরণ সে যদি এক প্রদীপকে নিভাইয়া দেয়—তবে কি সমীরণকে নিন্দা করা যায়? তুমি নিতান্ত মূঢ়মতি গোয়ালিনী, তাই শ্যামের বহু গুণ উপেক্ষা করিয়া এক দোষকে বড় করিয়া দেখিতেছ। মানকে অপমানে পরিণত করিবার জন্য সখীদের এই সকল অনুযোগ ও উপদেশ রাধার অসহ্য হইল।

শ্রীমতীও রোষভরে উত্তর দিলেন—জানো, এক দোষ বহু গুণ নাশ করে।

কি করব জপতপ দানব্রত নৈষ্ঠিক যদি করুণা নাহি দীনে।
সুন্দর কুলশীল ধনজন যৌবন কি করব লোচনহীনে।

বংশী স্পর্শ করিয়া সে বারবার শপথ করিল—তবু সে শপথ রক্ষা করিল না। ডাবের জলের সঙ্গে কর্পূর যদি না জুটে তবেই তাহার সঙ্গে মিলিব—নতুবা না। (অর্থাৎ ডাবের জলের সঙ্গে কর্পূরের মিলনে হয় বিষ। এই বিষ যদি না পাই তাহা হইলে তাহার সঙ্গে আমার মিলন হইবে।)

শ্রীরাধার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া শ্যাম পীতবাসে চোখের জল মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমাকে ত রাগের বশে তাড়াইয়া দিল শ্রীমতী, কিন্তু আমাকে ছাড়িয়া সে বাঁচিবে কি করিয়া?

মোহে উপেখি রাই কৈসে জীয়ব সো দুখ করি অনুমান।
রসবতি-হৃদয় বিরহ জ্বরে জারব ইথে লাগি বিদরে পরাণ।'

শ্রীকৃষ্ণ নিজের বেদনাকে মনে ঠাঁই না দিয়া মানের অনলে বিদগ্ধা শ্রীমতীর জন্যই বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

রাধা মান করিয়া থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ স্থির থাকিতে পারেন না—যতক্ষণ মানভঞ্জন না হয় ততক্ষণ তাঁহার বিশ্রাম নাই, স্বস্তি নাই।

পদকর্তারা মানভঞ্জনের নানা উপায়ের আশ্রয় করিয়াছেন।

এইগুলি সংস্কৃত সাহিত্যে চিরপ্রচলিত পদ্ধতির অনুসরণ। সাহিত্যদর্পণে উল্লিখিত হইয়াছে—মানভঞ্জনের ছয়টি উপায়—

সামভেদোঽথ দানং চ নত্যুপেক্ষে রসান্তরম্।
তদ্‌ভঙ্গায় পতিঃ কুর্যাৎ ষড়ুপায়ানিতিক্রমাৎ।

সংস্কৃত সাহিত্যের সাম, ভেদ, দানের পদ্ধতি বৈষ্ণব কবিরা ততটা রসানুকূল মনে করেন নাই। সোনার কঙ্কণ দিয়া মানভঙ্গ বৃন্দাবনের কুঞ্জে সম্ভব নয়। প্রণতির পদ্ধতি জয়দেব হইতে বৈষ্ণবপদাবলীতে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার এই পদ্ধতির চরম বাণী—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্।

জয়দেবে ইহাতেই চূড়ান্ত। কোন কোন কবি জয়দেবকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

সংস্কৃত কাব্যে নতি অর্থাৎ পাদ-পতনই চরম কথা নয়। ইহার পর উপেক্ষা, তৎপরে রসান্তরের সৃষ্টি। রসান্তরই চরম। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত কবিদের অনুসরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে কেহ কেহ বলিয়াছেন—'মানিনী উপেখি চলু কান।' ইহাতেই ফল হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীমতী কলহান্তরিতা হইয়াছেন। শ্রীমতী মান করিয়া যখন দেখিলেন—শ্যাম উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার অনুতাপের সীমা থাকিল না। তিনি স্বগতোক্তিতে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন—সখীদের ডাকিয়াও নিজের মনের ব্যথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। ঘনশ্যামের সখী তখন বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিল—

কৈসে চরণে কর-পল্লব ঠেললি মীললি মানভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জিউ জরি যব যায়ব তবহি দেখব ইহ রঙ্গে॥
মাগো, কিয়ে ইহ জিদ্দ অপার।
কো অছু বীর ধীর মহাবল পওরি উতারব পার॥
আপনক মান বহুত করি মানলি তাক মান করি ভঙ্গ।
সো দুলহ নাহ উপেখি তুহুঁ অব বঞ্চবি কাহুক সঙ্গ॥

সখিগণ বচন অলপ করি মানলি চাহসি কাহে মঝু মুখ।
ভণ ঘনশ্যাম শ্যাম তুহুঁ উপেখলি দেয়লি বহুতর দুখ॥

অর্থাৎ

কেন লো বল্লভকর-পল্লব পায়ে ঠেলি বুকে নিলি মানের ভুজঙ্গ।
দংশনে দংশনে জ্বালাইবে প্রাণ তোর তখন বুঝিবি এর রঙ্গ॥
মাগো—কি অপার জিদের পাথার।
কে এমন মহাবল বীর আছে সন্তরি সে পাথারে শ্যামে করে পার॥
আপনার মানে তুই গণিলি অনেক বড় সে মানীর মান করি ভঙ্গ।
দুর্লভ বল্লভে অবহেলা করি এবে বাঁচিতে পাইবি কার সঙ্গ॥
সখীদের অনুনয় তুচ্ছ গণিলি তুই কেন চাস্ মোর মুখপানে।
ভণিছে ঘনশ্যাম উপেখিয়া শ্যাম-ধনে বড় দুখ দিলি মোর প্রাণে॥

গোবিন্দদাসের রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

কুলবতী কোই নয়নে জনু হেরই হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাড়ায়ই প্রেম করই জনু মান॥

অর্থাৎ

কোন কুলবতী যেন পরপুরুষের পানে
নাহি চাহে মেলিয়া নয়ন।
যদি কভু চাহে ভ্রমে তবে যেন কোন ক্রমে
নাহি হেরে নন্দের নন্দন।
যদি পুন হেরে তারে তার সাথে প্রেম যেন
নাহি করে আপনা পাশরি।
প্রেমই যদি করে তবে বিদায় না দেয় যেন
তার'পরে অভিমান করি॥

শ্রীমতী আত্মধিক্কার দিয়া বলিলেন—

গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল হাম নাহি পালটি নেহারি।
ব কি করব পরকারি॥

শ্রীমতী শেষে বলিলেন—সজনি, কেন আমার এমন দুর্মতি হইল।

সো মুখ চান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব কালিন্দী বিষ হ্রদনীরে।

সখী বলিয়াছেন—

কি কহসি কঠিনি কালীদহে পৈঠবি শুনইতে কাঁপয়ে দেহা।
ঐছন বচন কানু যব শূনব জিবনে ন বান্ধব থেহা॥
কানুক চীত রীত হাম জানত কবহু নহত নিঠুরাই।
তুহুঁ যদি তাহে লাখ গারি দেয়সি তবহু রহত পথ চাই॥

কানুর উপেক্ষা ত ছলনা বই কিছু নয়—কাজেই এ অবস্থায় মানভঙ্গের আর বিলম্ব হয় নাই।

কবিশেখর মানভঞ্জনের জন্য রসান্তরের সহায়তা লইয়াছেন। 'আমাকে সর্পে দংশন করিল' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ চীৎকার করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

বজর পড়িল শুনি বোলে। ধাই ধনি ধরি কক কোলে॥

উজ্জ্বল নীলমণিতে এই চিত্রটি আছে—কবিশেখর তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। উজ্জ্বল নীলমণির শ্লোকটি এই—

পাণৌ পঞ্চমুখেন দুষ্টকৃমিণা দষ্টোঽস্মি রোষাদিতি
ব্যাজাৎ কূণিতলোচনং ব্রজপতৌ ব্যাভুজ্য বক্ত্রং স্থিতে।
সদ্যঃ প্রোজ্ঝিতরোষবৃত্তিরসকৃৎ কিং বৃত্তমিত্যাকুলা
জল্পন্তী স্মিতবন্ধুরাস্যমধুনা গান্ধর্বিকা চুম্বিতা॥

(সর্পের স্থলে এখানে আছে পঞ্চমুখ রুষ্ট কৃমি। আর রাধার স্থলে গান্ধর্বিকা।) ইহাই রসান্তর-সৃষ্টির দৃষ্টান্ত। শৃঙ্গাররসেব মধ্যে করুণ রসের অবতারণা। কপট শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এইরূপ কাপট্য অবলম্বনে অসামঞ্জস্য কিছু নাই। কিন্তু রসশাস্ত্রবিহিত হইলেও বৈষ্ণব পদাবলীর রসলোকের সমুচ্চ-গ্রামের সহিত মানভঞ্জনের এই পদ্ধতির সামঞ্জস্য হয় না। জয়দেবের *দেহি পদপল্লবমুদারম্*-এর পর আর কোন পদ্ধতি আমাদের প্রীতিকর নয়।

দুর্জয় মানেই দুশ্চর চেষ্টার প্রয়োজন হয়। ছোট-খাটো মান ভাঙ্গিবার আরো অনেক উপায় আছে।

শ্রীকৃষ্ণের নাপিতানীবেশে রাধার চরণ প্রসাধন, বিদেশিনীবেশে অভীষ্ট প্রার্থনা, গণকীর বেশে অম্বরহরণ ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের চাটুবাক্যে সেই সঙ্গে সখীদেরও পটুবাক্যে ছোট-খাটো মান না ভাঙ্গিয়া পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ রাধার নিকটে আসিয়া অনুনয় করিয়া বলিলেন—

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাই তোমার চরণের ধূলি॥

রাই উত্তর দিলেন না। কাজেই সখীরা শ্যামের হইয়া ওকালতি করিতে লাগিলেন—কানু যদি ভুল করিয়াই থাকে তবু তাহার কি ক্ষমা নাই?

সহজে চাতক না ছাড়য়ে ব্রত না বৈসে নদীর তীরে।
নবজলধর বরিষণ বিনু না পিয়ে তাহার নীরে।
যদি দৈবদোষে অধিক পিয়াসে পিয়য়ে সে বারি থোর।
তবহুঁ তাহারি নাম সোঙরিয়া গলে শতগুণ লোর।

* * *

প্রেম রতন জনু কনয়া কলস পুনু ভাগ্যে সে হয়ে নিরমাণ।
মোতিম হার বার শত টুটয়ে গাঁথিতে পুন অনুপাম।

* * *

দিনকর বন্ধু কমল সভে জানয়ে জল তহিঁ জীবন হোয়।
পঙ্কবিহীন তনু ভানু শুখায়ত জলহি পচায়ত সোয়॥
নাহ সমীপে সুখদ সব বৈভব অনুকূল হোয়ত যোই।
তাকর বিরহে সকল সুখ সম্পদ খেনে খেনে দগধই সোই॥

বলা বাহুল্য, এই সকল হিত-বচনের ফলেই ছোট-খাটো মান বিগলিত হইতে পারে। শ্যামের কাছে খৎ লিখাইয়া লওয়া একটি পদ্ধতি। খতের শর্তগুলি ম্যাগ্‌না কার্টার শর্ত হইতেও দুশ্চর।

এইরূপ খতের সাক্ষী, বলা বাহুল্য, স্বয়ং মদন। কেলিকদম্ববিলাসে অন্য নারীদের মন মুগ্ধ হয় অতএব কেলিকদম্ববিলাস বর্জনীয়। গুরুজনের আনুগত্য করিতে হইলে যখন তখন কুঞ্জে আসা চলে না—বিশেষতঃ গৃহ হইতে দূরে রাত্রিবাস করা চলে না—অতএব ইহাও পরিহর্তব্য। শ্যামকে গুরুজনের আনুগত্য ও অন্য রমণীর সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। দিনরাত রাধার গুণগান করিতে হইবে, রাধা ভিন্ন শ্যাম অন্য নারীর স্বপ্ন দেখিতেও পাইবে না। এমন কি রাধার আদেশ ছাড়া জলপানও করিতে পাইবে না। বিদগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ সহজেই সম্মত হইয়া বলিলেন—

লিখি লহ কবজ দাস করি সুন্দরি জীবন-যৌবনে বহু ভাগি।
তুয়া গুণ রতন শ্রবণে মণিকুণ্ডল এবে ভেল ত্রিভঙ্গ বৈরাগী।

ত্রিভঙ্গকে বৈরাগী বানাইয়া শ্রীমতী মান বিভঙ্গ করিলেন। বিদ্যাপতি ও ঘনশ্যামের পদ্ধতি ইহাই। এই রঙ্গরসাল পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ সাহিত্যরসসৃষ্টির পরিপোষক, লীলাতত্ত্বের সহিত ইহার যোগ সামান্যই।

বংশীবদনের মানভঞ্জনের পদ্ধতিটি চমৎকার। সখীরা শ্রীকৃষ্ণকে নাগরীবেশে শ্রীরাধার কাছে লইয়া আসিল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণকে অবিরাম অস্বীকারচ্ছলে শ্রীরাধা একেবারে কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণগতপ্রাণা হইয়া আছেন। "অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই।" বিরহে ও মানে শ্রীমতীর একই দশা।

কহিতে কহিতে রসের আবেশে নাগরী নাগর ভেল।
বংশী কহয়ে বুঝিয়া বিশাখা নাগরী আনিয়া দেল।

রাধা যখন নাগরভাবে বিভোরা তখন বিশাখা সুযোগ বুঝিয়া নাগরীবেশী শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া যোগাইল। তখন—তুহুঁ পুলকায়িত গদ্‌গদ ভাব।

দুর্জয় মান এত সহজে ভাঙ্গে না। শ্রীকৃষ্ণের তৃণ কেশ লইয়া দূতী রাধার চরণে অর্পণ করে—আর খুব অতিরঞ্জিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দূরবস্থার কথা বর্ণনা করে—এমন কি বিরহে শ্রীকৃষ্ণের জীবন সংশয়াপন্ন এমন কথাও বলিতে ইতস্ততঃ করে না। তখন মধ্যম শ্রেণীর মান বিগলিত হয়।

সখীদের সাধারণ অনুযোগে যখন ফল হয় না, তখন সখীরা ভয় দেখাইয়া বলে—শ্রীকৃষ্ণকে এমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি সত্য সত্যই চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে থাকিয়া যাইবেন, একথা শুনিয়া রাই ভয় পাইয়া যায়। ইহাও রসান্তরের অবতারণায় মানভঞ্জন।

বর্ষারজনীর মান সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়।

'গগনে ঘন ঘন গর্জন, ঝলকত দামিনী যামিনী ঘোর'—কামিনীর পক্ষে এমন দুর্দিনে কান্তক্রোড় হেলায় হারানো চলে না। বর্ষাপ্রকৃতিই মানের অর্ধেকটা হরণ করে। তারপর সখী যখন বলে—

"লজ্জা করে না?
তুহুঁ রহ গরবিনী বাসক-গেহ। সো ভিগি আওল শাওন মেহ॥
তুহুঁ শূতলি সুখময় পরিযঙ্ক। সো তরি আওল পাঁতর পঙ্ক।"

তখন শ্রীমতীর পক্ষে মানের মান রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে।

রাধা মানে বসিলে সখীরা নানাভাবেই অনুযোগ করেন, কিন্তু কোন কোন কবি বলেন—সখীদের উপদেশেই রাই মানের অনলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-হেমের পরখ করেন। সখীদের এই 'সাপ হইয়া কামড়াইয়া ওঝা হইয়া ঝাড়ার' মধ্যে বেশ রস আছে। রসলীলায় বৈচিত্র্য ঘটাইতে না পারিলে উহার আস্বাদ্যমানতা মন্দীভূত হয়, কাজেই সখীরা মান ঘটাইয়া প্রেম-লীলায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে এবং এই মানলীলা উপভোগ করে। বিশেষতঃ মানের পর যে মিলন—সেই

মিলন দারুণ গ্রীষ্মের পর নব-জলধর-বর্ষণের ন্যায় সখীদের চাতক-চিত্তের উপভোগ্য।

সখীগণ হেরই ঝরখহিঁ ফাঁকি।

ঝরখার ফাঁক দিয়া এই মিলনলীলা দেখিয়া সখীরা পরমানন্দ উপভোগ করে।

তাই শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে প্রেরণের মধ্যেও সখীদের ষড়্‌যন্ত্র আছে। তাহারাই শুকপক্ষীকে শিখাইয়া দেয়—রাধাকে শুনাইয়া বলিবি—

কানুরে লইয়া চলিল ধাইয়া পদ্মা সহচরী ঘরে।

দানলীলার মত মানলীলাও সখীদেরই অভীষ্ট। কৃষ্ণকীর্তনে দানলীলার দূতী দেয়াসিনী বড়াই, পদাবলীতে সখীরাই। আবার শ্রীমতী দুর্জয় মানে বসিলে সখীদের বুক কাঁপিয়া উঠে। তখন তাহাদের ছুটাছুটির অন্ত থাকে না।

শ্যামসোহাগিনী রাধা বড়ই আহ্লাদিনী ও অধীরা। কথায় কথায় রাধার অভিমান। বাসকসজ্জার কুঞ্জে শ্যামের আসিতে একটু বিলম্ব হইলেই রাধার অভিমান। একেবারে আসিতে না পারিলে ত কথাই নাই। শ্যাম যদি ভুলিয়াও অন্য অর্থে চন্দ্রাবলী শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফেলেন, তাহাতেও রাধার অভিমান। রূপ গোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণ একবার একটু কবিত্ব করিতে গিয়াও বিপদে পড়িয়াছিলেন—

চন্দ্রস্তব মুখবিম্বং চন্দ্রাঃ নখরাণি কুণ্ডলে চন্দ্রৌ
নবচন্দ্রস্তে ললাটং সত্যং চন্দ্রাবলী ত্বমসি।

রাধা কবিত্ব বুঝিলেন না, চন্দ্রাবলীর নাম শুনিয়াই রাধা অভিমানিনী হইলেন। উদ্ধবদাসও এইরূপ একটা অনর্থের কথা বলিয়াছেন—শ্রীমতী স্বপ্ন দেখিলেন—শ্যাম অন্য রমণীর সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন। জাগিয়া এবং রাগিয়া উঠিয়া রাধা অমনি মানে বসিলেন। শুকপাখী পরিহাস করিয়া বলিল—শ্যাম পদ্মার কুঞ্জে বাস করিতেছেন। একটা পাখীর কথা শুনিয়াই রাইএর আঁখির রক্তিমা

প্রখর হইয়া উঠিল। শ্যামের সম্মুখে বসিয়া শ্যামের বক্ষে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া শ্রীমতী অন্য নারী মনে করিয়াও মানে বসিলেন। ইহা অবশ্য শুধু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিতে মুক্তাতারল্য বা লাবণ্যের আতিশয্য বুঝাইবার জন্য কবিকল্পনার একটা বিলাসমাত্র।

'অহেরিব গতি প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।' প্রেমের গতি সরল পথ ধরিয়া চলে না। সে ভাবে চলিলে প্রেম বৈচিত্র্য হারাইয়া ফেলে। ক্রমে তাহার আস্বাদ্যমানতা মন্দীভূত হইয়া যায়। প্রেম তাই অহির মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে। এই বাঁকিয়া চলা বা বঙ্কিম ভাবের জন্য বহিরাগত হেতুর প্রয়োজন হয় না—স্বভাবতই প্রেমের স্বধর্ম অনুসারেই অকারণে বক্রতা আসে। ফলে, শ্রীমতী কথায় কথায় বাঁকিয়া বসেন। তাহাতেই অনিদান মানের সৃষ্টি।

বৎস যেমন গো-জননীর আপীনে ঘন ঘন মুখের আঘাত করিয়া অধিকতর দুগ্ধ আদায় করে, অভিমানের আঘাত দিয়া প্রেমিকা সেইরূপ দয়িতের নিকট প্রভূততর প্রীতি আদায় করে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

রাধা ও চন্দ্রাবলী—মানের প্রসঙ্গে চন্দ্রাবলী-তত্ত্বের একটু আলোচনা প্রয়োজন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাধার নাম নাই—চন্দ্রাবলীরও নাম নাই। প্রধান গোপিকার নাম নাই, রূপের গ্রন্থে রাধার বদলে স্থলে স্থলে গান্ধর্বিকা নামের প্রয়োগ আছে। গোপালতাপনীতে ইঁহাকেই রাধা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও পদ্মপুরাণে রাধার নাম আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার আর এক নাম চন্দ্রাবলী। পদ্মপুরাণে ও রাধাতন্ত্রে রাধা ও চন্দ্রাবলী পরস্পর প্রতিযোগিনী—দুইজনেই যূথেশ্বরী। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী পৃথক্ নয়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে পদ্মপুরাণের প্রথাই অনুসৃত হইয়াছে।

হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী।
তৎ সারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥

এই মহাশক্তিই রাধা।

বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্রেও এই কথাই বলা হইয়াছে। ইহাতে রাধা একটা ভাববিগ্রহ মাত্র। মানবী লীলার মধ্য দিয়া এই ভাবই আস্বাদ্যমান হইয়াছে। এই ভাবকে অধিকতর আস্বাদ্য করিয়া তুলিবার জন্য বৈষ্ণব কবিরা রাধা ও চন্দ্রাবলীকে পৃথক্ করিয়া একটা প্রতিযোগিতার সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন। একদিকে সখীদের অবতারণা করিয়া প্রেমলীলা-ধারার পোষকতা, অন্যদিকে জটিলা, কুটিলা ও সমাজশাসনের অবতারণা করিয়া তাহার বাধকতার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা ব্রজলীলার রসধারাকে উদ্বেল, ক্ষুব্ধ, উত্তাল ও ফেনিল করিয়া তুলিয়াছে। চন্দ্রাবলীর অবতারণায় ঐ রসধারা আরও অপূর্ব বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। বিক্ষোভের সৃষ্টি না করিলে রসধারার উচ্ছলতাতেও বৈচিত্র্যসৃষ্টি হয় না। চন্দ্রাবলীই এই বৈচিত্র্য

দান করিয়াছে। এক মহাশক্তিই খণ্ডিতা হইয়া দুইরূপ ধরিয়াছে। চন্দ্রাবলীর জন্যই রাধাকে আমরা খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা ও মানিনীরূপে পাইতেছি এবং এই প্রসঙ্গেই বৈষ্ণব সাহিত্যের কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিতেছি।

কেবল রসের দিক হইতে নয়, তত্ত্বের দিক হইতেও চন্দ্রাবলীর অবতারণায় সার্থকতা আছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে এ বিষয়ে একটি চমৎকার প্রসঙ্গ আছে এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর আনন্দচন্দ্রিকায় তাহার চমৎকার ব্যাখ্যা আছে—

সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—"রাধে, শ্রীকৃষ্ণের সুখেই যদি তোমার সুখ হয়, তাঁহাকে সুখদান করাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তবে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেলে শ্রীকৃষ্ণের উপর রাগ কর কেন? মানে বস কেন?"

শ্রীরাধা বলিলেন—"সখি, ইহা অসূয়া নয়। চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের প্রতি দাসীভাব পোষণ করে, শ্রীকৃষ্ণকে অতিরিক্ত আদর করে, রাগরোষ জানে না, তাহাতে তাহার তটস্থতাই সূচিত হয়। পদ্মিনীর সহিত ভ্রমরের যে সম্বন্ধ চন্দ্রাবলীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেই সম্বন্ধ। চন্দ্রাবলী জড়ভাবাপন্না, প্রেমের যে স্বাভাবিক ধর্ম তাহা সে পালন করে না। সে জানে না—প্রেমের ধর্ম মোদন নয়, মাদন। সে মোদিত করিতে পারে, কিন্তু মাতাইতে পারে না। আমার দুঃখ এই, শ্রীকৃষ্ণের মত বিদগ্ধ জন তাহার মত অবিদগ্ধা জড়-ভাবাপন্না নায়িকার সংসর্গে কি করিয়া আনন্দ পায়।"

এদিকে চন্দ্রাবলীর সখী শ্রীরাধার গুণকীর্তন করিয়া বলিতেছেন—"সখি, এমন গুণবতী রাধার উপর তুমি রাগ কর কেন? বেশত, তুমি যাঁহাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাস সেই শ্রীকৃষ্ণ রাধার সংসর্গে আনন্দ পান—তাহাতে তোমার রাগের কারণ কি আছে?"

চন্দ্রাবলী উত্তর দিলেন—"সখি, ইহা অসূয়া নয়। রাধার ঔদ্ধত্য অসহ্য। ব্রজেন্দ্রনন্দন যিনি সর্বজনের দ্বারা বন্দিত, তাঁহার উপর

রাগ করিয়া সে মানে বসে এবং তিনি চরণপ্রান্তে পতিত হইলেও সে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকে, ভ্রূক্ষেপও করে না।"

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে রাধা ও চন্দ্রাবলীর এই দুই মনোভাবের দ্বারা বৈষ্ণব কবিগণ মধুর রসের মূল তথ্যটিই উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। রাধার মহাভাবময় প্রেমে ঐশ্বর্যবোধ একেবারে বিলুপ্ত—তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পায়ে ধরাইতে পারেন—আর চন্দ্রাবলী রাসমণ্ডলে নৃত্যকালে—

নিজমঘরিপুণাংসে ন্যস্তমাকৃষ্য সব্যং।
ভুজমিহ নিদধানা দক্ষমস্রোক্ষিতাক্ষী॥
পদযুগমপি বঙ্কং শঙ্কয়া নিক্ষিপন্তী।
প্রতিযুবতিবয়স্যাং স্মেরয়ামাস গৌরী॥

পাছে শ্যামের গায়ে পা ঠেকে এই ভয়ে চন্দ্রাবলী দূরে দূরে পদনিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহাতে রাধার বয়স্যাদের হাসি পাইতেছিল।

রাধার প্রেম নলিনী ভ্রমরের প্রেমের মত নয়—তাহা সেই রস যাহা এক মৃণাল হইতে উদ্‌গত, দুইটি নলিনের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রেমে মান অভিমান কোপ দ্বেষের স্থান আছে, বরং এইগুলিই ঐ প্রেমকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে—জড়-ভাবাপন্ন হইতে দেয় নাই। ইহাই বিশুদ্ধ নির্মল মধুর রস বা উজ্জ্বল রস। বিন্দুমাত্র রসভঙ্গ হইলে রাধার দুঃখ হয়। এই দুঃখই রাধার অভিমান।

বৈষ্ণব কবিরা রাধার পাশে চন্দ্রাবলীর অবতারণা করিয়াছেন অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের রাগলীলা দেখাইবার জন্য। ইহার দ্বারাই রাধাপ্রেমের চরমোৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াছেন। চন্দ্রাবলীর প্রেম খুবই উচ্চস্তরের প্রেম, কিন্তু ইহাও বিশুদ্ধতম রাগরস নয়,—ইহাতে জীবনীশক্তির অভাব আছে। যে আঘাতের দ্বারা নিবিড়তর রস

আদায় করা যায়—চন্দ্রাবলী সে আঘাত হানিতেও জানিত না—সে প্রেমে ‘বৈদগধি’ বা তাদাত্ম্য লাভ করে নাই।

তাই বলিয়া চন্দ্রাবলীর প্রেম শ্রীকৃষ্ণ উপেক্ষা করিতে পারেন না। চন্দ্রাবলীর ভাব ‘কান্তাভাব সর্বসাধ্যসার’। রায় রামানন্দ সাধ্যসাধন তত্ত্ব বিচারে এই ভাবকেই চরম বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

> কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।
> রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
> এত দিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥

রায় রামানন্দ এইরূপ প্রশ্ন করিবার যোগ্যতা একমাত্র শ্রীচৈতন্যেরই আছে তাহা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন—

> ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
> যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

চন্দ্রাবলীর প্রেম সর্বসাধ্যসার, আর রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। ইহার উপর আর নাই। গোপীগণের মধ্যে চন্দ্রাবলীর প্রেমই রাধা-প্রেমের সমীপবর্তী। তাই শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে ত্যাগ করিতে পারেন না। রাধার কাছে লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধাপ্রেমের লোকোত্তর মাধুর্যের আস্বাদ পান এবং মনে মনে উল্লাস অনুভব করেন। এই দিব্যানন্দ অনুভব করিবার জন্যই যেন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়া তাহার পূর্ববর্তী রসের আস্বাদন। যে আনন্দ উপভোগের জন্য চতুর্ভুজ দ্বিভুজ মুরলীধারী হইয়াছেন—সে আনন্দের পূর্ণাস্বাদ লাভ করেন মানিনী রাধার চরণ ধরিয়া। চন্দ্রাবলী সাধিকা, তাহার মতে এই দশায় মান অসূয়া কোপ ইত্যাদি ভক্তিযোগের বিরোধিতা করে, তাই চন্দ্রাবলীর প্রণয়ে ঐ সব নাই। রাধিকা নিত্যসিদ্ধা। সিদ্ধাবস্থায় এই সমস্ত মহাভাবের বিরোধিতা করে না, বরং চরমোৎকর্ষ দান করে, প্রেমকে নিবিড়ায়িত করে—রাধার তাই অভিমান হয়।

কেবল রসবৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্যই রাধা ও চন্দ্রাবলীকে পৃথক্ করা হইয়াছে; বস্তুতঃ তাহারা অভিন্ন। রূপগোস্বামী তাঁহার ললিতমাধবের একটি শ্লোকের ধ্বনিব্যঞ্জনায় তাহা বুঝাইয়াছেন। মিলনে যে মনোভাব পার্থক্য লাভ করে, বিরহে তাহা যে এক্ হইয়া যায়, তাহা তিনি কাব্যরসের মধ্য দিয়াই বুঝাইয়াছেন।

সান্দ্রৈঃ সুন্দরি বৃন্দশো হরিপরিরম্ভৈরিদং মঙ্গলং।
দৃষ্টং তে হত রাধয়া ঽঙ্গমনয়া দিষ্ট্যাদ্য চন্দ্রাবলি॥
দ্রাগেনাং নিহিতাং বিধায় কণ্ঠমভিতঃ শীর্ণেন কংসদ্বিষঃ।
কর্ণোত্তংসসুগন্ধিনা নিজ ভুজদ্বন্দ্বেন সংধুক্ষয়॥

মাথুরবিরহে উন্মত্তপ্রায়া রাধিকা স্বীয় শীর্ণ অঙ্গের প্রতিবিম্ব দেখিয়া প্রতিবিম্বটিকে চন্দ্রাবলী মনে করিয়া বলিতেছেন—সুন্দরি, তুমি হরিকে বহুবার আলিঙ্গন করিয়াছ তাহাতে তোমার অঙ্গ মাঙ্গল্যময় হইয়াছে। আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আমার সেই অঙ্গ নয়নগোচর হইল। সখি, তোমার ঐ শীর্ণ বাহু দুটি শ্রীহরির কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাঁহার কর্ণোৎপলের সৌরভে সুবাসিত হইয়াছে—ঐ বাহু দুটি দিয়া আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আমাকে আবার সঞ্জীবিত কর।

চন্দ্রাবলী পৃথক নায়িকা নয়—রাধারই প্রতিবিম্ব। রূপের ঐ শ্লোকে এই কথাই দ্যোতিত হইয়াছে। শরীরিণীর সহিত প্রতিবিম্বের যে পার্থক্য—রাধার গাঢ়তম রাগরসের সহিত চন্দ্রাবলীর তরল রাগরসের সেই পার্থক্য। বস্তুতঃ, চন্দ্রাবলীর রাগরস রাধার মহাভাবেরই স্তরীভূত ও অঙ্গীভূত।

রাধা চন্দ্রাবলীর তত্ত্বটি নিম্নলিখিত কবিতায় প্রকাশ করা হইয়াছে—

রাধা-চন্দ্রাবলী

আয় বুকে আয় সজনী চন্দ্রাবলী,
দূরে রয়ে কেন করিস অশ্রুপাত?

সব চেয়ে মোর তুই যে আপন হ'লি,
গলায় জড়ায়ে ধর তোর দুটি হাত।
চারি চক্ষুর সলিল মিশাই আয়,
গাগরীতে ভ'রে পাঠাব তা মথুরাতে।
নতুন রাজার অভিষেক হবে তায়,
মুড়ানো কেশের চামর পাঠাব সাথে।
বিরূপ থেকে ছিঃ কীরূপ দিয়েছি ব্যথা,
বুক ফাটে স্মরি সেই ম্লান মুখখানি।
শুনিনি হেলায় তার মধুমাখা কথা ;
তাই চলে গেল ? সে তো নয় অভিমানী।
হয়তো আমরা দুটি ধাপ গায় গায়
এই ব্রজধামে তার লীলা-বেদিকার।
একটিতে বুঝি রাখি তার বাম পায়
ডান পা রাখিল আরটিতে পরে তার।
দুটি বুকে দুটি পায়ের চিহ্ন আঁকা,
আয় কাছে, আহা মিলায়ে তা দোঁহে হেরি।
কোন' অনুলেপে পড়বে না তা তো ঢাকা,
ব্রজে যদি ফিরে চিনতে হবে না দেরি।
হয়তো আমরা পৃথক নইকো মোটে ;
মায়াঘোরে ভাবি দোঁহে খণ্ডিতা ব'লে ;
একটি মৃণালে দুটি কি কমল ফোটে ?
দুইজনে পুন এক ক'রে গেল চ'লে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সম্ভোগ—পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ একটা বিশিষ্ট প্রকরণ। প্রায় সকল লীলাই সম্ভোগান্ত। এমন কি মাথুর বিরহকেও ভাবসম্মেলনের সাহায্যে সম্ভোগান্ত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। কবিকর্ণপূর সম্ভোগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। বস্ত্রাকর্ষণ, বর্ত্মরোধন ইত্যাদি প্রসঙ্গে যে সম্ভোগ তাহাই সংক্ষিপ্ত। উজ্জ্বলনীলমণির মতে—লজ্জা-ভীরুমুগ্ধা রাধার অর্ধবামতা অর্ধদাক্ষিণ্যের মধ্যবর্তী সম্ভোগও সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

সাধ্বস লজ্জাতে সংক্ষিপ্ত উপচার।
রতির সংক্ষেপে সংক্ষিপ্ত নাম তার॥

রাসলীলা, দানলীলা, নৌকাবিলাস, জলকেলি ইত্যাদি প্রসঙ্গে যে সম্ভোগ তাহা সঙ্কীর্ণ; দোলঝুলন ইত্যাদি প্রসঙ্গে সম্ভোগ সম্পন্ন আর স্বপ্নে মিলন, ভাবোল্লাস ইত্যাদি প্রসঙ্গের সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান্।

উজ্জলনীলমণির মতে মানের পর সম্ভোগও সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ।

তপ্ত ইক্ষু প্রায় হয় সংকীর্ণ শৃঙ্গার।

রাধামোহন বলিয়াছেন—"চরবণ তপত কুশারি।" কবি এই সম্ভোগের বর্ণনায় বলিয়াছেন—

মুখবিধু চুম্বনে রাই কহয়ে পুন যাহ চন্দ্রাবলীগেহ।
নিবিড় আলিঙ্গনে মানভরমে তহি ধীরে ধীরে কুঞ্চই দেহ॥

প্রবাস হইতে প্রিয়ের গৃহাগমনের পর সম্ভোগ সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ সম্ভোগ। উজ্জ্বলনীলমণির মতে—

রূঢ়ভাবে বিপ্রলম্ভের পরে যে শৃঙ্গার।
নির্ভর পরম সুখ সম্পূর্ণ নাম তার॥

দীর্ঘ বিরহের পর কবিগণ শ্রীরাধার ভাবাবেশে, স্বপ্নে ও রূপান্তরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ঘটাইয়াছেন। এই মিলনসম্ভোগই সমৃদ্ধিমান্।

বিদ্যাপতির— আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু
পেখনু পিয়া মুখচন্দা।

পদটি এই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের বিখ্যাত পদ।

সম্ভোগলীলার পদগুলি সবই এক ধরণের। এইগুলিতে বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু নাই। আলঙ্কারিক চাতুর্যের দ্বারা সম্ভোগের নগ্নতাকে যতদূর সম্ভব আচ্ছন্ন ও কবিত্বরসমণ্ডিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রাধাশ্যামের যুগলমিলনের বর্ণনায় অবশ্য কবিরা অতিমাত্রায় ভাবগদ্‌গদ হইয়াছেন, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলঙ্কারিক চাতুর্যেরই বিস্তার দেখা যায়। যেমন—

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম।
মরকতে যৈছন বেঢ়ল হেম॥
কনকলতায় জনু তরুণ তমাল।
নবজলধরে জনু বিজুরী রসাল॥

এই শ্রেণীর উৎপ্রেক্ষাই যুগলমিলনের পদগুলিতে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।

প্রেমবৈচিত্ত্য—সম্ভোগেরই একটি অঙ্গ প্রেমবৈচিত্ত্য। সম্ভোগের মধ্যে অন্য কোন রসের বা ভাবের ছায়াপাত হইলে প্রেমবৈচিত্ত্য ঘটে,—সকল সম্ভোগই সঙ্কীর্ণ সম্ভোগে পরিণত হয়। পদকর্তারা মিলনের মধ্যে বিরহ-ভ্রান্তি ঘটাইয়া প্রেমবৈচিত্ত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। আসল প্রেমবৈচিত্ত্য ইহাকে বলা যায় না। প্রণয়িজন কণ্ঠাশ্লিষ্ট থাকিলেও উপভুক্তা মিলনসুখমুগ্ধা নায়িকার চিত্তের যদি অন্যথাবৃত্তি হয়, তবেই তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলা যায়।

চণ্ডীদাস একটি বাক্যে আসল প্রেমবৈচিত্ত্যের কথা বলিয়াছেন—

দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

বিচ্ছেদের ভয়, হারাই-হারাই ভাব, মিলন কালের অনিবার্য অবসানের চিন্তা মিলনের মধ্যে বৈচিত্ত্য ঘটায়।

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি

জ্ঞানদাস বলিয়াছেন—

কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে তেঞি সদা লয় নাম।

প্রিয়তমের ক্রোড়ে থাকিয়াও যে মনে হয়—দূরত্ব ঘুচিল না, অঙ্গের চীর চন্দন হারকেও যে মিলনের বাধা বলিয়া মনে হয়, দুই দেহের ব্যবধান যে মিলনকে সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে দিতেছে না বলিয়া মনে হয়—এই ভাবকেই লোকোত্তর প্রেমবৈচিত্ত্য বলা যায়। যে পদগুলিতে এইভাবের ব্যঞ্জনা আছে সেই পদগুলিই উৎকৃষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের গাঢ়তা ও গূঢ়তার কথা ভাবিলে সকল সম্ভোগই সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। মানের পর যে মিলনসুখ তাহা অবিমিশ্র নয়—তাহাতে রোষস্মৃতির ছায়া থাকিয়া যায়। এই ছায়া মানান্ত-মিলনে সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হয় না। কাজেই মানান্ত মিলনসম্ভোগ সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। কবিকর্ণপূর ইহাকে তালিকায় স্থান দেন নাই। পদকর্তা রাধামোহন এইরূপ সম্ভোগসুখকেই বলিয়াছেন—চরবণ তপত কুশারি অর্থাৎ তপ্ত ইক্ষুচর্বণ।

আর একপ্রকারের প্রেমবৈচিত্ত্য আছে। শ্রীমতী প্রতিদিনই বংশীধ্বনি শোনেন আর মনে করেন এই বংশীধ্বনি যাহার, তাহার সঙ্গে মিলনের উপায় কি? ইহার ফলে শ্রীমতীর আবার নূতন করিয়া পূর্বরাগের লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইতে থাকে।/

রূপ গোস্বামী এই ভাবকে নাটকে রূপদান করিয়াছেন।

কুন্দলতা ললিতমাধবে বলিতেছেন—সহি এসো লোওত্তরস্স বত্থুনো নিসগ্গো জং সব্বদএ উপভুজ্যমানব্বি অভুত্তরুব্বমেব ভোদি।

লোকোত্তর বস্তুর স্বাভাবিক ধর্মই এই, সর্বদা উপভুজ্যমান হইলেও অভুক্তপূর্ব বলিয়া মনে হয়।

ইহা অনুরাগ-বীজের পুনরাধান। অনুরাগ-বীজের পুনরাধানের নাম সমাধান। শ্রীমতীর প্রেমজীবনে ইহাকে সমাধান নামক যুগসন্ধি বলা হয়।

আসল প্রেমবৈচিত্ত্য কি তাহা ছন্দে বলিতে হইলে বলিতে হয়—

লাখ লাখ যুগ ধরি রাখি হিয়া হিয়া পরি
হিয়া না জুড়ায়।
মলয়জ চুয়া চীব ব্যবধানে সে অধীর
প্রাণ পুড়ে যায়॥
নিমেষ অন্তর হ'লে কোটিকল্প যুগ ব'লে
মনে হয় তারে।
সোহাগের বাণী যত কণ্ঠে এসে পবিণত
হয় হাহাকারে॥
মিলনে কোথায় স্বস্তি তুষানলে মজ্জা অস্থি
পুড়ে হয় ছাই।
ত্রাসে তৃপ্তি পায় লয় গ্রাসে তুষ্টি, শুধু ভয়
হাবাই হারাই॥
এই প্রেমে কোথা সুখ? দ্রবীভূত হয় বুক
এতে পলে পলে।
চুম্বনের সুধা তায় লবণাক্ত হ'য়ে যায়
নয়নের জলে॥
হাসিতে হাসি না আসে কামনা পলায় ত্রাসে
ছিঁড়ি ফুলহার।
ভুষণে দূষণ বলি মনে হয়, যায় জ্বলি
উৎসব-সম্ভার॥

এ প্রেম ব্যথায় গড়া মরণে বরণ করা
অসহ্য জ্বালায়।
উল্লাস করিতে আসি নয়নের জলে ভাসি
সখীরা পালায়॥
শঙ্কর-গৌরীর তপ করে ইষ্টনাম জপ
এ গভীর প্রেমে।
ধনুতে জুড়িয়া শর অবশ পাণিতে স্মর
র'য়ে যায় থেমে॥
বিরহ-নিদাঘশেষে মিলন বরষা এসে
কাঁদায় কাঁদিয়া।
দুহুঁ দোঁহা বুকে বাঁধে দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে
বিচ্ছেদ ভাবিয়া॥

রসালস ও কুঞ্জভঙ্গ—সম্ভোগান্তে নায়ক-নায়িকার অবসাদ বা আলসই রসালস। এই পর্যায়ে কুঞ্জকুটীরে সম্ভোগ-রজনী যাপনের ফলে রাধাশ্যামের দেহ মনে যে বিপর্যয় ঘটিতেছে তাহারই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। জগদানন্দরচিত কুঞ্জভঙ্গের বিখ্যাত পদটি এই পর্যায়ের প্রধান পদ। অতিরিক্ত অনুপ্রাস-যমকে ভরা হইলেও পদটি কবিত্ব-মধুর। পদের শব্দালঙ্কারের ভার যেন কুঞ্জকুটীর হইতে শ্রীরাধার বহির্গতিকে মন্থর করিয়া তুলিয়াছে। অলঙ্কৃতির আতিশয্যই রসালসকেও বাণীরূপ দিয়াছে। পদটি এই—

অকরুণ পুন বাল অরুণ উদিত মুদিত কুমুদ বদন॥
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পদুমিনীক সদন সাজে।
কি জানি সজনি রজনী ভোর ঘূঘূ ঘন ঘোষত ঘোর
গত যামিনী জিতদামিনী কামিনীকুল লাজে॥

রাধার কেশবেশ বিতথ, নয়নের কাজর সীঁথির সিন্দূর মুছিয়া গিয়াছে। প্রভাতের অরুণ আলোকে শ্রীমতী লজ্জা পাইতেছেন—

কি করিয়া পুরপথ দিয়া গৃহে ফিরিবেন? পদকর্তাদের সুরে সুর মিলাইয়াই যেন রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন বেলা হ'ল মরি লাজে।

রাধাশ্যামের মন্দিরে মন্দিরে জগদানন্দের এই পদ ভোর রাত্রে খঞ্জনী সহযোগে গীত হয়। বৈষ্ণবপ্রধান গ্রামের পথে পথেও ইহা টহলগান রূপে গৃহীদের নিদ্রাভঙ্গ করে। সমগ্র পদটি এই—

ফুকরত হতশোক কোক জাগব অব সবহুঁ লোক
শুক সারিক পিক কাকলি মধুবন ভরু বাজে॥
গলিত লুলিত বসন সাজ মণিযুত বেণি ফণি বিরাজ
উচ-কোরক-রুচ-চোরক কুচজোরক মাঝে॥
তড়িত জড়িত জলদ ভাতি ত্বহে সুখে শুতি রহল মাতি
জিনি ভাদর রসবাদর পরমাদর শেজে॥
বরজ-কুলজ জলজ-নয়নী ঘুমল বিমল-কমল-বয়নী
কৃত-লালিস ভুজবালিশ আলিস নাহি তেজে॥
টুটল কিয়ে ঘুণ ধনুগুণ কিয়ে বতিরণে ভেল তূণ শূন,
সমর মাঝ পড়ল লাজ রতিপতি ভয়ে ভাজে॥
বিপতি পড়ল যুবতিবৃন্দ গুরুজনগণ কহই মন্দ
জগদানন্দ সরস বিরস রসবতী রসরাজে॥

নিম্নে খাঁটি বাংলার রূপটি দেখানো হইল।

উদিত নিঠুর তরুণ তপন মুদিত তড়াগে কুমুদীবদন
চমকিয়া চুমি মধুকরগণ নলিনীর পাশে সাজে।
ঘনঘন ঘুঘু ডাকে যে সজনী, ভোর হয়ে গেল তবে কি রজনী।
যামিনী অন্তে দামিনী-কান্তি কামিনীরা মরে লাজে॥
মিলন আশায় খুশী চখাচখী জাগে সব নরনারী।
সারা মধুবন করে বিধুবন যত পিক শুক সারী।
নীবির বাঁধনে গলিত বসন বেণী মণিযুত ফণীর মতন
বিলুলিত, উচ কোরকের মত কুচযুগলের মাঝে॥

রসের বাদরে পরম আদরে দুহুঁ দোঁহা বাহুপাশে।
শায়িত যেন বা তড়িত জড়িত জলদ ভাদর মাসে॥
ভুজ উপাধান শ্রান্ত রাধার অবসাদ নাহি করে পরিহার,
ঘুমায় শ্রীমতী নয়নে বদনে মুদিত কমল রাজে॥

রতিরণে হারি মকরকেতু কি পালাইল লাজে ক্ষুণ্ণ।
ঘুণে কি কাটিল ধনুকের গুণ তূণ কি তাহার শূন্য?
গুরুজন জাগি গতায়াত করে, সখীরা তা' দেখি পড়িল ফাঁপরে
হরিষে বিষাদ ঘটিল প্রভাতে রসবতী রসরাজে॥

[ধ্রুবপদ—জাগর বৃখভানু নন্দিনী মোহন যুবরাজে।—পদকল্পতরুতে নাই, কিন্তু এই ধুয়া আমরা কীর্তনে শুনিয়া থাকি।]

ইহা ত গেল বাহিরের কথা। অন্তরের কথা আরো নিদারুণ—শ্যামকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, আবার কখন দেখা হইবে কে জানে? ইহা ত পৌর জীবনের দাম্পত্য প্রণয় নয়, এ যে 'চৌরি পীরিতি'।

রাধামোহন বলিয়াছেন—

পদ আধ চলত খলত পুন ফীরত কাতরে নেহারই মুখ।
একুই পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন অতয়ে সে মানয়ে দুখ॥

শ্রীমতী যে একতিল বিরহকে কল্পকালের বিচ্ছেদ মনে করেন। কুঞ্জ ত্যাগ করিয়া দ্রুতই চলিতে হইবে, কিন্তু পা যে চলে না।

সম্ভোগস্মৃতি—প্রথম প্রথম মিলনের পর রাধা সখীদের কাছে সম্ভোগের মধুর অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেন না; সখীদের পীড়াপীড়িতে কিছু কিছু বলিতেন—বলিতে গিয়া লজ্জা পাইতেন। ক্রমে প্রেম পরিপক্বতা লাভ করিলে আর সখীদের অনুনয়-বিনয়ের প্রয়োজন হইল না। রাধা এখন আপনা হইতেই সব কথা বিনাইয়া বিনাইয়া বলেন। দিবাবিরহে ইহাই তাঁহার সম্বল। ইহাই তাঁহার সম্ভোগস্মৃতির বাঙ্ময় বিলাপ। সখীদের কাছে সব কথা রসাইয়া রসাইয়া বলিয়া শ্রীমতী তৃপ্তি পান—তাঁহার হৃদয়ভার

লঘু হয়। পদকর্তারা রাধার এই বাগ্‌-বিলাসকে বহু পদে রূপদান করিয়াছেন কিছু কিছু নিদর্শন এই—

কোরে আগোরি রাখই হিয়াপর পালঙ্কে পাশ না পাই।
ও সুখসরোবরে মদন রসভরে জাগিয়া রজনী গোঙাই।
(নরোত্তম দাস)

হিয়ার উপর হ'তে শেজে না ছোঁয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
নিন্দের আবেশে যদি পাশমোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠিয়ে॥ (জ্ঞানদাস)
এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥ (চণ্ডীদাস)

হিয়ার উপরে ধরি কাঁপে পহু থরহরি
মুখে মুখ দিয়া ঘন কান্দে।
বিহি পোহাইলে রাতি মোরে ছাড়ি যাবে কতি
ধরণী থীর নাহি বান্ধে॥ (ধরণীদাস)

ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে আমারে রাখিতে চায়।
হার নহোঁ পিয়া গলায় পরয়ে চন্দন নহোঁ মাখে গায়॥
(বলরামদাস)

খেনে বুকে খেনে পিঠে খেনে রাখে দিঠে দিঠে
হিয়া হতে শেজে না ছোঁয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥ (বলরামদাস)

রাধা বলিতেছেন—আরো কত ভাবেই না প্রিয়তম আমার আদর করে। আমার চর্বিত তাম্বূলের অংশ ছাড়া সে তাম্বূল খায় না। হৃদয়ে হৃদয়ে ব্যবধান ঘটিবে বলিয়া অঙ্গে চন্দন মাখে না, কর্পূরসহ তাম্বূল

সাজিয়া আমার মুখে দেয়, ঘামিলে আঁচল দিয়া আমার মুখ মুছাইয়া দেয়, অঙ্গে চন্দন মাখাইয়া দেয়, দীপ হাতে করিয়া বারবার আমার মুখ দেখে, আমার কেশ আলুলিত করিয়া আবার নিজ হাতে বাঁধিয়া দেয়। চরণ অঙ্কে রাখিয়া আলতা আঁকিয়া দেয়—এমনই কত কি।

এ সব ত গেল কুঞ্জকুটীরে মিলনরজনীর কথা। রাধা শ্যামের সারাদিনের আচরণের কথাও বলিয়াছেন—

মো যদি সিনাঙ আগিলা ঘাটেতে পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়া বাহু পসারিয়া চায়॥
বসনে বসন লাগিবে বলিয়া একই রজকে দেয়।
মোর নামের এক আঁখর পাইলে হরিষ হইয়া নেয়॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিব বলিয়া ফিরয়ে শতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যেদিকে সে মুখে সেদিন থাকে॥

(রায়শেখর)

শেষ পংক্তি মেঘদূতের—

আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ।
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি॥ এই শ্লোকার্ধ

এবং জয়দেবের—

বহুমনুতে ননু তে তনুসঙ্গত-পবনচলিতমপি রেণুম্।

এই চরণ মনে পড়ায়।

জ্ঞানদাসের রাধা বলিয়াছেন—

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী লইতে আমারি নাম॥
আমার অঙ্গের বসন-সৌরভ যখন যেদিকে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া তখন সে দিগে ধায়॥

গোবিন্দদাসের রাধা আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন—

দুপুরবেলায় আমি নাহিতে যাই বলিয়া তপ্তপথে কলসী ভরিয়া জল ঢালিয়া সে পথ শীতল করিয়া রাখে। স্নানের পথে আমার জলসিক্ত পদচিহ্নগুলিতে সে চুম্বন করে। আমি লজ্জায় মরি—

প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান। তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ॥
লোকে দেখিলে কি বলিবে মোরে। নাসা পরশিয়া রহিনু দূরে॥

রাধা এখন আর মুগ্ধা নায়িকা নহেন। এখন তিনি

স্মরান্ধা গাঢ়তারুণ্যা সমস্ত-রত-কোবিদা।
ভাবোন্নতা দরব্রীড়া প্রগল্‌ভাক্রান্তনায়কা।

তাঁহার মুখে এখন আর কিছু বাধবাধ ঠেকে না। রাধা যে-সব কথা বলেন সে-সব যেন বাৎসায়নের কামসূত্র অবলম্বনে রচিত। এই পদ-গুলিতে শ্রীমতীর জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও মোহাচ্ছন্ন অবস্থা—এই তিন অবস্থার কথাই আছে। এই প্রসঙ্গে রাধা কেবল নিজের সুখ-স্মৃতির কথাই বলেন নাই—তাঁহার জন্য শ্যাম কত বেদনাই সহ্য করিয়াছেন তাহাও বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে সঙ্কেত করিয়া তাহাকে কত বেদনাই না দিয়াছি!

আঙিনার কোণে বঁধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে।

আর একদিন সঙ্কেত করিয়াছিলাম—সে আমার প্রাঙ্গণ-কোণে কোলি বিটপিতলে সারারাত বৃথাই কাটাইয়া গেল। আমি সঙ্কেতানুসারে জাগিয়া উঠিতেই ননদীও জাগিয়া উঠিল, কাজেই মিলন আর হইল না।

রাধা একদিন বড় লজ্জাসঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। প্রাতে উঠিয়া তিনি দেখেন অঙ্গনময় শ্যামের পদচিহ্ন। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন লুকাইবার

নয়। পরিজনগণ দেখিলে বলিবে কি? রাধা তখন গোবর জলের সঙ্গে চোখের জল মিশাইয়া অঙ্গন লেপিতে লাগিয়া গেলেন।

এই প্রসঙ্গে রাধা কত ছল-কৌশলে পরিজন গুরুজনদের প্রবঞ্চিত করিয়া শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন এবং শ্যামও কত ছলনায় তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন—সে সব কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। বিদ্যাপতি এই কাহিনীর একজন প্রধান কবি। এই শ্রেণীর পদে বিদ্যাপতির অসাধারণ রসচাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আক্ষেপানুরাগ—শ্রীমতীর সম্ভোগস্মৃতি এবং স্মৃতিসম্ভোগের বহু পদই রসভূয়িষ্ঠ। তাঁহার আক্ষেপের কাহিনী দীর্ঘতর এবং অধিকতর রসঘন। কবিত্বের দিক্ হইতে পদাবলী-সাহিত্যে এই আক্ষেপানুরাগের খুবই প্রাধান্য। রাধার অনুরাগই ত আক্ষেপানুরাগ। রাধার অনুরাগ অসীম, কিন্তু বঁধুর সহিত মিলনে এত বিঘ্ন বাধা যে, রাধার আক্ষেপের সীমা নাই। রাধা এত বেশি অধীরা, জীবনীশক্তির প্রাবল্য তাঁহার এত বেশি যে, সামান্য ব্যবধান, বিচ্ছেদ বা উপেক্ষাও তিনি সহ্য করিতে পারেন না। রাধা ত জড়ভাবাপন্না চন্দ্রাবলী নন, কাজেই রাধাকে সর্বদাই আক্ষেপ করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে পূর্বরাগ হইতে মাথুর পর্যন্ত রাধার জীবনের প্রত্যেক লীলা-বৈচিত্র্যে এই আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হইতেছে। মিলনের মধ্যেও রাধার আক্ষেপ প্রত্যাসন্ন বিচ্ছেদের ভাবনায়। রসোদ্গারে সুখস্মৃতির বিবৃতি দিতে গিয়া শ্যামকে সঙ্কেতের দ্বারা তিনি কত দুঃখই না দিয়াছেন, সে কথা স্মরণ করিয়া তিনি কত না আক্ষেপ করিয়াছেন!

কুলশীল ও লোকভয়ের বাধা আছে সত্য, কিন্তু সে বাধা ত রাধা জয় করিয়াছেন। শ্যামের সহিত মিলনও দুর্লভ নয়, শ্যামের পক্ষ হইতে উপেক্ষাও অসম্ভব। তবে এত আক্ষেপ কেন? প্রকৃতপক্ষে এ আক্ষেপ যেন শ্যামের মহাপ্রেমের গূঢ় রহস্য বুঝিতে না পারায়—অগাধ প্রেমে থাই না পাওয়ায়। তাই রাধার এই আক্ষেপের আর্তবাণী ভক্তমাত্রেরই প্রাণের বাণী হইয়া উঠিয়াছে।

কবিকর্ণপূর ইহাকেই বলিয়াছেন—প্রেমবৈচিত্ত্য। পদকর্তারা মিলনে বিরহ-ভ্রান্তিকে বলিয়াছেন প্রেমবৈচিত্ত্য। অদর্শনে উপেক্ষা-ভ্রান্তি ঘটে বলিয়া বোধ হয় আক্ষেপানুরাগকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলা হইয়াছে। আক্ষেপানুরাগে ধ্বনিত হইয়াছে একটা অতৃপ্তির সুর—

যেন প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে দেখাই হইল না—চিরদিনের মত পাওয়া ত দূরের কথা। গুরুজন, পরিজন, কুলশীল, লোকভয়ের বাধার জন্যও রাধার আক্ষেপ কম নয়। শ্যাম তাহাকে উপেক্ষা করিতেছেন এই কল্পনা করিয়াও রাধার আক্ষেপ জন্মে, তাহা ছাড়া প্রেমের নিজস্ব একটা জ্বালা (বিষামৃতে একত্র মিশ্রণে) আছে, সেই জ্বালাই আক্ষেপের সুর লাভ করিয়াছে।

প্রেমে অতৃপ্তি—যে অতৃপ্তির সুরের কথা বলা হইল তাহাও গভীর প্রেমমাত্রেরই একটা অঙ্গ। জ্ঞানদাসের রাধা বলিয়াছেন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

সম্পূর্ণ পাইবার জন্য এই আগ্রহই অতৃপ্তির নামান্তর।

গোবিন্দদাসের রাধা বলিয়াছেন—ভাল করিয়া শ্যামকে দেখাই হইল না।

অব হাম না বুঝি বিধান।
অতিশয় আনন্দ বিঘিন ঘটাওল
হেরইতে ঝরয়ে নয়ান॥
দারুণ দৈব কয়ল দুহুঁ লোচন
তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরিষে দুহুঁ দিঠি পূরল
কৈসে হেরব মুখ চাই॥
তাহে গুরু দুরুজন লোচন-কণ্টক
সঙ্কট কতহু বিথার।
কুলবতি বাদ বিবাদ করত কত
ধৈরজ লাজ বিচার।

সহস্র লোচন থাকিলেই বা কি হইত? রূপ যাহার বিজুরি সমান, স্পর্শে যাহার আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহার পীরিতে তৃপ্তি কোথায়? কবিবল্লভ তাই বলিয়াছেন, যাহা অনুখন নৌতুন হয়—তাহা কি তৃপ্তি দিতে পারে?

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।"

সর্বদা প্রিয়কে অন্তরে অনুভব করিলেও যে রাগ প্রিয়কে নিত্য নূতন করিয়া তুলে তাহার অনুভবে তৃপ্তি কোথায়?

তাই কবিবল্লভ বলিয়াছেন—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ
হৃদয় জুড়ন নাহি গেল॥
বচন অমিয় রস অনুখন শূনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেলি।
কত মধুযামিনী রভসে গোঙায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি॥

প্রেমের নিজস্ব জ্বালার কথাও বহু পদে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। বলরাম দাস বলিয়াছেন—

খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ দূরে গেল গো
হিয়া ডহ ডহ মন ঝুরে
উড়ু উড়ু আনছান ধক ধক করে প্রাণ
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে।

উপেক্ষার ব্যথা—উপেক্ষাজনিত আক্ষেপ সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে এবং সখীদের নিকটে ব্যক্ত হইয়াছে। রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা কখনও রসসঙ্গত হইতে পারে না। অতএব এ উপেক্ষা রাধার কল্পনারই সৃষ্টি। প্রেমার্ত চিত্তের স্বাভাবিক ধর্মই এই। রাধার এই

আক্ষেপ নানা সুরে নানা পদে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। চণ্ডীদাস ইহার প্রধান কবি। চণ্ডীদাসের রাধা বলিয়াছেন—

১। রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বন্ধু তোমার পীরিতি॥
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর॥
বন্ধু যদি তুমি মোরে নিকরুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

২। যখন পীরিতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনি করিতে মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর হিয়ার উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥

জ্ঞানদাসের রাধা বলিয়াছেন—

বড় বৃক্ষছায়া দেখি ভরসা করিলুঁ মনে
ফুলে ফলে একই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ আমারে যে দিলা লাজ
জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্ধ॥

রাধার কাছে 'ছায়া' হইল মায়া। রাধা ভাবিয়াছিল—ফলের গন্ধ বুঝি ফুলের গন্ধের মতই মধুর হইবে। রাধার আক্ষেপ চরমে উঠিয়াছে নিম্নলিখিত পদে—

বন্ধুর লাগিয়া ঘর তেয়াগিনু লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার লয় আন জন ইহা কি পরাণে সয়?
সই, কত না রাখিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আনবাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া॥
বন্ধুর হিয়া এমন করিল না জানি সে জন কে?
আমার পরাণ যেমন করিছে তেমনি হউক সে॥

রাধার আক্ষেপ সত্য হইতে পারে, তাঁহার অভিশাপ সত্য হইবে না। রাধার পরাণ যেমন করিতেছে এই ত্রিভুবনে আর কাহারও পরাণ তেমন করিবে না। রাধার মত শ্যামগতপ্রাণা ত ত্রিভুবনে আর নাই।

সমস্ত আক্ষেপের মধ্যে বিরহেরই সুর ধ্বনিত হইতেছে—পৃথক্ করিয়া বিরহজনিত আক্ষেপও আছে।

গোবিন্দদাসের রাধা বলিয়াছেন—

হিয়ে ঘনসার হার নাহি পহিরলুঁ
যাক পরশ রস আশে।
তাকর বিচ্ছেদে জিউ নাহি নিকসয়ে
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥

বলরাম দাসের রাধা বলিয়াছেন—

কি ছার পরাণ কাজে।
স্বপনে তা সনে নাহি দরশন জগৎ ভরিল লাজে॥

কবিশেখরের রাধা বলিয়াছেন—

কবহুঁ রসিক সনে দরশ হোয় জনি
দরশনে হয় জনি নেহ।
নেহ বিচ্ছেদ জনি কাহুঁকে উপজয়ে
বিচ্ছেদে ধরয়ে জনি দেহ॥
যবহুঁ দৈবদোষে উপজয়ে প্রেমহি
রসিকজনে জনি হোয়।
কানু সে গোপত নেহ করি অব এক
সবহুঁ শিখায়ল মোয়॥
হেন ঔষধ সখি কাঁহা নাহি পাইয়ে
জনু যৌবন জরি যায়।
অসমঞ্জস রস সহিতে না পারিয়ে
ইহ কবিশেখর গায়॥

জ্ঞানদাসের রাধা বলিতেছেন—

যাহে বিনু স্বপনে আন নাহি হেরিয়ে
অব মোহে বিছুরল সোই।
হাম অতি দুখিনী সহজে একাকিনী
আপন বলিতে নাহি কোই॥

নৈরাশ্য—বিরহ হইতে রাধার মনে দারুণ বৈরাগ্য জন্মিতেছে। জ্ঞানদাসের রাধা বলিয়াছেন—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥

চণ্ডীদাসের রাধা বলিয়াছেন—

শীতল বলিয়া পাষাণ কোলে লইলাম—দেহের অনলতাপে পাষাণ গলিয়া গেল। তরুচ্ছায়ায় আশ্রয় লইলাম—তরু জ্বলিয়া উঠিল। যমুনায় ঝাঁপ দিলে আমার দেহের তাপ আরও বাড়িয়া গেল। পীরিতির বেদনা ত আছেই—সেই বেদনা আবার গোপন করিতে হয়। সেই গোপন করার বেদনা ও বিড়ম্বনা কি কম? কুলবতী হইয়া পীরিতি করিলে এমনই সঙ্কট ঘটে যে—

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে।

চোখের জল ফেলিবারও উপায় নাই। পরিজনদের কাছে চোখের জলের কৈফিয়ত দিতে হয়।

রন্ধনশালায় যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই।
ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।

পীরিতির স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশের একদিক ঢাকিতে আর একদিক উদাস হইয়া পড়ে। জ্ঞানদাসের রাধা বলিতেছেন—

গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥

প্রেমনিন্দা—চণ্ডীদাসের রাধা পীরিতির উদ্দেশে অনেক ধিক্কার দিয়া বলিলেন এ পীরিতি—

শঙ্খবণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে।

চণ্ডীদাস তাহার উত্তরে বড় সার কথা বলিয়াছেন—

১। চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী
পীরিতি না কহে কথা।
পীরিতির লাগি পরাণ সঁপিলে
পীরিতি মিলয়ে তথা॥

২। কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখদুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই॥

রচনাভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় ইনি দীন চণ্ডীদাস।

বিদ্যাপতির রাধা সখীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—

সজনি কানুকে কহবি বুঝায়।
রোপিয়া প্রেমবীজ অঙ্কুরে মোড়সি
বাঢ়ব কোন উপায়॥
তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল
তৈছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে খণহি শুখায়ল
ঐছন তোহারি সোহাগে॥
কুলকামিনী ছিলুঁ কুলটা ভৈ গেলুঁ
তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম মুড় মুড়ায়লুঁ
কানুসে প্রেম বাঢ়াই॥

চোররমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুঞ্জইতে চাই॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলি-যুগরীতি
চিন্তা না কর কোই।
আপন করম দোষ আপনি ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই॥

অর্থাৎ

সজনি লো, ভাল ক'রে বুঝাবি তাহায়।
রোপিয়া প্রেমের বীজ মুড়াইলে অঙ্কুরে
বাঁচিবার কি আছে উপায়?
তৈলবিন্দুসম হৈল সু-প্রসারিত
কানু তব নব অনুরাগ।
বালুকায় বারিসম নিমেষে শুখায়ে গেল
হায় হায় তোমার সোহাগ॥
কুলের কামিনী আমি শুনিয়া লোভন বাণী
হায় হায় কুলটা হ'লাম।
হায় রে নিজের হাতে মুড়াইনু নিজ মাথা,
কানু প্রেমে এই পরিণাম!
চোরের ঘরণী যেন মনে মনে কেঁদে মরে
অঞ্চলে মুখটি লুকায়।
সেই দশা হলো মোর, দীপলোভে পুড়ে মরি
ধেয়ে গিয়ে শলভের প্রায়॥

ভণিছে বিদ্যাপতি এই কলিযুগ-রীতি
ইহাতে কি আছে বা বিস্ময় ?
যেইজন পরবশ আপন করম দোষ
এমনি ভুগিতে তারে হয় ॥

বিদ্যাপতি ত আর সখীভাবাপন্ন কবি নহেন যে, নরোত্তম দাসের মত বলিবেন—'ধৈরজ ধর ধনি ধাইয়া চলিলুঁ গো।' বিদ্যাপতির সে দরদ নাই। তিনি বলিলেন, 'আপন কর্মের ফল আপনি ভোগ কর।' চণ্ডীদাসও সখীর মত কথা বলেন নাই, তবে তাঁহার দরদের অভাব নাই। তিনি পীরিতির স্বাভাবিক ধর্ম কি তাহাই বলিয়া শ্রীমতীকে আশ্বস্ত হইতে বলিয়াছেন।

রাধা ক্রমে নিজের উদ্দেশে, বিধাতার উদ্দেশে, কন্দর্পের উদ্দেশে, মুরলীর উদ্দেশে আক্ষেপ জানাইয়াছেন। নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন—দোষ কাহারো নয়—দোষ আমারি। বাতাসের প্রবাহ বুঝিয়া থুথু ফেলিতে হয়, থেহ (থাই) বুঝিয়া জলে পা বাড়াইতে হয়; ডাল শক্ত কিনা দেখিয়া ডাল ধরিতে হয়—এ সত্য ত আমি বুঝি নাই। কাজেই আজ—'মরমক দুখ কহিতে হয় লাজ।' প্রতিকূলার উদ্দেশে রাধা বলিয়াছেন,—

আমার বন্ধুরে যে করিতে চায় পর।
দিবস দুপুরে যেন পুড়ে তার ঘর ॥

কন্দর্পের উদ্দেশে রচিত পদগুলির মধ্যে বিদ্যাপতির 'কতয়ে মদন তনু দহসি হামার' পদটি কলাচাতুর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

মুরলীর উদ্দেশে রাধা বলিয়াছেন—

খলের বদনে থাক নাম ধরি সদা ডাক
গুরুজনা করে অপযশ।
খল হয় যেই জনা সে কি ছাড়ে খলপনা
তুমি কেন হও তার বশ ॥

শ্রীমতী কানুকে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। কানড় কুসুম হাতে ছোঁন না, চোখে কাজল পরেন না, মেঘের পানে চান না, যমুনায় গেলে কদমতলার পানে চান না, বাঁশী শুনিলে কানে আঙুল দেন।

তবু সেই কালা অন্তরে জাগয়ে
কালা হৈল জপমালা।

আত্মসমর্পণ—শ্রীমতী শেষ পর্যন্ত সঙ্কল্প করিলেন, কালাকে লইয়া কুণ্ডল পরিয়া তিনি যোগিনী হইবেন—যে কালাকে ছাড়িতে বলিবে সে বধের ভাগী হইবে। মুরারিগুপ্তের রাধা সর্ব বাধা জয় করিয়া বিজয়িনীরূপে দেখা দিয়াছেন; সখীকে বলিতেছেন—

সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোতবিথার জলে এ তনু ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥

এ কুল, কুলও বটে, কূলও বটে!

জ্ঞানদাসের রাধাও বলিয়াছেন—

তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু শ্যাম বন্ধু বিনু
আর কেহ মোর নয়॥

তোমরা কুল লইয়া ঘরে থাক। বলরাম দাসের রাধা ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

ছাড়ে ছাড়ুক পতি কি ঘর বসতি
কিবা বলিবে বাপ মায়।

জাতি জীবন ধন এ রূপ যৌবন
নিছনি সঁপিব শ্যাম পায়॥

রাধার সমস্ত আক্ষেপ শেষ পর্যন্ত কানুর উদ্দেশে করুণ আবেদনের রূপ ধরিয়াছে—

খাইতে সোয়াস্ত নাই নাহি টুটে ভুখ।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে ক'ব দুখ॥
তাহে আর ননদিনী করে অপমান।
তোমার পীরিতি লাগি রাখিয়াছি প্রাণ॥
তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় সব লোকে।
লাজে মুখ নাহি তুলি সতীর সম্মুখে॥
এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি।
মোরে দেখি আন নারী করে ঠারাঠারি॥
চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়াপড়সীর ডরে।

এমন অবস্থায় তুমি যদি অকরুণ ও নিদারুণ হও তাহা হইলে আমি দাঁড়াই কোথায়, বন্ধু? এ আবেদন ত একহিসাবে শ্যামের পায়ে ধরা। অকৈতব গভীর প্রেমের পক্ষে দয়িতকে পায়ে ধরানো যেমন স্বাভাবিক, দয়িতের পায়ে ধরাও তেমনি স্বাভাবিক।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

স্বয়ংদৌত্য—যত দিন নায়িকা মুগ্ধা বা লজ্জাশীলা থাকে, ততদিনই সখী বা দূতীর প্রয়োজন হয়,—অভিসারেও সখী সঙ্গিনী হয়। কয়েকবার প্রিয়সঙ্গমের পর নায়িকা সাহসিকা হইয়া পড়ে। তখন নায়িকা অতিরিক্ত রাগমোহিতা হইলে 'স্বয়ংদূতী' হইয়া প্রিয়ের সহিত মিলিতা হয়। রূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার লক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন এইরূপ—

অত্যোৎসুক্যাক্রুটদ্‌ব্রীড়া যা চ রাগাতিমোহিতা।
স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা॥

পদকর্তারা রাধাকে স্বয়ংদূতীরূপেও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে যাত্রা করাইয়াছেন। সখীরা প্রকাশ্যে সঙ্গে নাই, কিন্তু 'অনুভব লাগি গুপতহি সখী চলু।' গোপনে অনুসরণ করিয়াছে।

রাধার উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের নানা স্থলে অভিযাত্রাও স্বয়ংদৌত্য।

এই প্রকরণে গোবিন্দদাস, রাধামোহন ইত্যাদি আলঙ্কারিক কবিগণ রাধাকৃষ্ণের বৈদগ্ধ্যময় বাগ্‌বিনিময়ে আলঙ্কারিক চাতুর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

দিবাভাগে স্বয়ংদৌত্যের জন্য ছলনা সুসঙ্গত হওয়া চাই। একটি ছলনা দেবারাধনার ছলে বনের দিকে অভিগমন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্যের প্রধান কবি চণ্ডীদাস—সম্ভবতঃ দীন চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণ নাপিতিনী বেশে শ্রীমতীর চরণসেবা করিতে আসিলেন। নাপিতিনী একটি নবনী-কোমল ঝামা দিয়া—

ঘষিয়া ঘষিয়া তায় আলতা লাগায় পায়
নিরখি নিরখি অবিরাম।
রচয়ে বিচিত্র করি চরণ হৃদয়ে ধরি
তলে লেখে আপনার নাম॥

রাগরস-সঞ্চারের ইহা একটি অপূর্ব কৌশল। এ কৌশল খাঁটি বাঙালী কবির! বিদ্যাপতির এ কৌশল জানা ছিল না। ইহা এক প্রকারের সম্ভোগ—'সুরতাদতিরিচ্যতে।'

শ্রীকৃষ্ণ মালিনীর রূপ ধরিয়াও এইভাবে একদিন দিবাভাগে মিলিত হইলেন। গোকুলে ইন্দ্রপূজার উৎসবে মেলা বসিয়াছে, শ্যামনাগর ছদ্মবেশে ছোট ছোট পণ্যদ্রব্যের দোকান সাজাইয়া বসিয়াছেন। রাধা একজন গ্রাহিকা। সোনার সূচ কিনিয়া দাম না দিয়াই তিনি চলিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি দোকানীকে চিনিয়া ফেলিয়াছেন। কলহ না বাধাইলে অঙ্গস্পর্শ ঘটে না। তাই রাধা দাম না দিয়াই চলিতেছিলেন। তারপর যাহা স্বাভাবিক, সূচের সঙ্গে পদের ছন্দে রাধার যে অঙ্গের মিল হয়, তাহার উপরই অনুগ্রহ বা নিগ্রহ ঘটিল। এই লীলায় মোগল বাদশাহ্‌দের নওরোজ বাজারের কথা মনে পড়ে।

আর একটি কৌশল—শ্রীকৃষ্ণের দেয়াসিনী বেশে দিবামিলন। আর একদিন কৃষ্ণ বেন্যানী সাজিয়া রাধাকে কিছু গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করিলেন—তাহার দাম দাবি করিয়া—

বেন্যানী কহয়ে হিয়ার ভিতরে বড় ধন আছে সেহ।
করুণা করিয়া বাস উঘাড়িয়া সে ধন আমারে দেহ॥

তারপর একদিন শ্রীমান্ দেখা দিলেন নাগদমন বাদিয়ার বেশে।

বাদিয়া সাপ খেলানো দেখাইয়া পুরস্কার চায় শ্রীমতীর অঙ্গের নীলবাস। বৈদ্যবেশে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—

পীরিতির বিষে জারেছে ইহারে
পরাণ রহে না রয়।

সবচেয়ে রস জমিয়াছে রসরাজের বাজিকর বেশে স্বয়ংদৌত্যে। অন্যান্য দৌত্যে ললনাভিনয়ের ছলনা আছে; কিন্তু পুরুষোচিত কৃতিত্ব কিছু নাই। পুরুষোচিত কৃতিত্ব ও বিক্রমপ্রকাশের স্থান [illegible]

মুগ্ধ করা রসশাস্ত্রসঙ্গত ও কাব্যরীতিসম্মত। 'ময়মনসিংহ-গাথা'র একটি রচনায় এই কৌশলটি অনুসৃত হইয়াছে। বাজিকরই শ্রীকৃষ্ণের রূপক রূপ। তাঁহার মত কুহকী বা ঐন্দ্রজালিক আর কে আছে?

শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা, ঝুলনলীলা, দোললীলা, নৌকাবিলাস ইত্যাদি লীলা মধুর রসের লীলারই অঙ্গীভূত। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে দানলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

দানলীলা—মথুরার হাটে দধিদুগ্ধ বেচিবার ছল করিয়া বড়াই রাধাকে সঙ্গে লইয়া যে পথে শুল্কগ্রাহী দানিরূপে কিশোর কৃষ্ণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—সেই পথে লইয়া গেল। রাধা তখন দ্বাদশী কিশোরী। তাঁহার অন্তরে তখনও কন্দর্পের প্রভাব সঞ্চারিত হয় নাই। কাজেই কৃষ্ণের আক্রমণে রাধা কুপিত হইয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন, অনেক অনুনয়-বিনয়ও করিলেন—সতীধর্মরক্ষার পক্ষে অনেক যুক্তিও দেখাইলেন। কৃষ্ণও প্রত্যেকটির উত্তর দিলেন। শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগ করিলেন।

বৈষ্ণব পদাবলীতে দানলীলা এইভাবে সম্ভোগান্ত হইয়া উঠে নাই। নিত্যলীলার সঙ্গিনী রাধা কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগিণী নহেন—পদকর্তারা এই কল্পনা কখনও করিতে পারিতেন না। ইহাতে রসাভাস ঘটে। কাজেই রাধার অসম্মতিতে কোন লীলাই সম্ভোগান্ত হইতে পারে না। পদাবলীতেও বড়াইএর সহায়তার কথা আছে বটে, কিন্তু রাধাই বড়াইএর সাহায্য লইতেছেন, বড়াই রাধাকে ভুলাইয়া লইয়া গোবিন্দকে সমর্পণ করিতেছে না। রাধার দধিদুগ্ধ-বিক্রয় বা যজ্ঞস্থলে ঘৃতবহন একপ্রকারের অভিসার বা স্বয়ংদৌত্য। তবে দিবাভাগে রাজপথে সঙ্গলাভ আর কুঞ্জকুটীরে রহঃকেলি এক নয়। [illegible] নির্লজ্জ শ্যামের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান বা মাত্রাজ্ঞান নাই। তাই দানলীলায় হর্ষের সঙ্গে ভয়, ক্রোধ, অসূয়া ইত্যাদির একটা মিশ্র

ভাব রাধার দেহ মনে প্রকট হইতেছে। এই ভাবটির নাম কিলকিঞ্চিত ভাব। উজ্জ্বলনীলমণিতে এই ভাবের লক্ষণ এই—

গর্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥

রাধার এই কিলকিঞ্চিত ভাবটিকে উপভোগ করিবার ও উপভোগ্য করাইবার জন্য কবিরা দানলীলার পদ রচনা করিয়াছেন।

অপরুব প্রেমতরঙ্গ।
দানকেলি-রস- কলিত মহোৎসব
বরকিলকিঞ্চিত-রঙ্গ॥

কৃষ্ণকীর্তনে দুই পক্ষের গালাগালির মধ্য দিয়া প্রাকৃতজনভোগ্য একটা নিকৃষ্ট রসের সৃষ্টি করা হইয়াছে আর পদাবলীতে রঙ্গ-কলহের দ্বারা বিদগ্ধজনভোগ্য রসের বৃষ্টি করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার বাক্‌কৌশলে রাধার রূপের ব্যাখ্যান করিয়াছেন এবং তৎসহ লালসাও প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃষ্ণকীর্তনের গোঁয়ার গোবিন্দের মত ভয় প্রদর্শন করেন নাই। অন্তরে দক্ষিণা বাহিরে বামা রাধার জন্য তাহার প্রয়োজনও হয় নাই। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাসের মত প্রথম শ্রেণীর কবিরা সুযোগ ছাড়েন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের আলঙ্কারিক চাতুর্যের পদগুলি কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন। শ্রীরাধার অত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য নাই। তিনি আভীরবালার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন।—

পুন যদি হেন বোল মাথায় ঢালিব ঘোল।

রাধা নিজের রূপ-গর্বপ্রকাশ করিয়া শ্যামকে ধিক্কারও দিয়াছেন।

গায়ের মলা যদি তুলিয়া ফেলাই
সেহ হয় কাঁচা সোনা।
মুখের ঘাম যদি মুছিয়া ফেলাই
সেহ হয় চান্দের কোণা॥

স্বাদু গন্ধ নাই তোমার কথায়
মুচকি মুচকি হাস'।
ও মুখ দেখিয়া আপনা চাহিতে
ছিছি লাজ নাহি বাস'।

রাধার এসব গর্বের কথা। শুধু গর্ব নয়, ভয়, ক্রোধ, অসূয়া ইত্যাদি প্রকাশেব উক্তিও আছে। বড়াই ও সখীগণ সঙ্গে আছে। স্থান রাজপথ, কাল মধ্যাহ্নবেলা। রাধা তাঁহার নারীত্ব বিসর্জন দিয়া ভাবে গদ্‌গদ হইতে পারেন না, তাই রাধাকে দুই-চারিটা কটু কথাও বলিতে হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—রাধা, তুমি চিকুরে চামর কান্তি, দশনে মুক্তার দ্যুতি, অধরে প্রবালের ভাতি, লাবণ্যে কুঙ্কুমের বর্ণ চুরি করিয়াছ। তুমি চোর, কুঞ্জে মন্মথ মহারাজ বিরাজ করিতেছেন—চল সেখানে তোমার বিচার হইবে।

রাধা বিব্রতা হইয়া বলিতেছেন—

ঘরে বৈরী ননদিনী　　　পথে বৈরী মহাদানী
দেহের বৈরী হইল যৌবন।
হেন মনে উঠে তাপ　　　যমুনায় দিয়া ঝাঁপ
না রাখিব এ ছার জীবন।

সখীরাও হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—

কে তোমা বিষয় দিলে ফেল দেখি পাটা।
তুমিও নূতন দানী মোরা নই টুটা॥
থাকিবা খাইবা যদি যমুনার পানি।
গোপীগণে না রুখিও না হইও দানী॥

যাহাই হউক, শেষ পর্যন্ত বড়াই ও গোপীগণ একটু সরিয়া গেল।

মোহন বিজন বনে　　　দূরে গেল সখীগণে
একলা রহিল ধনী রাই।

প্রখর রৌদ্রে ঘটা করিয়া দুগ্ধদধির পশরা বহিয়া কেন বড়র ঝিয়ারী বড়র বউয়ারী দানসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানেন। তাই রাধার কষ্ট দেখিয়া কৃষ্ণের হৃদয় বিগলিত হইয়াছে।

বংশীবদনের বংশীধারী তাই বলিতেছেন—

রবির কিরণ পাইছে চাঁদমুখ ঘামিয়াছে
মুখর মঞ্জীর দুটি পায়।
হিয়ার উপরে রাখি জুড়াও আমার আঁখি
চন্দনে চর্চিত করি পায়॥

দীন চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ প্রেমে বিগলিত হইয়া বলিয়াছেন—

সোনার বরণখানি মলিন হয়্যাছে জানি
হেলিয়া পড়েছে যেন লতা।
অধর বান্ধুলি তোর নয়ন চাতক ওর
মলিন হইল তার পাতা॥
পরন বসন তায় ঘামে ভিজে একঠাঁয়
চরণে চলিতে নার' পথে।
উতাপিত রেণু তায় কত না পুড়ায় পায়
পশারা বহিলে তায় মাথে॥
রাখহ পশারাখানি নিকটে বৈঠহ রাণি
শীতল ছায়ায় দিই বা।
শিরীষ-কুসুম জিনি সুকোমল তনুখানি
মুখে না নিঃসরে এক রা॥

ইহাই কি রবীন্দ্রনাথের পশারিণী কবিতার প্রেরণা দান করিয়াছে?

এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি
কোমল করুণ ক্লান্ত কায়।
কোথা কোন রাজপুরে যাবে আরো কত দূরে
কিসের দুরূহ পিপাসায়?

সম্মুখে দেখত চাহি পথের যে সীমা নাহি
তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে।
পশারিণী কথা রাখ দূর পথে যেওনাক
ক্ষণেক দাঁড়াও অইখানে॥
মধ্যদিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে
দগ্ধ পথে উড়ে তপ্ত বালি।
দাঁড়াও যেও না আর নামাও পশারাভার
মোর হাতে দাও তব ডালি॥

নৌকাবিলাস—নৌকাবিলাসও কৃষ্ণকীর্তনের একটি প্রধান অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ এই লীলায় কাণ্ডারী সাজিয়াছেন। রাধার দেহ মনে কিলকিঞ্চিত ভাব ফুটাইবার জন্য এই লীলারও অবতারণা। ইহার প্রধান কবি জ্ঞানদাস ও বংশীবদন। দধিদুগ্ধের পশরা লইয়া রাধা কৃষ্ণবাহিত নৌকায় পার হইতেছেন।

মানসগঙ্গার জল ঘন করে টলমল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উদিল মেঘ সঘনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নাই কেউ॥
দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চড়িলুঁ কেন নায়॥

রাধা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাই বলিতেছেন—

অকাজে দিবস গেল নৌকা পার নাহি হৈল
পরাণ হৈল পরমাদ॥

একে ভাঙ্গা নৌকা, তাহাতে আনাড়ী কাণ্ডারী—আকাশে ঘনঘটা। যমুনা উতরোল। রাধার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে—

হাসি কয় গোবিন্দাই পার হবে ভয় নাই
অশ্বগজ কত করি পার।
দেবতা গন্ধর্ব যত পার হৈছে অবিরত
যুবতীর যৌবন কত ভার॥

কিন্তু ফুটা নায়ে জল উঠিতে লাগিল—'কর অবসর নাহি সিঁচইতে নীর।' কাণ্ডারী বলিলেন—"রাধে, ভার কমাও। নীরে ডারো ক্ষীর দধি সর। শুধু তাহাতেই হইবে না—দেহের সকল অলঙ্কার জলে ফেলিয়া দাও। শুধু তাহাই নয়, তোমার বসনের ভারও এ তরী সহিবে না।"

এই লীলা আমাদের চিত্তকে কিছুতেই যমুনার তীরে বা নীরে থাকিতে দেয় না। একেবারে বৈতরণীর তীরে ও নীরে লইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ যোগী ভোগী নাপিতানী বেন্যানী দোকানী দাসী—অনেক কিছুই সাজিয়াছেন—তাহাতে আমাদের চিত্ত লৌকিক জগতেই বিচরণ করিয়াছে। কিন্তু কাণ্ডারী সাজিয়াই তিনি আমাদের ভবনদীর কথা ভাবাইয়াছেন। তাই বলিতে চাই—

দিবালোক যায় চ'লে দিগন্তে পড়েছে ঢ'লে
ক্ষীণতাপ দিনান্ত-তপন,
মাথার উপরে দূরে বকপাঁতি যায় উড়ে
কেশে রেখে ধবল স্বপন।
ওপারের পানে চাহি' বসে আছি, তরী বাহি'
কাণ্ডারী করিছে পারাপার।
খেয়াঘাটে বসি' হেরি আমারো ত নেই দেরি,
চমকিয়া উঠি বার বার।
মানভার, লজ্জাভার, ঋণভার, সজ্জাভার,
মায়া-মোহ-শৃঙ্খলের বোঝা,

সাথে মোর হাতে ঘাড়ে, শির পৃষ্ঠ ন্যুব্জ ভারে,
পার হওয়া মোর নয় সোজা।
ভারমুক্ত নাহি হ'লে 'মোরে পার কর' ব'লে
কাণ্ডারীরে ডাকিব কি করি' ?
বাহি' দাঁড় যায় আসে, কোন ভার লয় না সে,
কোন ভার সয় না সে তরী।

সব চেয়ে গুরুভার লালসার বাসনার,
ভারী যেন বিশাল পাষাণ,
কেমনে এ ভার কাটে ভাবি ব'সে পারঘাটে,
স্মরি নৌকা-বিলাসের গান।

"মানস-গঙ্গার জল ঘন করে কলকল
দু'কূল বহিয়া যায় ঢেউ,
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ,
তরণী রাখিতে নেই কেউ।
দু'কূলে বহিছে বায় কাঁপিছে রাধার গায়,
ভাঙা তরী সহেনাক' ভর।"
কানু কয় "এই নদী পার হ'তে চাও যদি
নীরে ডারো ক্ষীর-দধি-সর।
বলয়-নূপুর হার আদি সব অলঙ্কার
এ সবের রেখ না মমতা,
অই সব ভার ধরি' টলমল মোর তরী,
লঘু কর তব তনুলতা।
শুধু এই ভার কেন ? তব বসনেরো জেন,
ভারটুকু এ তরী না সয়।
পার হবে ভরা নদী জয় কর ত্বরা যদি
সব মায়া, সব লজ্জাভয়।"

দোললীলা—বৃন্দাবনের সকল লীলার মধ্যেই বেদনার আঁচ আছে। কেবল দোললীলা ও ঝুলনলীলা অবিমিশ্র উল্লাসরসের অভিব্যক্তি। যশের বর্ণ যেমন ধবল, শোকের বর্ণ যেমন কৃষ্ণ, অনুরাগের বর্ণ তেমনি অরুণ। তাই অরুণ বর্ণের উপকরণে ও উপচারে অনুরাগের এই লীলা অপূর্ব রূপলাভ করিয়াছে।

উদ্ধব দাস বলিয়াছেন—

নিরখত বয়ন নয়ন-পিচকারিত
প্রেম গুবাব মন লাগ।
তুহুঁ অঙ্গ পরিমল চুয়া চন্দন ফাগ
রঙ্গ তঁহি নব অনুরাগ॥

হোলীলীলার পদগুলিতে অসাধারণ কবিত্ব কিছু নাই। যেটুকু আছে তাহা প্রাক্তন কবিদেরই অনুকৃতি। হোলী লীলার সময় বসন্তকাল। বসন্ত ঋতুর সুমোহন আবেষ্টনীর মধ্যে এই লীলা। এই লীলায় কন্দর্প অপেক্ষা তাহার সখা বসন্তেরই প্রেরণা অধিক। অশোকে, কিংশুকে, শাল্মলীতে, নব কিসলয়ে বসন্ত নিজেই ত হোলী খেলায় মাতিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন বনভূমি—এখানকার প্রধান সম্বল তরুলতা। এই বসন্তে তাহার তরুলতা নব কলেবর লাভ করিয়াছে। বৃন্দাবন যেন নির্মোক মোচন করিয়া নব বৃন্দাবনের রূপ ধরিয়াছে। তাই নব বৃন্দাবনে আনন্দময়ের এই আনন্দলীলায় কবিদের কলকণ্ঠ পিকপাপিয়ার কণ্ঠের মতই সঙ্গীতমুখর হইয়া উঠিয়াছে। এই লীলায় রসরাজের শেষ ঐশ্বর্যটুকুও রঙ্গের তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে। রাধার মান-অভিমানও রঙ্গের লীলায় ডুবিয়া গিয়াছে। তাই কবি বলিয়াছেন—

এ ধনি মানিনি মান নিবারো।
আবিরে অরুণ শ্যাম অঙ্গ মুকুর 'পর
নিজ প্রতিবিম্ব নেহারো॥

দোললীলার প্রধান কবি উদ্ধব দাসের একটি পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

আবিরে অরুণ নব বৃন্দাবন উড়িয়া গগন ছায়।
বঁধুয়া আমার হিয়ার মাঝারে কেহ না দেখিতে পায়॥
চপল নয়ন পিচকারি যেন নিরখে বয়ন মোর।
নব অনুরাগ ফাগুয়া ভরল তনু মন করি জোড়॥
শুধুই শ্যামল অঙ্গ পরিমল চন্দন চুয়ার ভাতি।
মোর নাসা জনু ভ্রমরী উমতি ততহিঁ পড়ল মাতি॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রাসলীলা—দোললীলার কাল বসন্ত; জলকেলি, দানলীলা ও নৌকাবিলাসের কাল গ্রীষ্ম; আর ঝুলনলীলার কাল বর্ষা। এইরূপ প্রকৃতির পটপরিবর্তনে নব নব পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি হইয়াছে—প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নব নব লীলা পরিকল্পিত হইয়াছে। ঝুলনলীলা অবিমিশ্র আনন্দলীলা। বর্ষার বায়ু-তরঙ্গান্দোলিত বিশ্বপ্রকৃতির স্পন্দনলীলাই বৃন্দাবনে ঝুলনলীলার রূপ ধরিয়াছে। ঝুলনলীলায় উল্লেখযোগ্য পদের অভাব।

শরৎকালের লীলা রাসলীলা। ভাগবতে রাসলীলার যে বর্ণনা আছে, পদাবলীতে তাহাই প্রধানতঃ অনুসৃত হইয়াছে।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়াসমাশ্রিতঃ॥

—শরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ।
ফুল মল্লী মালতী যূথী মত্ত মধুপ ভোরনী॥

শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করিতে লাগিলেন

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তোজবলোলকুণ্ডলাঃ॥

—হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যামমোহন মদনে মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান কুলবতী চিত চোরনী।
শুনত গোপীপ্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপন সৌঁপি
তাঁহি চলত যাহিঁ বোলত মুরলীক কল লোলনী॥

বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজগোপীগণ যেখানে যে অবস্থায় ছিল ছুটিয়া চলিয়া আসিল।

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিৎ দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাঽপরা যযুঃ॥
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্য শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ।
কেহ পতি সনে আছিল শয়নে ত্যজিল তাহার সঙ্গ,
কেহ বা আছিল সখীর সহিত কহিতে রভস রঙ্গ,
কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্তনে চুলাতে রাখি বেসালি।
ত্যজি আবর্তন হই আনমন ঐছনে গেল চলি॥
কেহ শিশু লৈয়া কোলেতে করিয়া দুগ্ধ করায়ে পান।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে শুনি মুরলীর তান॥
কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে তেমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া মুরলী শুনিয়া সব বিসরিত ভেল॥

দীন চণ্ডীদাসের এই চরণগুলি ভাগবতের ঠিক অনুবাদ নয়, অনুকার। ভাগবত ও পদাবলী—দুইতেই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে সংসারে গভীরভাবে আসক্তা এই ব্রজগোপীগণ—পতিপুত্রবতী। তাহারা যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায় তাহাদের বিষয়ান্তরে মন দেওয়া সম্ভবই নয়। এক শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনিই তাহাদের বিচলিত করিতে পারিল।

শুধু তাহাই নয়, বস্ত্রাভরণে বিপর্যয় পর্যন্ত তাহাদের চোখে পড়িল না। এক চোখে কাজল আঁকিয়া এক বাহুতে কঙ্কণ ও এক কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিয়া শিথিল নীবিবন্ধে স্খলিত বসনে সকলে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞান হারাইয়া ছুটিয়া আসিল।

শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্॥
রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥
হেরি ঐছন রজনি ঘোর ত্যজি তরুণী পতিক কোর।
কৈসে পাওলি কানন ওর থোর নহত কাহিনী॥

কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্
বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীম্।

ঐছন বচন কয়ল বরকান।
ব্রজরমণীগণ সজল নয়ান॥
টুটল সবহুঁ মনোরথ করণি।
অবনত আননে নখে লিখু ধরণি॥
আকুল অন্তর গদ্‌গদ কহই।
অকরুণ বচন-বিশিখ না সহই॥

ব্রজগোপীরা বলিল—

নৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং।
তোহে সঁপিত জিউ তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব॥

এই অনুনয়ে তুষ্ট হইয়া বৈজয়ন্তী মাল্য ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের সঙ্গে বিহার করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমে মদগর্বিতা হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের দণ্ডবিধানের জন্য অন্তর্হিত হইলেন। গোপীগণ 'হা কৃষ্ণ, কোথায় গেলে' বলিয়া রোদন করিতে করিতে বনে বনে কৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিল। বনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন সহ কোন এক গোপ-বধূর পদচিহ্ন দেখিতে

পাইয়া বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া একজন বধূর সহিত বিহার করিতেছেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, সেই ব্রজবধূ বনের মধ্যে একাকিনী কাঁদিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া সকলে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিতে লাগিলেন। ব্রজবধূর মুখে শুনিলেন—বিহারভূমি হইতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ অন্তর্হিত হ'ন। পথ চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন—

ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ।

কেবল তাহাই নয়—

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠাং সর্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥

ব্রজবধূর অভিমান জন্মিল—আমাকে সকলের শ্রেষ্ঠা মনে করিয়াই প্রিয়তম আমাকে লইয়া চলিয়া আসিয়াছেন। ব্রজবধূ যখন বলিলেন—আমাকে বহন করিয়া লইয়া যাও, শ্রীকৃষ্ণ 'স্কন্ধমারুহ্যতাম্' বলিয়া কাঁধ পাতিয়া দিলেন। ব্রজবধূ যেমন কাঁধে উঠিতে যাইবেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন।

এই কথা শুনিয়া সকলে সমবেতভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তবগান করিতে লাগিলেন। ইহা ১৯টি শ্লোকে সমাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে পরিতুষ্ট হইয়া গোপীগণকে দেখা দিলেন। তারপর রাসমণ্ডল রচনা করিয়া মধ্যে 'মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা' বিরাজ করিতে লাগিলেন।

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।

কৃষ্ণ দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। গোপীগণ প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই নিকটে আছেন। এইভাবে রাসমণ্ডল রচনা করিয়া নৃত্যগীতোৎসব হইতে লাগিল।

দুইদিকে দুই গোপী কণ্ঠ-আলিঙ্গনে।
নাচিছে বিনোদ কানু বিনোদ-বন্ধনে॥
অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবঃ,
মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ
সংজগৌবেণুনা দেবকীনন্দনঃ॥

ভাগবতে রাধার নাম নাই। চরণচিহ্ন-দর্শন-প্রসঙ্গে বধূ কথাটি আছে। সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বধূ অর্থে বৃষভানুনন্দিনী রাধা বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাসলীলাবর্ণনাকে পদকর্তারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবের অনুগত করিয়া লইয়াছেন। ভাগবতের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের যে ঐশ্বর্যভাবকে এবং গোপীগণের দাস্যভাবকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, পদকর্তারা তাহা বর্জন করিয়া চলিয়াছেন। পদাবলীতে ব্রজগোপী-গণের মধুর সখীত্ব ভাবেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছে। রাধার প্রতি গোপিকাগণের ঈর্ষ্যাভাব পদাবলীর পক্ষে রসসঙ্গত নয় সেজন্য পদাবলীতে সে ভাবের কথাই নাই। ভাগবতে বলা হইয়াছে—গোপিকাগণ ও যূথেশ্বরী ব্রজবধূর কৃষ্ণপ্রেমজনিত অহমিকার দণ্ডবিধানের জন্য কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। পদাবলীতে কৃষ্ণপ্রেমগৌরব রসবিরোধী, সেজন্য পদকর্তারা সে প্রসঙ্গ বর্জন করিয়াছেন। পথিশ্রান্ত হইয়া যূথেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণের বাসনা পদকর্তাদের মতে মধুর রসের পরিপোষক, কাজেই দূষণ নয়, উজ্জ্বল রসের পক্ষে ভূষণ।

'গৌতমীয় তন্ত্রে' বর্ণিত হইয়াছে, রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি বা সমুন্নতি হয় না। 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।' এই নিমিত্ত তিনি কুঞ্জে আত্মগোপন করিলেন, গোপীগণের দম্ভে দণ্ডবিধানের জন্য নয়—এই ভাবই পদাবলী-সাহিত্যের পক্ষে সুসঙ্গত।

রাস-পঞ্চাধ্যায়ের ১৯টি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মহিমাই উদ্‌গীত হইয়াছে—কাজেই পদকর্তারা এই চমৎকার শ্লোকগুলির অনুবাদ করেন নাই—অনুসরণে পদ রচনাও করেন নাই।

গৌতমীয় তন্ত্রে আর একটি কথা আছে। গোপিকাগণ যখন শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্তিতে দেখা দিলেন। গোপীরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের শ্রীকৃষ্ণ কোন্ দিকে গেলেন বলিতে পারেন, প্রভু? এমন সময় শ্রীমতী আসিয়া পড়িলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আর চাতুর্ভুর্জ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না।

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ
দৃ´ষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাঽপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা॥

—উজ্জ্বলনীলমণি

শিশুপালের মতই তাঁহার দুটি হাত লুপ্ত হইল—দ্বিভুজ মুরলীধারী হইয়া ধরা দিলেন। বিষয়টি গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বসম্মত; কিন্তু পদাবলীর কবিরা ভুলিয়াও দ্বিভুজ মুরলীধারীকে চতুর্ভুর্জ চক্রগদাধারী রূপে কল্পনা করিতেন না। কাজেই পদাবলীর কবিরা এ প্রসঙ্গ বর্জন করিয়াছেন।

আর একটি কথা—শ্রীধর স্বামী টীকায় বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ বহু মূর্তি ধরিয়া এক এক ব্রজাঙ্গনার সঙ্গে রাসমণ্ডলে যুগনদ্ধ হইলেন। ইহাও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য প্রকাশ। এইরূপ বহুত্বপ্রকাশ রসসঙ্গত নয় বলিয়া পদাবলীর কবিরা টীকাকার সনাতন গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মত অনুসরণ করিয়াছেন। এক শ্রীকৃষ্ণই রাসমণ্ডলে এমন অদ্ভুত নৃত্য করিলেন যে, প্রত্যেক গোপীই ভাবিল—শ্রীকৃষ্ণ আমার কাছেই আছেন।

রাসের একটি পদ এখানে উৎকলন করি। তাহাতে রাসোৎসবের উল্লাস-হিল্লোল কিরূপ বিলসিত হইয়াছে তাহা লক্ষণীয়।

বাজত ডম্ফা রবাব পাখোয়াজ
করতল তাল তরল একু মেলি।
চলত চিত্রগতি সকল কলাবতী
করে করে নয়নে নয়নে করু কেলি॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী।
জলদপুঞ্জে জনু তড়িৎ লতাবলী
অঙ্গভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি।
নটন হিলোল লোল মণিকুণ্ডল
শ্রমজল ঢলঢল বদনহুঁ চন্দ।
রস ভরে গলিত ললিত কুচ কঞ্চুক
নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ।
দুহুঁ দুহুঁ সরস পরশ রস লালসে
আলিঙ্গই রহু তনুতনু লাই।
গোবিন্দদাস পঁহু মূরতি মনোভব
কত যুবতী রতি আরতি বাঢ়াই।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বাল্যলীলা—(শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার উপজীব্য বাৎসল্যরস, আর গোষ্ঠলীলার উপজীব্য সখ্যরস। পদকর্তারা এই দুই রসের সহিত কোথাও ঐশ্বর্যভাব মিশ্রিত করেন নাই।)

এ উদ্ধবদাসে কহে ব্রজেশ্বরীর প্রেম।
কিছু না মিশায় যেন জাম্বূনদ হেম॥

(অবিমিশ্র জাম্বূনদ স্বর্ণের সহিত যশোদার বাৎসল্য উপমিত হইয়াছে।) যশোদার সমবয়সী ব্রজরমণীরাও যশোদার বাৎসল্য-সৌভাগ্য কিছু কিছু লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও—

হেরইতে পরশিতে লালন করইতে
স্তনখীরে ভিগল বসন।

সকল জননীই আপন আপন শিশুকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে,—তাহার শৈশবকালের তুচ্ছতম অঙ্গভঙ্গী, হাবভাব, ক্রীড়াকৌতুকেও আনন্দলাভ করে। এইরূপ বর্ণনায় বাৎসল্য ভাব সঞ্চারিত হয়, কিন্তু অলৌকিক আস্বাদ্যমানতা লাভ করে না। নিজ গর্ভজাত সন্তান না হইলে ঐ রসে কিছু বৈচিত্র্য ঘটে মাত্র। ব্রজের এই বাৎসল্য রসে অপূর্ব অলৌকিক আস্বাদ্যমানতা আরোপিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার সংগোপনে। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানি; কিন্তু যশোদা তাহা জানেন না—গোপালের আচরণে অসাধারণ কিছু দেখিলেও স্বীকার করেন না। আমাদের ভগবানকে যশোদা উদূখলে বাঁধিতেছেন—

নড়ি হাতে নন্দ রাণী যায় খেদাড়িয়া।
অখিল ভুবনপতি যায় পলাইয়া॥

যশোদা অমঙ্গল নিবারণের জন্য গোপালের কপালে গোময়ের ফোঁটা দেন, শিশুরা যেমন হাতে-খড়ির দিন জননীকে প্রণাম করিয়া

প্রথম পাঠশালায় যায়, 'ব্রহ্ম গোপালবেশ' তেমনি গোষ্ঠাষ্টমীর দিন হাতে পাচনবাড়ি লইয়া গোরু চরাইতে যায়—ইহাতে আমাদের অন্তরে লৌকিক বাৎসল্য রসই অলৌকিকত্ব লাভ করে।

যশোদার অন্তরে ঐশ্বর্যবোধলেশশূন্যতা দেখাইবার জন্য কোন কোন পদকর্তাকে গোপালের ঐশ্বর্য স্বীকার করিতে হইয়াছে। গোপাল মাটি খাইতেছেন শুনিয়া যশোদা ছুটিয়া আসিলেন। গোপাল 'কই আমিত মাটি খাই নি' বলিয়া মুখব্যাদান করিয়া দেখাইলেন। যশোদা কি দেখিলেন ?

এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন।
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ ॥

ব্রজেশ্বরীর বিশুদ্ধ বাৎসল্য ইহাতেও টলিল না।

স্বপ্নপ্রায় কি দেখিলুঁ হেন করে মনে।
নিজ প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণমাত্র জানে ॥
ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান ॥

ইহার বেশি কথা পদকর্তারা বলেন নাই। যশোদা অর্জুনের মত স্তব করেন নাই। শিশু কৃষ্ণ অনেক অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন, কিন্তু নন্দ-যশোদার বিশুদ্ধ বাৎসল্য অবিমিশ্রই থাকিয়া গিয়াছে।

গৃহ হইতে গোষ্ঠ বেশি দূরে নয় ; গোপালের সঙ্গে বহু রাখালই গোধন লইয়া গোঠে যায়—তবু গোপালকে গোঠে পাঠাইয়া যশোদার একমুহূর্ত স্বস্তি নাই। স্নেহাতুরা মায়ের প্রাণের এই অস্বস্তির কথা কতকগুলি পদে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যাদবেন্দ্রের মা-যশোদা বলিয়াছেন—

আমার শপতি লাগে　　　　না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু　　　　পুরিও মোহন বেণু
ঘরে বৈসে আমি যেন শুনি॥

গোঠ হইতে ফিরিয়া আসিলে যশোদা নেতের আঁচলে গোপালের মুখ মুছাইয়া চুমু খাইয়া বলেন—

কোন্ বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু।
আমি কেন চান্দমুখের শুনি নাই বেণু॥
ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বাঁধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুকায়েছে হিয়া॥
মলিন হয়্যাছে মুখ রবির কিরণে।
না জানি ফিরিলা কোন্ গহন কাননে॥
নব তৃণাঙ্কুর কত ভুঁকিল চরণে।
এক দিঠি হইয়া রাণী চাহে চরণ পানে॥

অমাতৃগর্ভজাত স্বয়ম্ভু ভগবান্ গোপাল সাজিয়া সুধা হইতে সুমধুর অনাবিল মাতৃস্নেহ উপভোগ করিয়া ধন্য হইতেছেন। এই অপূর্ব রস উপভোগ করিবার জন্যই তিনি জননী-জঠরে নরজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যে পরিতৃপ্তি কোন দিন কোন স্তবস্তুতিতে তিনি তাহা লাভ করেন নাই। এই মাতৃস্নেহ আবার সর্বসংস্কারমুক্ত। রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী নহেন—তাহার চেয়ে ঢের বেশি বল্লভা, যশোদা তেমনি তাঁহার গর্ভধারিণী মা নহেন—তাহার চেয়ে ঢের বেশি স্নেহাতুরা—মূর্তিমতী বৎসলতা।

যশোদার মাতৃস্নেহে যে রসের সঞ্চার হইয়াছে—নন্দের পিতৃস্নেহেও সেই রসেরই সঞ্চার হইয়াছে। নন্দ গো-দোহনের জন্য বাথানে যাইবেন,—আমাদের ভগবানকে তিনি জুতা বহিবার ভার দিলেন।

পায়ের বাধা খুলি দিল কৃষ্ণের হাতে।
ভকতবৎসল হরি বাধা নিল মাথে ॥

ভক্ত কবি যাদবেন্দ্রের সাহস কম নয়। একটি পদে তিনি বলিয়াছিলেন গোষ্ঠগমনের সময়

যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইহ বাধা পানই হাতে থুইহ
বুঝিয়া যোগাবে রাঙা পায়।

যে 'বাধা' তিনি বহিবার সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই বাধা তিনি—শ্রীকৃষ্ণের মাথায় চাপাইলেন। কথিত আছে, জয়দেব একদিন 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' কথাটি লিখিতে কতই না ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। তারপর—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর ভক্তগণের মনে সকল দ্বিধা সঙ্কোচ বিদূরিত হইযা গিয়াছে। ভক্ত কবিদের সাহস তিনি বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন।

বাল্যলীলা-প্রসঙ্গে উদ্ধবদাস ও ঘনরাম দাস একটি প্রসঙ্গের উপর ৩।৪টি পদ রচনা করিয়াছেন—সব কয়টি মিলিয়া একটি লিরিকের সৃষ্টি করিয়াছে। মথুরা হইতে এক পশারিণী ফল বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। গোপাল ফল কিনিতে গেলেন।

শুনি কৃষ্ণ কুতূহলী ধান্য লইয়া একাঞ্জলি
কর হইতে পড়িতে পড়িতে।
পশারী নিকটে আসি ফল দেহ বলে হাসি
ধান্য দিল ফলহারী হাতে ॥

এই চিত্রটি অপূর্ব। গোপালেব ছোট হাতে কয়টি ধানই বা ধরিয়াছিল—তাহাও ত পথেই পড়িয়া গেল—পশারিণী কয়টা ধান পাইল? গোপালকে দেখিয়া পশারিণীর মনে লোকোত্তর বাৎসল্যভাব জাগরিত হইল। সে—

ফল দিল কর ভরি প্রেমভরে গর গর চিতে।

ইহা বাৎসল্যের দান,—গোপালের ধান-ত পশারিণীর পশরা পর্যন্ত পৌঁছেই নাই।

বলরাম দাস বলিয়াছেন—

ধন্য সেই ফলহারী ফলে পাইল নন্দহরি।

এখানে ফল দানের অর্থ কি কর্মফল ত্যাগ? তাহার পরই আছে—

ডালা হইল রতনে পূরিত। ফলহারী সবিস্ময় চিত।

গাঙ্গিনী নদীর পাটনী সোনার সেঁউতিকে উপেক্ষা করিয়াও সন্তানের দুধেভাতের জন্য বর চাহিয়াছিল। পশরা রত্নপূর্ণ হইলেও পশারিণী খেদ করিতে লাগিল—তাহার আকিঞ্চনটা পাটনীর মত ঐহিক নয়,—রীতিমত আধ্যাত্মিক।

তাহার বাসনা হইল যে মাতা গোপালের চান্দমুখে স্তন্য দান করিয়াছে তাহার দাসী হইতে।

ও মোর সোনার চাঁদ কি তোর মায়ের নাম
কার ঘরে হৈল উতপতি।
বহুকাল তপ করি কে পূজিল হরগৌরী
কোন পুণ্য কৈল সেই সতী॥
তোরে কে করিয়া কোলে শত শত চুম্ব দিলে
নয়নের জলে গেল ভাসি।
পাইয়া মনের সুখে স্তন দিল চান্দ মুখে
মুঞি যাই হব তার দাসী॥

রবীন্দ্রনাথের 'কৃপণ' কবিতার আধ্যাত্মিক সার্থকতার সহিত ইহার মিল আছে।

একী কথা রাজাধিরাজ,—'আমায় দাওগো কিছু'।
শুনে ক্ষণকালের তরে রৈনু মাথা নীচু।
তোমার কিবা অভাব আছে?
ভিখারী ভিক্ষুকের কাছে
এ কেবল কৌতুকের বশে আমায় প্রবঞ্চনা।
ঝুলি হ'তে দিলেম তুলে একটি ছোট কণা।

পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করি, একি।
ভিক্ষা মাঝে একটি ছোট সোনার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজভিখারীরে
স্বর্ণ হ'য়ে এল ফিরে
তখন কাঁদি চোখের জলে ছুটি নয়ন ভ'রে,
তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য ক'রে।

ঐ পদগুলি মিলাইয়া রচিত একটি কবিতায় ঐ বাৎসল্য ভাবটিকে নবরূপ দান করা হইয়াছে।

যশোদার আঙিনায়

নাচিছে গোপাল করতালি তাল দেয় গোপীগণ তায়,
বেড়ি ক্ষীণ কটি পরা পীতধটী বাজে তায় কিঙ্কিণী
গলে বনমালা চরণে নূপুর তুলে ধ্বনি রিনিঝিনি
যশোদা জননী হাত ভরি ননী দেয় গোপালের করে,
চুরি করে খেতে ভালবাসে তা যে ফেলে তাই হেলাভরে,
ফল নেবে ওগো ভাল ফল—পথে পশারিনী হেঁকে চলে,
নাচন থামায়ে ধরিল জড়ায়ে গোপাল মায়ের গলে।
ফল খাব বলি বায়না ধরিল, খাব না মা ক্ষীর ননী,
বলিল মা—যাও ফল কিনে খাও ধান দিয়ে নীলমণি।
ছুটি কচি হাতে রচি অঞ্জলি ধান দিয়ে ভরি তায়
বাড়ীর ছুয়ারে ছুটিয়া গোপাল ফল কিনিবারে যায়।
সব ধানগুলি মাটিতে পড়িল হাত হতে গলি গলি,
পসারিনী হাতে ছুটি ধান দিল ফল দাও মোরে বলি।
ধান ছুটি হাতে হাসিয়া-কাঁদিয়া পসারিনী চেয়ে রয়,
সেই মুখ থেকে নয়ন ফেরে না গদ্‌গদ ভাষে কয়।
কার বাছা তুমি আহা মরিমরি তুলনা তোমার নাই,
মথুরা নগরে ঘুরি ঘরে ঘরে হেন শিশু দেখি নাই।

যে তোমারে বাছা গর্ভে ধরেছে ধন্য সে মহাসতী
তোমারে স্তন্য কে করিল দান কোন সে পুণ্যবতী ?
ফল যতগুলি খুসী লও তুলি লও বাছা বেছে বেছে,
গোপাল দুহাতে দুটি ফল নিয়ে ফিরে গেল নেচে নেচে।
দুটি ধান নিয়ে দুটি ফল দিয়ে পসারিনী গেল ফিরে।
ভাল করে চোখে দেখে না সে পথ ভাসে সে নয়ন নীরে।
গৃহে ফিরে গিয়ে দেখে বিস্ময়ে ডালার ঢাকনা খুলে,
দুটি ফল তার হয়েছে রতন সুবর্ণ বাকি গুলি।
ডালা করি কোলে কাঁদে আর বলে ওরে মোর বাছাধন,
সোনা মণি দিয়ে ভুলাবে আমারে ? মিছে এই প্রলোভন।
দুই ধানে হায় কিনেছ আমায় ধনে মোহ আর নাই।
এই সোনামণি যমুনায় ডারি তোমা সোনামণি চাই।
কিবা হবে তার বেচাকেনা আর ফল তোমা সঁপিয়াছে,
চলিনু এখনি তব দাসী হতে তোমার মায়ের কাছে।
তোমার রাতুল চরণ মুছাব আমার মাথার চুলে,
তোমারে এবার ভূষিব তুষিব ফলে নয়, ফুলে ফুলে।
ক্ষুধা পেলে তোমা নবনী খাওয়াব কাজলে ভূষিব আঁখি,
ভুবন ভুলিব জীবন জুড়াব এ বুকে তোমারে রাখি।
ঘুম পেলে তুমি ঘুমায়ে পড়িবে আমারি অঙ্কে এসে,
আঁচলের বায় বীজাব তোমায় চূড়া বেঁধে দেব কেশে।

গোষ্ঠলীলা—গোষ্ঠলীলার সঙ্গে একদিকে নন্দ-যশোদার বাৎসল্যের, অন্যদিকে রাখাল-বালকদের সখ্যের সম্পর্ক। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানি বলিয়াই তাঁহার রাখালিয়া লীলায় আনন্দ পাই—আর রাখাল-বালকরা তাহা কখনও ভাবে না বলিয়াই আমরা ঐ লীলায় রস পাই। নির্মল সখ্যরসে ব্রজরাজ-তনয় বলিয়াও রাখালদের কানাই সম্বন্ধে কোন সঙ্কোচ নাই—খাইতে খাইতে মিঠা লাগিলে সখারা এঁটো ফল কানুর মুখে তুলিয়া দেয়।

কানাই খেলায় হারিয়া গেলে খেলার পণের সর্ত অনুসারে নিঃসঙ্কোচে তাহারা তাহার কাঁধে চড়ে। কানাইও এই নিঃসঙ্কোচ সখ্যরস উপভোগ করে, তাই—

কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তবু।

সখারা শ্যামগতপ্রাণ। ক্ষণেক অদর্শনে তাহাদের মনোভাব কি হয়, তাহা এই পদে বর্ণিত হইয়াছে।

হিয়ায় কণ্টক দাগ বয়ানে বন্দন রাগ
মলিন হৈয়াছে মুখশশী।
আমা সভা তেয়াগিয়া কোন বনে ছিলে গিয়া
তুমি বিনে সব শূন্য বাসি॥
নব ঘনশ্যাম তনু ঝামর হয়্যাছে জনু
পাষাণ বাজ্যাছে রাঙা পায়।
বনে আসিবার কালে হাতে হাতে সোঁপি দিলে
ঘরে গেলে কি বলিব মায়॥
খেলাব বলিয়া বনে আইলাম তুহার সনে
বসিয়া থাকিব তরুছায়।
বনে বনে উকটিয়া তোর লাগি না পাইয়া
আমা সভার প্রাণ ফাটি যায়॥

সখাদের মধ্যে সুবলই সখ্যলীলা ও মধুর লীলার মধ্যে যোগসূত্র। রাধা-সম্পর্কীয় কথা কানাই একমাত্র সুবলের সঙ্গেই কহিতেন। সুবল 'সকল রহস্য জানে সখীর সমান'—সে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্মসখা। নিম্নলিখিত চমৎকার পদটি সুবলের উক্তি—

তুঙ্গ মণি মন্দিরে ঘন বিজুরি সঞ্চরে
মেঘরুচি বসন পরিধানা।
যত যুবতি মণ্ডলী পন্থ ইহ দেখলি
কোই নহ রাইক সমানা॥

অতএ বিহি তোহারি সুখ লাগি।
রূপে গুণে সায়রী স্থজিল ইহ নায়রী
ধনিরে ধনি ধন্য তুয়া ভাগি॥
দিবস অরু যামিনী সতত অনুরাগিণী
তোহারি হৃদি মাঝে রহু জাগি।
নিমিষে নব নৌতুনা রাই মৃগলোচনা
অতয়ে তুহুঁ উহারি অনুরাগী॥
রতন অট্টালিকা উপরে বসি রাধিকা
হেরি হরি অচল পদপাণি।
রসিক জন মানসে হরিগুণ সুধারসে
জাগি রহু শশিশেখর বাণী॥

গোবিন্দদাস গোষ্ঠবিহারীর রূপবর্ণনাচ্ছলে বলিয়াছেন—

ঈষৎ হসিত বয়ন চন্দ
তরুনি নয়ন ময়ন কন্দ
বিম্বু অধরে মুবলী খুরলী ত্রিভুবন মনোমোহনি।
কটি পীত তট কিঙ্কিনি বাজ
মন্দগতি জিতি কুঞ্জররাজ
জানু লম্বিত কদম্বমাল মত্ত মধুপ ভোরনি।

গোষ্ঠলীলার সহিত কেবল সখ্য, বাৎসল্য নয়, মধুর রসেরও সম্পর্ক আছে। গোষ্ঠের এই রাখালবেশ রাধাকে মুগ্ধ করিয়াছে, যদুমণি মুরলী বাদন করিতে করিতে গোঠে চলিয়াছেন কাজেই রাধার ঘরে থাকা দায় হইল।

দেখিয়া গোকুল ইন্দু উছলিল প্রেমসিন্ধু
অবশ হইল প্রেমভরে।
অনিমিখে চাইয়া রয় লাজে কিছু নাহি কয়
কাঁপে ধনী মদনের জ্বরে॥

তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল
তাতল বালুক দহন সমান।
চড়ল মনোরথে ভাবিনী চলিল পথে
তাপ তপন নাহি জান॥

এই ভাবে রাধা গোঠের দিকে মধ্যাহ্ন অভিসারে চলিলেন।

মধ্যাহ্নকালে গোষ্ঠে কানুর তপনতাপক্লান্ত মুখখানি স্মরণ করিয়া বংশীবদনের রাধা বলিয়াছেন—

বংশীবটের তল ছায়া অতি সুশীতল
যাইতে না লয় তাতে মন।
রবির কিরণে চান্দ মুখানি ঘামিয়াছিল
ভোখে আঁখি অরুণ বরণ॥
পীতধড়ার অঞ্চল ঘামে তিতিয়াছিল
ধূলায় ধূসর শ্যাম কায়া।
মোর মনে হেন লয় যদি নহে লোকভয়
আঁচর ঝাঁপিয়া করি ছায়া॥

কানু গোষ্ঠে চলিয়াছেন—প্রখর রৌদ্র উঠিয়াছে—দীন চণ্ডীদাসের রাধা বলিতেছেন—

আঁখির পুতলি তারকার মণি যেমন খসিয়া পড়ে।
শিরীষ কুসুম জিনিয়া কোমল পাছে বা গলিয়া ঝরে॥
ননীর অধিক শরীর পেলব বিষম ভানুর তাপে।
যেন বা অঙ্গ গলি পানি হয় ভয়ে সদা তনু কাঁপে॥
বিপিনে বেকত ফণী শত শত কুশের অঙ্কুশ তায়।
সে রাঙা চরণ ভেদিয়া ছেদিবে মোর মনে হেন ভায়॥
কেমনে যশোদা নন্দ পিতা সে হেন সম্পদ ছাড়ি।
কেমনে হৃদয় ধরিয়া আছয় হায় রে বুঝিতে নারি॥
ছারে খারে যাক্ অমন সম্পদ অনলে পুড়িয়া যাক্।
এ হেন ছাওয়ালে ধেনু নিয়োজিলে পায় কত সুখ পাক॥

মধুর রসের নিম্নস্তরও যে বাৎসল্য রসের স্তর হইতে উচ্চতর এই পদে তাহা দেখানো হইয়াছে। কবি কর্ণপূর যাহাকে 'অসংপ্রয়োগ-বিষয়া রতি' বলিয়াছেন—ইহা সেই রতির দৃষ্টান্ত। রাধার মুখে এই রতিভাবের মধ্যে বাৎসল্যের সুর ধ্বনিত হইতেছে—সে সুর সম্ভোগমুখী নয়—সেজন্য ইহা অসংপ্রয়োগবিষয়া।

বিংশ পরিচ্ছেদ

রঙ্গলীলা—বৈষ্ণবকবিগণ প্রেমার্তির কবি। তাই বলিয়া তাঁহারা যে রঙ্গরসিক ছিলেন না, তাহা নয়। তবে আজকাল আমরা যে হাস্য-রসিকতাকে রঙ্গলীলা বলি, সে রঙ্গলীলা তাঁহাদের এবং সে কালের কোন কবির ছিল না। বৈষ্ণব কবিতায় আমরা যে রঙ্গলীলা পাই তাহা হাস্যরসিকতার অঙ্গ নয়—তাহা রাগরসেরই অঙ্গ। রাগরসের যতপ্রকার অভিব্যক্তি আছে রসিক কবিরা তাহার কোন অঙ্গ বাদ দেন নাই। নায়কের সহিত নায়িকার বা তাহার দূতীর যে রসকলহ, কথা-কাটাকাটি, বাদপ্রতিবাদ, ব্যঙ্গ-রসিকতা তাহা গভীর অনুরাগেরই অঙ্গীভূত। সেকালের সাহিত্যে এই প্রকারের রঙ্গলীলা প্রচলিত ছিল। এই শ্রেণীর রসকলহকে প্রাকৃত সাহিত্যে 'ধামালী' বলে।

সুবল বাজিকর সাজিয়া বৃষভানুপুরে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখাইয়া যেভাবে রাধিকাকে মোহিত করিলেন তাহা রঙ্গলীলারই অন্তর্গত।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ নাপিতানী, বেদিয়া, দোকানী, দেয়াসিনী ইত্যাদির বেশ ধরিয়া স্বয়ংদৌত্য করিলেন—এগুলিতে রঙ্গলীলার পরাকাষ্ঠা দেখানো হইয়াছে।

দানখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ কপট দানী সাজিয়া গোপীদের পথ আগলাইয়াছেন—শুল্ক না দিলে এই কপট দানী কিছুতেই কোন গোপীকে হাটে দুধ দই বেচিতে যাইতে দিবে না। এ শুল্ক যে কি তাহা রসিকজনের অনুমেয়। পথে তুমুল কথা-কাটাকাটি সুরু হইল, এখানে রঙ্গলীলা বেশ জমিয়াছে।

রাধা— শুনহ নাগরকানু
কে তোমা এ মাঠে করিয়াছে দানী ধরিয়া মোহন বেণু।
কানু— কানু বলে আগে যাহাই করিবে আগে তাহা তুমি কর,
কংসের যোগানী বলিয়া তোমার দেখি অহঙ্কার বড়।

রাধা— রাই বলে ভাল জানিয়ে তোমারে রাখাল হইয়া এত।
গোরু না রাখিতে হাতে বাড়ি ধরি তবে সে হইত কত ॥
কানু বলে রাখি গোপের গোধন এই মোর ব্যবহার।
নহে তা দূষণ চন্দন ভূষণ যাহার জীবিকা তার ॥
রাধা— বনফুলে তুমি চূড়াটি বেঁধেছ এই যে নাগরপনা।
যত বড় তুমি ঠাকুর বটহ এবে সে গেলই জানা ॥
লাখ বাণ সোনা মোর নিজ দেহ কালিয়া হইয়া যাব।
দূরেতে থাকহ কাছে না আসিহ শিরে দধি ঢালি দিব ॥
কানু— নয়নে পরিলে কাজল কালিয়া মুছিয়া ফেলাও তায়।
হিয়ার কাঁচলি কালিয়া বরণ কেন বা ধরেছ গায় ॥
ভাঙ ভুরু দুটি উপরে ধরিলে অঙ্গের বসন কালো।
নিরবধি কালো যমুনার নীর, কালো দিয়ে আলো জ্বালো ॥
লোটন বন্ধনে কুণ্ডলী করি কেন বা পরেছ রাধে।
কাল জাদ কালো তাহা কেন ধনি পরিয়াছ নিজ সাধে ॥
রাধা— গোপের গোধন রাখহ গোষ্ঠে বুলহ রাখাল দলে।
একদিন মায়ে দড়ি দিয়ে পায়ে বেঁধেছিল উদূখলে ॥
কানু— শুন ধনী রাধা রূপের গরব কোরো না আমার কাছে।
গুণ নাহি যার কিবা তেজ তার রূপ কেহ তার বাছে ॥
তাল ফল যেন দেখিতে সুন্দর খাইতে লাগয়ে তিতা।
কটার বরণ নহে সুশোভন কি কহ রূপের কথা ॥

বড়ু চণ্ডীদাস এই প্রসঙ্গে রীতিমত তর্জার লড়াই চালাইয়াছেন। সেকালে সুরুচিসঙ্গত না হইলেও এইরূপ রসকলহ লোকের ভালোই লাগিত। পদাবলী-সাহিত্যে এই দানলীলা ঢের বেশি মার্জিত রূপ ধরিয়াছে।

নৌকাখণ্ডের রঙ্গলীলাও বেশ উপভোগ্য। মথুরার হাটে দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিতে সখীদের সঙ্গে রাধা চলিয়াছেন যমুনা পার হইয়া। কানু কাণ্ডারী হইয়া তাহাদের পার করিয়া দিতেছেন।

মাঝ যমুনায় গিয়া রাধা ও সখীরা দেখিল কানু অন্য দিকে নৌকা বাহিয়া লইয়া যাইতেছে। কানু নৌকা বাহিতে জানে না। ভাঙা নৌকায় জল উঠিতেছে—নৌকা ডুবুডুবু—রাই কানুকে তিরস্কার করিতে লাগিল। আনাড়ী কাণ্ডারী কানু উত্তর দিতেছে—

তখনি বলেছি ভাঙা নায়ে দিই পাড়ি।
তোরা গোয়ালিনী ছানা দুধ খেয়ে অঙ্গ হয়েছে ভারী ॥

কানু বলিতে চায়—আমার নৌকা এত ভারী যৌবন পার করিতে পারিবে না, অতএব—

এ নব যৌবন কর অরপণ তবে লাগাইব ধার।

বলা বাহুল্য, বহু রসকলহের ও রঙ্গরসিকতার পর কানুর ইহাই শেষ কথা।

দানখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বাগে পাইয়া লাঞ্ছিত করিয়া আনন্দ পাইয়াছেন, কিন্তু ভারখণ্ডে তাহার বিপরীত। এখানে শ্রীকৃষ্ণের কথার জোর নাই—শ্রীকৃষ্ণই অপরাধী।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে সম্ভোগচিহ্ন-লাঞ্ছিত হইয়া কৃষ্ণ প্রভাতে রাধার কুঞ্জে দেখা দিলেন। রাধা মানে বসিবার আগে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে অনেক বাক্যবাণ হানিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইন্দীবর-নয়ন কোকনদ হইল কেন? তাহার কপালে সিন্দূরের দাগ, কপোলে কাজলের দাগ, অঙ্গে কঙ্কণের দাগ কেন? এমন কি, পরিধানে পীত বাসের স্থলে নীল বসন কেন?

শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা ছলনার দ্বারা নানাপ্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন—ইহাতে রঙ্গলীলা বেশ জমিয়াছে।

এই লীলাটিকে বিদগ্ধজনের উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন কবি গোবিন্দদাস—তাঁহার দুইটি পদে। একটি পদে শ্রীমতী বলিতেছেন —তোমার রূপ দেখিয়া তোমাকে তো শঙ্কর বলিয়া মনে হইতেছে। —আমার মনের মনসিজকে তুমি দগ্ধ করিলে—

মাধব, অব তুয়া শঙ্কর দেবা।
জাগর পুণ ফলে প্রাতরে ভেটিলুঁ
দূরহি দূর রহু সেবা॥

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি শঙ্কর, কিন্তু এদিকে তুমিও যে চণ্ডী হইয়া গিয়াছ।

সুন্দরি, অব তুহুঁ চণ্ডি বিভঙ্গ।
যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর
মোহে দেয়বি আধ অঙ্গ॥

তুমি ঈষৎ হাস্য করিলেই দগ্ধ মনোভব আবার পুনর্জীবিত হইবে।

(পুরা পদ দুইটি অন্যত্র উদ্ধৃত হইয়াছে)।

খণ্ডিতা প্রকরণে গোবিন্দদাস যে রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা বিদগ্ধজনোপভোগ্য। চণ্ডীদাস ও তাঁহার অনুবর্তী পদকর্তারা যে রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সর্বজনের উপভোগ্য। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে প্রভাতে শ্যাম সর্বাঙ্গে সম্ভোগচিহ্নে লাঞ্ছিত হইয়া চোরের মতো শ্রীমতীর কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়াইলেন—রাধা তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া বলিলেন—

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কেশ জাল হেন সাজে দেখে বাসি দুখ॥
কপালে কঙ্কণ দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঙারী॥
কেমন পাষাণী হায় দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখালে তারে এ হেন পীরিতি॥
ছলছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বসো আঁচলেতে মুখানি মুছাই॥

শ্রীকৃষ্ণ অপবাদ অস্বীকার করিয়া বলিতেছেন—

মিছা কথায় কত পাপ জানত আপনি।

রাধার উত্তর—

কেন দাঁড়াইয়া পাপিনীর কাছে পাপেতে ডুবো বা পাছে।
যাও চলি যথা ধর্মের থলী আছে॥
ভালো ভালো ভালো কালিয়া নাগর শুনালে ধরম কথা।
পরের রমণী মজালে যখন ধরম আছিল কোথা॥
চলিবার তরে দাও উপদেশ পাথর চাপায়ে পিঠে।
বুকেতে মারিয়া চাকুর ঘা দাও তাহাতে নুনের ছিটে॥
আর না দেখিব ঐ কালামুখ এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যথা মনের মানুষ যেখানে ও মন টানে॥

ললিতা সখীও সময় পাইয়া দুকথা শুনাইয়া দিলেন।

উচিত কহিতে কাহার ডর। কিবা সে আপন কিবা সে পর॥
শিশুকাল হতে স্বভাব চুরি। সে কি রয় কভু ধৈর্য ধরি॥
সোনা লোহা তামা পিতল কি বাছে।
চোরের কি কোন বিচার আছে॥

চণ্ডীদাসের রাধা বড় দুঃখেই রঙ্গরসিকতা করিয়াছেন—

ভালো হৈল আরে বঁধু আইলে সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥
বন্ধু তোমার বলিহারি যাই
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ মুখ চাই॥
আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দূর বিন্দু মুনি মনোলোভা॥
নীল পাটের শাড়ী কোঁচার বলনী
রমণীরমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কোন কাজে।

* * *

সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি।

দূরে রহ দূরে রহ প্রণাম হামারি ॥
চণ্ডীদাস বলে ইহা বলিলে কেমনে।
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে ॥

শ্রীকৃষ্ণের আত্মসমর্থনে জোর নাই। তিনি বংশী স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন—'তোমা বিনা দিবানিশি কিছু না জানিয়ে।' এরূপ ক্ষেত্রে রাধার মান অনিবার্য। শ্রীকৃষ্ণ বলেন অনিদান মান,—কিন্তু মান যে সনিদান তাহাতে সন্দেহ আছে। এই মান ভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে সকল প্রয়াস করিয়াছেন—তাহাতে রঙ্গরসেরই সৃষ্টি হইয়াছে—সখীদের কোন সহানুভূতি পান নাই। শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিধ চতুর চেষ্টাই সখীগণকে হাসাইয়াছে।

মানের প্রসঙ্গে চম্পতির দুইটি পদে জোরালো যুক্তি আছে। সখীরা যুক্তি দিয়া বলিতেছেন, শ্যামের গুণের অন্ত নাই—একটা দোষের জন্য রাই, তাহার প্রতি বিমুখ হইও না।

সুন্দরি, সমুঝল তুয়া প্রতিভাতি।
গুণগণ ত্যজি দোষ এক ঘোষসি
অন্তর আহীরিণী জাতি ॥

শ্রীমতীও অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রমাণ করিতেছেন—

ঐছন বহু গুণ এক দোষ নাশই।

এই সমস্ত রঙ্গলীলা সম্ভোগ-প্রকরণের লীলা-বিলাসের অন্তর্গত। সকল লীলা-বিলাসই সংপ্রয়োগান্ত হইলেও সংপ্রয়োগ অপেক্ষা লীলা-বিলাসের নিজস্ব আস্বাদ্যমানতাই অধিক।

'বিদগ্ধের বিলাসাদ্যে যত সুখ হয়।
সংপ্রয়োগে তাহা নয়, কবিগণ কয় ॥' (উজ্জ্বলচন্দ্রিকা)

কবিগণ তাই রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিলাস অবলম্বনেই বহু পদ রচনা করিয়াছেন। লীলা-বিলাস অনেকগুলি। সবগুলির পদ আমরা সংগ্রহ পুস্তকে পাই না। কতকগুলি দৃষ্টান্ত রূপ গোস্বামীর নাটকে পাওয়া যায়। উজ্জ্বল-নীলমণিতে রূপ গোস্বামী লীলা-বিলাসের

নিম্নলিখিত নির্ঘণ্ট দিয়াছেন—দানলীলা, নৌকাবিলাস ইত্যাদি তাহাদের অন্যতম ও গণ্যতম।—১। দর্শন, ২। জল্প, ৩। স্পর্শ ৪। বর্ত্মরোধ,—ইহা দানলীলারই অঙ্গ; ৫। রাসনৃত্য, ৬। বন-বিহার ও ক্রীড়াকেলি, ৭। জলকেলি, ৮। নৌকাবিলাস, ৯। লীলা চৌর্য—শ্রীরাধার বংশী চুরি, পুষ্পহরণ, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, ১০। ঘটলীলা—ইহাও দানলীলার অন্তর্গত, ১১। কুঞ্জে লুকোচুরি, ১২। মধুপান, ১৩। শ্রীকৃষ্ণের বধূবেশ ধারণ, ১৪। কপট নিদ্রা, ১৫। পাশা খেলা, ১৬। বস্ত্রাকর্ষণ, ১৭। চুম্বনালিঙ্গনাদি।

সখীগণ এই লীলা-বিলাস আস্বাদনে অপার আনন্দ পায়। তাই তাহারা নিত্য নব লীলারঙ্গ সংঘটন করায়। এই সকল লীলা-বিলাসের মধ্য দিয়া বৈষ্ণব কবিরা প্রচুর রঙ্গরস পরিবেশন করিয়াছেন।*

সখীগণ কি ভাবে লীলারঙ্গ উপভোগ করে তাহা উজ্জ্বলচন্দ্রিকার এই অংশ হইতে বুঝা যাইবে :—

সখীগণের উক্তি—

হরি আলিঙ্গয়ে তাথে রাই করে নখাঘাতে
কৃষ্ণ যেই করয়ে চুম্বন ॥
বসন ফেলাঞে মারে হরি পুন বস্ত্র ধরে
কপটে করয়ে কোপাভাস।
সঙ্গমের শতগুণ ভাবে আনন্দিত মন
রাধা সঙ্গে সদাই বিলাস ॥

সুবলমিলনের কথা অনেক কবিই লিখিয়াছেন। দিনের বেলায় কৃষ্ণ সহসা রাধার জন্য ব্যাকুল হইলেন। বাধ্য হইয়া সুবলকে রাধার বাড়ীতে আসিতে হইল, রাধা তখন রন্ধন করিতেছেন। এ কাজটি তাঁহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের সময় হইতেই করিতে হইত, বনে বাঁশী

* শ্রীরূপের নাটকে মধুমঙ্গল রঙ্গরস যোগাইয়াছেন। জটিলা ও অভিমন্যুকে লইয়া রসিকতার সৃষ্টি হইয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য মহাশয়ও কৌতুক রসসৃষ্টি করিতে পারিতেন—এ সংবাদ অনেকেই হয়ত রাখেন না।

বাজিতে থাকিলে সে রাঁধন যে কি প্রকার হইত বড়ু চণ্ডীদাস তাহার বর্ণনা দিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে।

ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে ক্ষেপিলুঁ
বিনিজলে চড়াইলোঁ চাউল।

রাঁধন যাহাই হউক ধোঁয়াব ছলনা কবিয়া কাঁদনের জন্যও রান্নাঘরে যাইতে হইত শ্রীমতীকে।

মধ্যদিনে যখন সকল পাখী গান বন্ধ করিত, তখন রাখালরাজ একাকী বেণু বাজাইতেন—কিন্তু কতক্ষণ একা বসিয়া রা-ধা রা-ধা বাজানো যায়? কাজেই সুবলকে রাধার রান্নাঘরের দরজাতেই ধর্না দিতে হইল। সুবল তাঁহার নর্মসহচর—সে ছাড়া এই দুঃসাধ্য কাজ কে করিবে? নিশ্চয়ই তাহার চেহাবাটাও ছিল মেয়েলি ধাঁচের—আর গোঁপদাড়ি তখনও নিশ্চয়ই বাহির হয় নাই (বৃন্দাবনের পুরুষদের দাড়ি বোধহয় আদৌ গজাইত না)। সুবলের মাথায় একটা ফন্দী আসিল—সে রাধাকে বলিল—তোমার বেশ পরিয়া আমি যাহা যাহা রাঁধিতে বাকি আছে তাহা তাহা বাঁধিব। এবং তোমার দেরি হইলে পরিবেশনও করিব। আর আমাব ধড়াচূড়া তোমাকে দিই, তুমি তাহা পরিয়া শ্যামের সঙ্গে একবাব দেখা করিয়া এসো রাধাকুণ্ডের ধারে।

তোমার বেশ আমায় দাও আমি বহি ঘবে।
আমার বেশে যাও তুমি কানু ভেটিবারে॥

বলা বাহুল্য, সুবল গামছা পরিয়া (?) নিজের বেশভূষা খুলিয়া দিল—শ্রীমতী নেপথ্য গৃহে গিয়া সুবল সাজিয়া আসিলেন—সুবলও শ্রীমতী সাজিল। কিন্তু একটা মুশকিল হইল—

উচ্চতায় পয়োধর ঢাকা নাহি যায়।

শ্যামের বুদ্ধির ভাণ্ডারী সুবলই বুদ্ধি দিল—'গোয়ালঘর হইয়া যাও'।

কোলেতে করিয়া লহ নবীন বাছুরি।

এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ যে, সুবলের বেশে শ্যাম রাধাকে চিনিতে

পারিল না। তাই সুবলকে একা আসিতে দেখিয়া কাতর হইয়া পড়িল। দীনবন্ধু, জগন্নাথ দাস, যদুনাথ দাস ইত্যাদি পদকর্তারা সুবল-মিলনের কবি।

এই যে সুবল-মিলনের সৃষ্টিছাড়া চিত্র—রঙ্গরস সৃষ্টি ছাড়া ইহার কি সার্থকতা থাকিতে পারে?

লোচনদাসের ধামালী ঢঙের ভাষাতেই আছে রঙ্গরসের ঢঙ্গ। তাঁহার কোমরনাচানো মেয়েলি ধাঁচের ছন্দ গ্রাম্য ভাবের পাড়া কুঁদুলিয়া ঢঙের রসকলহের পক্ষে উপযোগী। লোচনদাসের পরিবেশিত রঙ্গরসের একটি নিদর্শন—(কুটিলার উক্তি)

শুন শুন ওগো সই দণ্ড চাইর রাইতে।
দাদা ঘরে নাই গেলাম বৌএর কাছে শুইতে॥
প্রদীপ লৈয়া শুধালাম বৌ তোর কোলে কে।
ঢাক করিয়া বলে তোমার দাদা আস্যাছে॥
দাদা আমার শুইয়া আছে আমি মরি ডাক্যা।
বুকের ভিতর কর্যা রাখছে বসন দিয়া ঢাক্যা॥
বসন তুল্যা দেখলাম যদি নন্দের ঘরের কানু।
ধর বোলতে দৌড়্যা পালায় কাড়্যা রাখ্যাছি বেণু॥

শ্রীকৃষ্ণ কুটিলার উক্তির সমর্থন করিয়াছেন—

* * * *

সুবল বোলে গোঠে আল্যা হাতের বেণু কোথা?
হেঁট মাথে রৈছ কেন কও না মনের কথা॥
তোমাকে কহিতে ভাই নাহি কোন ডর।
সেইদিন গেছিলাম আমি আয়ানের ঘর॥
আয়ানেরে না দেখি ঘরে নির্ভয় হৈয়া।
রাই কোলে শুয়্যাছিলাম কাপড় মুড়ি দিয়া॥
নিদ্রায় বিভোল আমি আনন্দিত মনে।
কি জানি পাপিষ্ঠ মাগী ছিল কোনখানে॥

আচম্বিতে আসি মাগি তুলিল কাপড়।
বেণু ফেল্যা পলাইলাম হৈয়া ফাঁফর॥
লোচন বলে এই মর্দ এত তোমার ভয়।
কি করিত ঠেঁটা বুড়ী মায়্যা বৈত নয়।

রাধা যে শ্যামের উপভোগ্যা এ বিষয়ে পদাবলী সাহিত্যে কোন অসঙ্গতি নাই—অতএব সে বিষয়ে সর্বপ্রকার ছলনা, বঞ্চনা, নির্লজ্জতা, ও দুঃসাহস লৌকিক বিচারের অতীত। এই সব লইয়া রঙ্গরসিকতা পদাবলী সাহিত্যে রসসৃষ্টিরই অঙ্গীভূত।

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত কতকগুলি পদে ছদ্মবেশে রাধার সহিত লোকালয়ে রাধার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের মিলন বর্ণনায় রঙ্গরসের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ছদ্মবেশ সম্বন্ধে স্বাভাবিক অস্বাভাবিকের প্রশ্নই উঠে নাই। এজন্য কেলিকুঞ্জে একটি নেপথ্য-গৃহের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপ বিবিধ ছদ্মবেশ স্বয়ংদৌত্য পর্যায়ের রচনা। কাকুতি মিনতি ও বিবিধ উপচারে মানভঞ্জন না হইলে একটা কোন হাস্যোদ্দীপক বিচিত্র অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক চেষ্টার দ্বারা মানিনীর মনের ভাবান্তর ঘটানো ও তাহার মুখে হাসি ফুটানোর জন্য এই সব অভিনয়। ইহাতে রঙ্গরসেব নাটকীয় অভিব্যক্তি ঘটে।

নাপিতানী বেশে আলতা পরাইবার অছিলায় ছদ্মবেশী শ্যাম বহুক্ষণ ধরিয়া শ্রীমতীর চরণ সেবা করিলেন। তাহাতে রসোপভোগ হইয়াছে, কিন্তু রসিকতা করাব অবসর ঘটে নাই। মজুরি চাওয়ার বেলায় রঙ্গভাষণের সুযোগ হইয়াছে—নাপিতানী প্রার্থনা করিল।

হৃদয়ে কনক কলস আছে। মণিময় হার তাহার কাছে॥
তাহার পরশ রতন দেহ। দরিদ্র জনারে কিনিয়া লেহ॥

প্রথম স্পর্শনেই শ্রীমতী—শ্যাম শঠবরকে চিনিয়া ফেলিয়াছেন—কাজেই তিনি বলিলেন—পরশরতন পাইবা বনে। এখন চলহ নিজ ভবনে। শ্রীকৃষ্ণ মালিনীর বেশে মালা বেচিতে আসিয়া নারী বলিয়া

ফুল দিয়া রাধার অঙ্গ সাজাইবার অধিকার পাইতেছে—তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের এই অভিনয় সম্ভোগান্ত না হউক চুম্বনান্ত হইতেছে।

পসারীবেশে শ্রীকৃষ্ণ নানা দ্রব্যের পসরা সাজাইয়া বসিয়াছেন—গোপীদের অঙ্গস্পর্শলাভের কামনায়।—একটা সুযোগ ঘটিয়া গেল। একএক করিয়া গোপীরা এক একটি দ্রব্য কিনিয়া দাম দিয়া চলিয়া যাইতেছিল—তাহাদের মধ্যে একজন একটি সোনার সুচ কিনিয়া দাম না দিয়া গর্বভরে পালাইতেছিল—বাধ্য হইয়া পসারীকে সুচের সঙ্গে কবিতায় তাহার যে অঙ্গের মিল হয় তাহাই ধরিয়া বাধা দিতে হইল।

ইহাতেই রঙ্গরস জমিয়া উঠিল। এই গ্রাহিকা সম্ভবতঃ রাধা নিজেই নতুবা মূল্য না দিয়া লইবার সাহস আর কোন গরবিনীর আছে?

দেয়াসিনী বেশে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে খুঁজিতেছেন, কাছে আসিল জটিলা কুটিলা। তাহারা বধূর পতির (অর্থাৎ আয়ানের) মঙ্গলবর চাহিল। দেয়াসিনী বলিল 'বর' পাইতে হইলে বরপ্রার্থিনীকে কাছে আনিতে হয়। এইভাবে ডাকিয়া চতুর শ্যাম নিজের প্রাণের কথা বলিয়া অর্থাৎ বনে সাক্ষাতের স্থানকাল নির্দিষ্ট করিয়া লইতেছেন।

বণিকনারী বেশে শ্রীকৃষ্ণ গন্ধদ্রব্য বেচিতে আসিলেন। নারীত্বের অধিকারে শ্রীরাধার সর্বাঙ্গে গন্ধানুলেপন করিয়া শ্রীরাধাকে নিদ্রাবিষ্টা করিয়া তুলিলেন। শেষে গন্ধদ্রব্যের মূল্য চাহিলেন এমন কিছু যাহাতে রাধা বণিক নারীকে চিনিয়া ফেলিলেন।

তখন নাগরী বুঝিল চাতুরী হাসিয়া আপনমনে।

'গন্ধের বেতন হইল এমন জীবন-যৌবন টানে।' সর্বজন সমক্ষে নায়কনায়িকার মিলনের কৌশল এই নারীর ছদ্মবেশ। বাদিয়ার ছদ্মবেশ পুরুষরূপে। এই ছদ্মবেশে অঙ্গস্পর্শের সুযোগ নাই। বচনচাতুর্যে বাদিয়া যে-সে বাদিয়া নয়। বাদিয়া বলিতেছে

'বস্ত্র মাগিবার তরে আইলুঁ তোমাদের ঘরে
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছিঁড়া বস্ত্র নাহি লব ভাল একখানি পাব
দেখি দেহ শ্রীঅঙ্গের খানি।'
'বটের ভিখারী হও বহুমূল্য নিতে চাও
বলিলে শোভিত নহে বটে।
বনে থাক সাপ ধর তেনা পরিধান কর
সদাই বেড়াও নদীতটে॥'
'বাত্থা কহে' ধীরে ধীরে তোমার বস্ত্র নিব শিরে
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে অভিলাষ হয় চিতে
তুমি যদি না বাসহ দুখ॥'
'চুপ কর্যা থাক বাত্থা যা পাও তা লও সাধ্যা
ভরমে ভরমে যাহ ঘরে।'
'চুরিদারি নাহি করি ভিখ মাগি পেট ভরি
আমি ভয় করিব কাহারে॥'

বাজিকরের ছদ্মবেশে রাধার মন ভুলানোর পদটি উদ্ধব দাসের। বাজিকরেব কেরামতির বর্ণনা যথাযথ ও সুরচিত। রঙ্গরস ইহাতে বেশ জমিয়াছে। পদাবলী সাহিত্যে অকিঞ্চন দাস একজন রঙ্গরসের কবি। রাধাশ্যামের পাশাখেলার প্রসঙ্গ লইয়া তিনি রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাধা প্রস্তাব করিলেন—'পাশায় হারিলে আমি নাসার বেশর তোমায় দিব—তুমি হারিলে তোমার বাঁশরী কাড়িয়া লইব।' এই ভাবে বেশর ও বাঁশরীর রসকলহ সুরু হইল—

শ্যাম কহে হাসি হাসি আমার মোহন বাঁশী
পাষাণ দ্রবয়ে যার গানে।
এত গুণের বাঁশী মোর কত ধনের বেশর তোর
সমান করহ কোন গুণে॥

রাই কহে শুন শ্যাম বেশর যাহার নাম
সতত দোলয়ে নাসা মাঝে।
যে বেশরে মুখ আলা আপনি ভুলেছ কালা
হেন বেশর নিন্দ' কোন লাজে॥
তোমার বাঁশীটি শূল বধিল অবলাকুল
হাথে মোর ঠেকেছ এবার।
অকিঞ্চন দাসে কয় এত কভু ভাল নয়
ফিরায়ে দিওনা বাঁশী আর।

ললিতা প্রস্তাব করিলেন—"রাই বেশর হারিলে গজমোতিহার দিবে —কিন্তু শ্যাম তুমি হারিলে, বাঁশরী হারাইবে।" শ্যাম বলিলেন— 'যদি জিনি রাই চুম্ব দিবে শতবার।' খেলা চলিতে লাগিল— কোন খেলাতেই শ্যাম জিতেন না—সখাদের সঙ্গেও না, সখীদের সঙ্গেও না। বলা বাহুল্য, শ্যাম হারিয়া গেলেন—সখীরা বাঁশী কাড়িয়া লইল। সখীরা বলিল, যমুনার স্নানঘাটে, দানঘাটে, হাটের বাটে যত দুঃখ দিয়াছ তাহার এবার প্রতিশোধ লইব। শ্যামের নাকালের চূড়ান্ত করিয়া সখীরা শেষে বাঁশী ফিরাইয়া দিল।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'চমৎকার-চন্দ্রিকা' নামে সংস্কৃতে একখানি খণ্ড-কাব্য লিখিয়াছিলেন—তাহাতে মঞ্জূষিকা মিলন, আয়ান বেশে মিলন, বৈদ্য বেশে মিলন ও গায়িকা বেশে মিলন—এই চারিটি মিলনচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। অকিঞ্চন দাস মঞ্জুষিকা মিলন ও আয়ান বেশে মিলন, এই দুটি চিত্র অবলম্বনে পদ রচনা করিয়াছেন। আয়ান বেচারা কুলগ্নে রাধাকে বিবাহ করিয়াছিল—শ্যামের সঙ্গে রাধার অবাধ মিলনে বাধা ঐ সরলচিত্ত গোপ-যুবকটি। এই নিরীহ গোপ-বেচারীর উপর পদাবলীর কবিদের রাগের সীমা নাই। তাহারই নাকালে তাঁহারা আনন্দ পাইয়াছেন এবং ভক্তদের আনন্দ দিয়াছেন।

যশোদা নানাবিধ অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি দিয়া রাধার জন্য পেটিকা সাজাইতেছেন, আয়ানকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন ঐ পেটিকাটি লইয়া

যাইবার জন্য। ইতিমধ্যে সুবল সহ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আসিলেন এবং পেটিকা কোথায় যাইবে জানিয়া তাঁহারাও যশোদাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। সাজানো শেষ হইলে যশোদা অন্য কাজে চলিয়া গেলেন—

এই অবকাশে হরি নিভৃতে মন্ত্রণা করি
মঞ্জুষা ভিতরে লুকাইলা।

এমন সময় আয়ান আসিলেন—রানী ফিরিয়া আসিয়া আয়ানকে বলিলেন—'রাধিকারে দিতে অভিপ্রায়। লয়ে যাও এ পেটিকা বহিয়া তথায়।' সেই পেটিকা মাথায় করিয়া আয়ান রাধিকার উদ্দেশে স্বগৃহে চলিল। সরলচেতা গোপবেচাবী পেটিকার অপ্রত্যাশিত গুরুভার সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয়। নানাভাবেই শ্রীকৃষ্ণের অভিসার পদাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে—সবচেয়ে চমৎকার এই অভিসার। যে আয়ান যষ্টি হস্তে শ্যামের ভয়ে রাধাকে পাহারা দিয়া বেড়ায়, সেই তাহাকে ঘাড়ে করিয়া চতুরা রাধার কাছে পৌঁছিয়া দিতেছে—পদকর্তার এই কৌশলে বঙ্গরসের সৃষ্টি হইয়াছে। আয়ানের ঘাড়ে পেটিকা দেখিয়া রাধা সখীগণকে বলিতেছে—

একি দেখি সুলক্ষণ।
কাঁপে বাম বাহু নাচে বাম আখি
পুলকিত দেহমন॥

পেটিকা খোলা হইলে কপট ক্রোধে রাধা বলিতেছে—

এ দুষ্ট ভূষণ মম সব চুরি করি।
অভিসার করিয়াছে পতি শিরে চড়ি॥

লাঞ্ছনাও কম হয় নাই অকিঞ্চনের হাতে। আয়ানের ছদ্মবেশে শ্যাম রাধার গৃহে প্রবেশ করিয়া —জটিলাকে

কহিলা শুনহ মাতা সে লম্পট হরি।
আসিবে রাধার গৃহে মম বেশ ধরি॥
কদাচ তোমরা তাকে পশিতে না দিবে।
যদি না নিষেধ শোনে ইষ্টক মারিবে॥

কিছুক্ষণ পরে আসল আয়ান নিজের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দ্বার খুলিবার জন্য চেঁচামেচি করিতে লাগিল, কিন্তু মা-বোন দুজনেই গালি দিতে লাগিল।

শ্রমেতে কাতর আয়ান তখন রক্তিম নয়ানে চায়।
বলে দ্বার খোল নতুবা কুটিলা মরিবি পাঁচনি ঘায়॥
শুনিয়া কুটিলা দ্বিগুণ কুপিল ইষ্টক লইয়া হাতে।
যত পারে মুখে দেয় গালাগালি মারে আয়ানের মাথে॥

ওদিকে রাধাশ্যাম নিশ্চয়ই সুখশয্যায় হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছিলেন।

ভূতে ধরিয়াছে ভাবিয়া আয়ান ওঝা ডাকিবারে গেল।
দ্বিজ অকিঞ্চন আয়ান-প্রহার হরিষেতে বর্ণিল।

দ্বিজ অকিঞ্চন 'হরিষেতে' রচনা করিয়াছেন, শ্রোতারাও 'হরিষেতেই' শুনিতেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাধা প্রকৃতপক্ষে কাহার স্বকীয়া কাহার পরকীয়া এই চিত্রই সে প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতেছে।

রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের পরম বৈরী আয়ান, তাহার ভগিনী কুটিলা এবং তাহার মাতা জটিলা। ইহাদের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপই রঙ্গরস জমাইয়াছে। রাধা পতির কল্যাণের জন্য পূজা-ব্রতাদির অছিলায় জটিলাকে প্রতারিত করিয়াছে—আবার জটিলা পুত্র-পুত্রবধূর কল্যাণের জন্য ছদ্মবেশী কৃষ্ণকে গৃহে প্রবেশাধিকার দিয়াছে—এগুলিও রঙ্গরসের উপাদান হইয়াছে। শুধু বঞ্চনা নয়, ইহাদের লাঞ্ছনার চিত্র অঙ্কন করিয়াও কবিরা রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল বিবিধ ছদ্মবেশে এবং অন্যান্য নানা উপায়ে শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের প্রবঞ্চিত করেন নাই, ইহাদের সর্ববিধ সতর্কতাকে নানা উপায়ে নিষ্ফল করিয়াছেন। এজন্য তিনি দুঃসাহসিক কাজও কম করেন নাই—এমন কি ধরা পড়িবার ভয়ে তাঁহার—'রাধাপ্রাঙ্গণ-কোণ-কোলিবিটপিক্রোড়ে গতা

শর্বরী।' আয়ানের বাড়ীর উঠানের কোণে কুলগাছে চড়িয়া তাঁহার রাত্রি কাটিয়াছে—গোবিন্দদাসের সখী বলিয়াছে—

সজনি কি কহিব রাইক সোহাগি।
যাকর দেহলি বদরী কোরে হরি
রজনী পোহায়ল জাগি।

অতএব দেখা যাইতেছে পদাবলী পাঠে আমাদের চোখে কেবল জলই ঝরে না—মুখে হাসিও আসে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মাথুর—নামে অক্রূর, কিন্তু যাহার মত ক্রূর কেহ নাই, সে ব্রজপুরে আসিয়াছে শ্যামকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য। শ্রীমতী তখনও জানেন না, কিন্তু Coming events cast their shadows before. শ্রীমতী ভাবিতেছেন কোন দিকে ত অকুশল নাই তবে—"চমকি উঠয়ে কাহে হিয়া বেরি বেরি?" এক সহচরীর সঙ্গে দেখা হইল—"মোহে হেরি সো ভেল সজল নয়ান।" ইহার কারণ কি? মথুরা হইতে কে যেন বৃন্দাবনে আসিয়াছে—

"তাহে হেরি কাহে জিউ কাঁপি।

তবধরি দখিণ পয়োধর ফুরয়ে লোরে লোচন যুগ ঝাঁপি।"

একটা বিষাদের ছায়া সর্বত্র। "কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জরে, সঘনে রোয়ত শুকসারী।" আসল কথা বেশিক্ষণ চাপা থাকিল না। সখীরা গোপন করিলে কি হইবে? শ্যামের সঙ্গে কুঞ্জে শ্রীমতীর শেষ সাক্ষাৎ হইল, বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে হইবে, রাইকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, শ্যামের নীরদনয়নে ঢরঢর অশ্রু ঝরিতেছে। শ্রীমতী কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তখনও আশা আছে, ভাবিলেন বুঝি শ্যামের অভিমান হইয়াছে। "যবহুঁ পুছলুঁ বেরি বেরি। সজল নয়নে রহু হেরি।" আজিকার এ মিলন বিরহ অপেক্ষা বহুগুণে করুণ ও দারুণ। চুম্বনের অমৃতরস অশ্রুজলে লবণাক্ত। "নিবিড় আলিঙ্গনে রহু পুন ধন্দ। দরদর হৃদয় শিথিল ভুজবন্ধ।" আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় রাগরসের কি অদ্ভুত অভিব্যক্তি। কামনালেশশূন্য নির্লালস প্রেমের অবিমিশ্র রূপ শিথিল ভুজবন্ধে আত্মপ্রকাশ করিল। 'রভসরস কেলি'র সে উন্মাদনা কোথা গেল? "আনহি ভাতি রভসরস কেলি।"

কৃষ্ণকীর্তনের গোবিন্দের মতো পদাবলীর গোবিন্দ নিদ্রিতা রাধাকে ফাঁকি দিয়া পালাইলেন না।

সখীদের সঙ্গে দেখা হইল। রাধা বলিলেন—

"তুহুঁ পুন কি করবি গুপতহি রাখি।
তনুমন তুহুঁ মঝু দেয়ত সাখী॥
তব কাহে গোপসি কি কহব তোয়।
বজর কি বারণ করতলে হোয়॥"

হাত দিয়া কি বজ্র ঠেকানো যায়? কালিন্দী দেবীকে বল—তাহার পিতা সূর্যদেবকে ধরিয়া রাখুক, আজিকার রাত্রি যেন প্রভাত না হয়। আর যদি তাহা না পারে, তবে তাহাব ভ্রাতা যমকে পাঠাইয়া দিক। শ্রীমতী পরক্ষণেই বলিলেন—না না!—

গমনক সময়ে রোধক জনি কোয়।
পিয়াক অমঙ্গল যদি পাছে হোয়॥

অর্থাৎ "আমার যাহা হয় হইবে, প্রিয়ের অমঙ্গল না হয়।" শ্রীমতী চিত্তের দৃঢ়তা বাখিবার বৃথা প্রয়াস করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাব।"

যাহে লাগি গুরু গঞ্জনে মন রঞ্জলুঁ দুরজন কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতি বরত সমাপলুঁ লাজে তিলাঞ্জলি দেল॥

সে কেমন করিয়া আমাকে ত্যাগ করিবে? ইহা কি সম্ভব? আবার—

যো মঝু সরস পরশ রসলালসে মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টককুঞ্জে জাগি নিশি বাসর পন্থ নেহারই মোরি॥

সে তাহার প্রিয়তমাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইবে, ইহা কি সম্ভব?

শ্রীমতী 'উরপর করাঘাত হানিতে হানিতে' মূর্ছিত হইলেন। 'শ্যাম' অক্ষর দুইটি সখীরা উচ্চস্বরে কানের কাছে উচ্চারণ করিতে লাগিল—তাহাতে সংজ্ঞা ফিরিল। কিন্তু তাঁহার "বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচনে মুছত উতপত বারি।" তিনি ভাবিতে লাগিলেন "কানু নহ নিষ্ঠুর চলত যো মধুপুর মঝু মনে এ বড় সন্দেহ।" তাহার প্রেম

কিসে শিথিল হইল? "পিয়া বড় বিদগধ বিহি মোরে বাম।" পিয়ার দোষ নাই, বিধিই আমার প্রতি বাম।

তারপর শ্রীমতীর দিব্যোন্মাদ—

খেনে উচ্চ রোয়ই খেনে পুন ধাবই খেনে পুন খলখল হাস।
চীত পুতলি সম খেনে পুন হোয়ই প্রলাপই খেনে দীর্ঘশ্বাস॥

এই দিব্যোন্মাদই শ্রীচৈতন্যের জীবনেও প্রকটিত। নরহরি গৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—রাধার পিরীতি হৈল হেন।*

শ্রীরাধা বড় ক্ষোভেই বলিতেছেন—"সাগরে তেজব পরাণ। আন জনমে হব কান। কান হোয়ব যব রাধা। তব জানব বিরহক বাধা।" কানু রাধা হইয়া না জন্মিলে বিরহের দুর্বিষহ বেদনা উপলব্ধি করিবে না। বৈষ্ণব মনীষীরা বলেন,—'রাধাভাবদ্যুতি -'সুবলিত' শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেই রাধার এই অভিশাপ ফলিয়াছে।

নিজের এই হাহাকারে লজ্জা পাইয়া শ্রীমতী বলিতেছেন—শ্যাম চলিয়া গেল—দুই চোখ মেলিয়া তাহাই দেখিলাম, শূন্যগৃহে ফিরিয়া আসিলাম—তবু প্রাণ বাহির হইল না। কি নির্লজ্জ এই জীবন! "না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি।" "ক্ষণ রহুঁ জীবন বড় ইহ লাজ।" "দেখ সখি নীলজ জীবন মোয়। পিরীতি জানায়ত অব ঘন রোয়॥" কৃষ্ণহীন জীবনের মূল্য কি? "কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক।" এতদিনে বুঝিলাম "চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত।" জীবন কিছুতেই যাইতে চায় না। ইচ্ছা করিয়া এ জীবন বিসর্জনও করা যায় না। কারণ, আশা ত ত্যাগ করা যায় না—"তাহে অতি দুরজন আশকি পাশ।" কিন্তু আশা রাখিয়াই বা লাভ কি? আশাই বা কত দিন রাখিব?

* মাথুরের প্রসঙ্গে গৌরচন্দ্রিকার গীতিতে কেবল দিব্যোন্মাদ নয়, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ, নদীয়া নাগরীদের বিলাপ ও গৌরাঙ্গের অনুচরগণের বিলাপও গীত হইয়া থাকে। সেইজন্যই বুঝি নবদ্বীপে মাথুরকীর্তন নিষিদ্ধ।

"অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে।
এ নব জীবন বিরহে গোয়ায়লুঁ কি করব সো পিয়া লেহে॥"

যৌবন গেলে প্রিয়ের প্রসাদ লইয়াই বা কি করিব? "কনয়া বিহনে মণি কবহুঁ না সাজ।" যৌবন বিনা প্রেমের মূল্য কি?

সরসিজ বিনু সর, সর বিনু সরসিজ কী সরসিজ বিনু সূরে।
জৌবন বিনু তনু, তনু বিনু জৌবন কী জৌবন পিয়া দূরে॥

শ্রীমতী একবার ভাবিলেন—

মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে ভ্রমিব যোগিনী হৈয়া।
কারু ঘরে যদি মিলে গুণনিধি বাঁধিব বসন দিয়া॥

এই কথা মনে করিয়াই তাঁহার দরদী অন্তরে ব্যথা বাজিল—

বাঁধিব কেমনে সে হেন তুলহ হাতে।
বাঁধিয়া পরাণ ধরিব কেমনে তাহা যে ভাবিছি চিতে।

শ্রীমতী আবার ভাবিতেছেন—জীবনে প্রিয়তমকে আর পাওয়া যাইবে না—কিন্তু মরণে ত পাওয়া যাইতে পারে। মরণে এ দেহ ত পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে। তখন ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোমের মধ্য দিয়া যেন তাঁহাকে পাই।

শ্রীমতী বৃন্দাবনে বনপথ-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—সর্বত্রই দেখিতেছেন—লীলামাধুরীর স্মৃতিচিহ্ন। শ্রীমতী বলিতেছেন—

গিরিবর কুঞ্জ কুসুমময় কানন কালিন্দী কেলিকদম্ব।
মন্দির গোপুর নগর সরোবর কো কাহা করু অবলম্ব॥

মাধবীতলে আসিয়া বলিতেছেন—

এই না মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া যোগী হেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনা হিয়া মোর ফাটিয়া না পড়ে কেন নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥
হেরইতে কুসুমিত কেলি নিকুঞ্জ। শুনইতে পিকবর অলিকুল গুঞ্জ।
অনুভবি মালতী পরিমল এহ। কো জানে জীউ রহত এই দেহ॥

ইহাতেও জীবন যে কি করিয়া আছে তাহা কে জানে?

দিবস লিখিয়া লিখিয়া নখ ক্ষয় পাইয়া গেল। গৃহ-ভিত্তির গাত্র

কালির দাগে ভরিয়া গেল। "দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।" স্বপ্নেও আজ সে দুর্লভ।

নয়নক নিন্দ গেও মঝু বৈরিনি জনমহি যো নাহি ছোড়।
সপনহি সো মুখ দরশন দুলহ অতএ নহত কভু মোর।

পথ চাহিতে চাহিতে 'নয়ন অন্ধায়ল'।

"এখন তখন করি দিবস গোয়ায়লুঁ দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোয়ায়লুঁ ছোড়লুঁ জীবনক আশা॥
বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়লুঁ খোয়লুঁ এ তনু আশে।
হিমকর কিরণে নলিনী যদি জারব কি করব মাধবী মাসে॥"

শ্রীমতীর মনে এ কথাও জাগিয়াছে—মথুরানগরে বিলাসিনী রাজবালাদের পাইয়া শ্যাম হয়ত গোপবালাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—

গ্রাম্য কুলবালিকা সহজে পশুপালিকা হাম কিয়েঁ শ্যাম উপভোগ্যা।
রাজকুলসম্ভবা সরসিরুহ-গৌরবা যোগ্যজনে মিলয়ে যেন যোগ্যা॥

অমিয়া ফলের আস্বাদ পাইলে কি কেহ নিম্বফলের দিকে চায়? মালতী ফুল পাইলে কি ভ্রমর ধুতুরা ফুলে যায়? পদকর্তা ইহাতে রাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীমতীর পক্ষে এ চিন্তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

শ্রীমতী সখীদের বলিতেছেন—তোমরা প্রিয়ের কাছে গিয়া কদম্বতলের শপথ স্মরণ করাইয়া দিও। বৃন্দাবনের শুকশারী ও কপোতকপোতী সাক্ষী আছে। ইহাদের চেয়ে বড় সাক্ষী বৃন্দাবনের সরলা আভীরবালার আর কে আছে? "কহিও তাহার পাশে। যাহারে ছুঁইলে সিনান করিতাম সে মোরে দেখিয়া হাসে॥" তাহাতেও তাহার দয়া হইতে পারে। আমার ত জীবন শেষ হইয়া আসিল। আমি আর রহিব না। তবু সে যেন একবার ব্রজপুরে আসে। আমার স্মৃতিচিহ্ন এখানে থাকিল।

নিকুঞ্জে রাখিলুঁ মোর এই গলার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
এই তরুশাখায় রহিল শারি শুকে।

মোর দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে ॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী ॥

আমার জন্যই শুধু এই অনুরোধ জানাইতে বলিতেছি না। শ্রীদাম-সুদাম সখাগণ আছে, তাহাদের সঙ্গে যেন একবার দেখা করে। আমি হয়ত অপরাধ করিয়াছি—তাহারা ত নিরপরাধ। আর অভাগিনী যশোদা জননী?

দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি ॥
তারে আসি পিয়া যেন দেয় দরশন।
কহিয় বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥

নিজের দুর্বিষহ দুঃখের মধ্যেও শ্রীমতী দুঃখিনী যশোদার দুঃখের কথা ভুলেন নাই।

শ্রীমতীর অঙ্গের ভূষণ এখন দূষণ হইয়া উঠিয়াছে। ভূষণে দূষিয়া তাই তিনি বলিতেছেন—

শঙ্খ কর চূর বেশ কর দূর তোড় গজমতি হার রে।
সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া কর দূর পিয়া বিনা কেবা কার রে ॥

শ্রীমতী নিজ অঙ্গের ভূষণগুলি সখীদের বিলাইয়া দিয়া বলিলেন—

সোই যদি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে
আনলো সখি গরল করি গ্রাসে।

তারপর আমার প্রাণহীন দেহ—'নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি'—শ্যামল-রুচি তমাল তরুর শাখায় বাঁধিয়া রাখিবি। কেন এই অনুরোধ জান?

কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পাওব আমি পিয়া দরশনে ॥

শ্রীমতীর আক্ষেপের মধ্যে মান অভিমান আর নাই। আপনার দীনতাই তিনি নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী সুখ লব ভৈ গেল নিরাশা॥

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—কোন্ অপরাধে তাঁহার এ দুর্দশা? "কার পূর্ণ ঘট মুঞি ভাঙ্গিলু বাম পায়।" "না জানিয়া হায় কোন দেবেরে নিন্দিলুঁ।" ইহা কি কোন অনাচার বা অহঙ্কারের দণ্ড?

'পিয়াক গুরু গরবে' আমি কাহাকেও তৃণের মতনও গণ্য করি নাই।

নহিলে কেন ঐছে গতি কাহে ভেল রে সখি
সোই অভিশাপ মুঝে ফলনা।

সেই অভিশাপের দণ্ডই কি আমি ভোগ করিতেছি?

আবার বলিয়াছেন—

'পূরব জনমে বিধি লিখিল ভরমে। পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে'। এত অবিচারেও শ্রীমতীর আজ আর অভিমান নাই। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন—

জনমে জনমে রহু সে পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাগি মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না হেরিনু মুখ॥

শ্যামহারা বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক দশা কবিরা নানাভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি॥
রোদতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥

পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন—

তরুকুল আকুল সঘনে ঝরয়ে জল তেজল কুসুমবিকাশ।
গলয়ে শৈলবর পৈঠে ধরণি পর স্থল জল কমল হতাশ॥

শুকপিক পাখী শাখি পর রোয়ই রোয়ই কাননে হরিণী।
জম্বুকীসহ শিবা রহি রহি রোয়ই লোরহিঁ পঙ্কিল ধরণী॥

রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

ন পিবতি মকরন্দং বৃন্দমিন্দিন্দিরাণাং
বনমপি ন ময়ূরাস্তাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্তি।
বিদধতি চ রথাঙ্গাঃ স্বাঙ্গনাভির্ন সঙ্গং
সরতি সরসিজাক্ষে গোষ্ঠতঃ পত্তনায়॥

তদনুবর্তনে—

গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

(১) সারী শুক পিক, কপোত না ফুকরত, কোকিল না পঞ্চম গান।
কুসুম তেজি অলি ভূমিতলে লুঠই তরুগণ মলিন সমান॥

(২) কুঞ্জ কুঞ্জঁর ভেল কোকিল শোকিল বৃন্দাবন বন দাব।
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন মারুত মারত ধাব॥

কেবল প্রকৃতির কথা নয়, কবিরা সখীগণ, সখাগণ ও যশোমতীর বেদনার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাও অতি করুণ। বৃন্দাবনের সে দুর্দিনের কথা বাঙ্গালার কবিরা আজিও ভুলেন নাই। বর্তমান যুগের কবিরাও গাহিয়াছেন—

গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল, আঁধার হলো কুঞ্জবন।*

বৈষ্ণব কবিগণ শ্যামহারা বৃন্দাবনের ও শ্রীমতীর দুর্দশার বর্ণনা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শ্রীমতীর সখীদের মথুরায় লইয়া আসিয়াছেন। সখীরা মথুরার অধিপতিকে 'ধিক ধিক তোরে নিঠুর কালিয়া' ইত্যাদি

---

* বিশ বৎসর বয়সে আমি শ্যামহারা বৃন্দাবনের ঝরাফুল দিয়া একটি মালা গাঁথিয়াছিলাম। কবিবর শশাঙ্কমোহন সেন বলিয়াছিলেন এই গীতিমতেই বাংলা কাব্য সাহিত্যে মাথুরের পালার শেষ। তারপর এই ৫২ বৎসরের মধ্যে মাথুর গীতি আর কেউ লিখেন নাই। শশাঙ্ক বাবুর কথাই হয়ত যথার্থ হইতে চলিল। আমার সে গান উড়িষ্যায় ভাগবতঘরগুলিতে পদাবলীর সঙ্গেই গাওয়া হয়—যাহারা গায় তাহারা জানে কোন প্রাচীন পদকর্তার ভণিতাহারা গান।

বলিয়া যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতেছেন, সেই সঙ্গে শ্লেষব্যঙ্গও হানিয়াছেন—

"সোনার প্রতিমা ধূলায় গড়ায় কুবুজা বসেছে খাটে।"

"দেশে কে না জানে চোরা কালা কানে বিদেশে হয়েছে সাধু।"

"আপনি যেমন ত্রিভঙ্গ মুরারি বিধি মিলাইছে জেনে।" ইহা ছাড়া, রাধার পায়ে যাবক রচনা, দাসখৎ লেখা, ক্ষীর ননী চুরি ইত্যাদি অগৌরবের কথা এবং নানা প্রকার লজ্জা-লাঞ্ছনার কথা সখীরা স্মরণ করাইয়া দিল। শেষ পর্যন্ত অনেক আবেদন নিবেদন; রাধার দুর্দশার অতি করুণ বর্ণনা। কবিরা ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই, শ্রীকৃষ্ণকেও বিচলিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ 'কাঁহা মোর রাই' বলিয়া বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়া আসিলেন—এরূপ কল্পনাও করা হইয়াছে।

অবসর নাহি বাঁশী নিতে।
নূপুর বিহনে পায় গোকুলের পানে ধায় পীতধড়া পরিতে পরিতে॥
ননী জিনি সুকোমল দুখানি চরণতল কোথা পড়ে নাহিক ঠাহর।
দয়া করি চাতকীর পিপাসা করিতে দূর ধায় যেন নবজলধর॥
সেই সে রাধার ধাম আসি উপনীত শ্যাম বিরহিণী জিউ হেন বাসে।
গোবিন্দদাসে কয় মৃত তরু মুঞ্জরয় বসন্ত ঋতু পরকাশে॥

ইহা ভাবসম্মিলনের পদ নয়। ইহা দরদী কবির একটা কল্পনাচিত্র মাত্র।

অনুক্ষণ কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে শ্রীমতীর মনে হইয়াছে 'আমিই শ্রীকৃষ্ণ'—

এই ভাব শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতগোবিন্দেও আছে, কিন্তু বিদ্যাপতি ঠাকুর ঐ তত্ত্বকে রসের নির্ঝরে পরিণত করিয়াছেন—

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরি ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্ব-ভাবহি বিছুরল আপন গুণ লুবধাই॥
রাধা সঙে যব পুন তহি মাধব মাধব সঞে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহু নাহি টুটত বাঢ়ত বিরহক বাধা॥

তুহুঁ দিশে দারু দহনে যৈছে দগধই আকুল কীট পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখি কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

এই তত্ত্ব ও এই রস দুইই শ্রীচৈতন্যের জীবনে কিরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছিল বৈষ্ণব-সাহিত্যের সকল রসিকই তাহা জানেন।

'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে গোরা চাঁদ ভেল মাধাই।'

আজিও তিনি আমাদের কাছে মাধাই হইয়াই আছেন।—একথা বলিলে কি অসঙ্গত কিছু বলা হয়?

সখী-মুখে শ্রীমতীর এই দশা মামুলী কবি-প্রথায় বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই চারিটি চরণে তাহা রসঘন হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন—

"নয়নক লোর লেশ নাহি আওত ধারা অব নাহি বহই।
বিরহক তাপ অবহুঁ নাহি জানত অনিমিখ লোচনে রহই॥"
"মরকত স্থলী শুতলি আছলি বিরহে সে খিন দেহা।
নিকষ পাষাণে যেন পাঁচ বাণে কষিল কনক রেহা॥"
"ক্ষণে ক্ষণে অনুরাগে এমনি নিশ্বাস ছাড়ে নাসার বেশর পড়ে খসি।"
"শিশিরে লতা জনু বিনি অবলম্বনে উঠইতে করু কত সাধ।"
"ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগবাতি
সে কেমনে রহয়ে যোগান।
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসোঁ হেন ঝাট আসি রাখহ পরাণ॥"
"অঙ্গুরী বলয়া ভেল দেহ দীপতি গেল দারুণ তুয়া নব লেহা।
সখীগণ সাহসে ছোঁই নাহি পারই তন্তুক দোসর দেহা॥"

রাধার দেহের যৌবনশ্রী, ভূষণদ্যুতি ও শ্রীরূপ-লাবণ্য কৃষ্ণ-বিরহে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মত একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছে—এই কথা কবিরা নানাবিধ অলঙ্কারের সাহায্যে কত ভাবেই না বলিয়াছেন! বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

শরদক শশধর মুখরুচি সোঁপলক হরিণক লোচনলীলা।
কেশপাশ লয়ে চমরীক সোঁপল পায়ে মনোভব পীলা॥

দশনদশা দাড়িবকে সোঁপলক বন্ধুকে অধররুচি দেলি।
দেহদশা সৌদামিনী সোঁপল কাজরসম সব ভেলি॥

ঘনশ্যাম বলিয়াছেন—

অঞ্জন লেই তনু রঞ্জল নবঘন দামিনী দ্যুতি হরি নেল।
লেই যৌবন ছিরি নব অঙ্কুর করি নিধুবন ঘন বন ভেল॥

গতিগোবিন্দ বলিয়াছেন—

চমরী লইল কেশ বিদ্যাধরী নিল বেশ মুখশোভা নিল শশিকলা।
মৃগ নিল দুই আঁখি ভ্রু নিল খঞ্জন পাখী মৃদুহাসি লইল চপলা॥

শ্রীরাধার দেহে সে কান্তি আর নাই। রাধার রূপ দেখিয়া যাহারা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া ছিল, এখন তাহারা নিশ্চিন্ত হউক—

এত দিনে গগনে অখিন রহু হিমকর জলদে বিজুরী রহু থির।
চমরী চমরু নগরে পরিবেশউ মদন ধনুয়া ধরু ফীর॥
কুমুদিনীবৃন্দ দিনহু সব হাসউ বাঁধুলি ধরু নব রঙ্গ।
মোতিম পাঁতি কাঁতি ধরু উজোর কুঞ্জর চলু গতি ভঙ্গ॥

এইগুলি ছাড়া—"দিবসে মলিন জনু চাঁদক রেহা"
"তপতসরোবরে থোরি সলিল জনু আকুল সফরি পরাণ।"
"উচকুচ উপর রহত মুখমণ্ডল সো এক অপরূপ ভাতি।
কনয়া শিখরে জনু উয়ল শশধর প্রাতর ধূসর কাঁতি॥"
"দিনে দিনে খীন তনু হিমে কমলিনী জনু।"
"বিরহে জ্বরে জরি কনয়া মঞ্জরি রহল সে রূপক ছাই।"

ইত্যাদি অলঙ্কৃত চরণের দ্বারা কবিগণ শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গের দুঃসহ বিরহদশার আভাস দিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করিয়াছেন—এ দুঃখ বচনাতীত।

✓ প্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের যে গভীর চিরন্তন সংযোগ তাহা কবিরা ভুলেন নাই। মাসে মাসে ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির অঙ্গে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। এই বৈচিত্র্যের সহিত শ্রীমতীর প্রত্যেক প্রেম-লীলার স্মৃতি বিজড়িত। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যগুলি শ্রীমতীর

বেদনায় উদ্দীপন-বিভাবের কার্য করিয়াছে। কবিরা ইহাতে নূতন নূতন কবিতার প্রেরণা ও উপাদান পাইয়াছেন। এই কবিতাবলিই শ্রীমতীর বারমাস্যা। কবিরা বলিয়াছেন—বিরহে প্রকৃতির পীড়ন দ্বিগুণিত, আর প্রকৃতির প্রসাদ নিগ্রহে পরিণত হইয়াছে।

বসন্তে—চৌদিশ ভমর ভম কুসুমে কুসুমে রম নীরসি মাজরি পিবই।
মন্দ পবন বহ পিক কুহুকুহু কহ শুনি বিরহিনি কৈসে জীবই॥
গ্রীষ্মে—একে বিরহানল দহই কলেবর তাহে পুন তপনক তাপ।
ঘামি গলয়ে তনু নুনিক পুতলি জনু দেখি সখি করু পরলাপ॥
বর্ষায়—কুলিশ কতশত পাত মোদিত মউর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
শরতে—আশ্বিনমাসে বিকশিত পদুমিনি সারস হংস নিশান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ॥
হেমন্তে—আঘন মাস রাস রস সায়র নায়র মাথুর গেল।
পুরবাসিনিগণ পূরল মনোরথ বৃন্দাবন বন ভেল॥
শীতে—তুয়া গুণে কামিনি কত হিম যামিনি জাগরে নাগর ভোর।
সরসিজ মোচন বর লোচন রহুঁ ঝরতহি ঝর ঝর লোর।

বারমাস্যা পদে প্রত্যেক মাস ধরিয়া রাধিকার বেদনার নব নব রূপ দেখানো হইয়াছে। এই সঙ্গে সাম্য-সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যাও রচিত হইয়াছে: ঘনশ্যামদাস, গোবিন্দদাস ও বলরামদাস আঘন মাস হইতে ও বিদ্যাপতি আষাঢ় মাস হইতে রাধার বারমাস্যার বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির অন্য একটি বারমাস্যা চৈত্র হইতে আরব্ধ, তুই গোবিন্দদাস তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। বারমাস্যার পদগুলি ছন্দের মাধুর্যে, ভাষার চাতুর্যে, রসের প্রগাঢ়তায়, পদবিন্যাসের পারিপাট্যে অপূর্ব। এইগুলি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব। প্রত্যেকটি হইতে এক একটি স্তবক উদ্ধৃত করি—

বি-কাশ হাস বি-লাস সুললিত কমলিনী রসজৃম্ভিতা।
মধু-পান-চঞ্চল চঞ্চরী-কুল পদুমিনী মুখচুম্বিতা।

মুকুল পুলকিত বল্লি তরু অরু চারু চৌদিক সঞ্চিতা।
হাম সে পাপিনি বিরহে তাপিনি সকল সুখপরিবঞ্চিতা।

(বিদ্যাপতি)

অব, ভেল শাঙন মাস।   অব, নাহি জিবনক আশ।
ঘন, গগনে গরজে গভীর।   হিয়া, হোত যেন চৌচির।
হিয়া—হোত জনু চৌচীর থীর না বান্ধে পলকাধো আর রে।
ঝলকে দামিনি খোলি খাপসে মদন লেই তলোয়ার রে।

(ঘনশ্যাম)

শাওনে সঘনে গগনে ঘন গরজন উনমত দাতুরি বোল।
চমকিত দামিনি জাগরে কামিনি জীবন কণ্ঠহি লোল।
ভাদর দরদর দারুণ তুরদিন ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকরনিকরে থির নহ অন্তর বহই মনোভব মন্দ।

(গোবিন্দদাস)

পৌষতুষার তুষানলে জারল জীবন নায়রি নাহ।
সুধির সমীর সুধাকর শীকর পরশ গরল অবগাহ।
অহনিশি ডহডহ হিয়া জিউ থির নহ তুঃসহ বিরহক দাহ।
উঠত বৈঠত শোয়ত রোয়ত কতয়ে করব নিরবাহ।

(বলরাম দাসের শ্রীকৃষ্ণের বারমাস্যা)

মাস গণি গণি আশ গেলহি শ্বাস রহু অবশেষিয়া।
কোন সমুঝব হিয়াক বেদন পিয়া সে গেল পরদেশিয়া।
সময় শারদ চাঁদ নিরমল দীঘদীপতি রাতিয়া।
ফুটল মালতি কুন্দ কুমুদিনি পড়ল ভ্রমরক পাঁতিয়া।

(গোবিন্দদাস চক্রবর্তী)

শারদ চন্দ্র, মলয়ানিল, ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিল-পাপিয়া-হংস-চক্রবাক-ডাহুক-ডাহুকীর কণ্ঠস্বর, দাতুরীর রোল, দামিনীর চমক, মেঘের মন্দ্র, ময়ূরের নৃত্য ও কেকা, মালতী, কুন্দ, কুমুদ, পদ্মিনী ও

আম্রমঞ্জরীর সৌগন্ধ্য ইত্যাদি বিরহ-বেদনাকে নিত্য নবীভূত করিয়াছে।

মাসের পর মাস চলিয়া যায়, প্রিয়ের দেখা নাই। এই কালের অতিবাহন নৈরাশ্যকে কেমন করিয়া বাড়াইয়া দিতেছে কবিরা তাহা এই পদগুলিতে ফুটাইয়াছেন। এই নৈরাশ্যের কারুণ্যধারা কবিতাগুলিকে উদ্দীপন বিভাবের নির্ঘণ্টে পরিণত হইতে দেয় নাই। গভীর বেদনার সুরসূত্রে চিরপ্রচলিত চিরপরিচিত উপাদান উপকরণগুলি যেন শিশিরসিক্ত বনমালিকার রূপ ধরিয়াছে। শৈলসম যৌবনকে অঙ্গে ধারণ করিয়া পথপানে চাহিয়া থাকা, একেশ্বরী হইয়া অনাথিকা শয্যায় অবলুণ্ঠন, প্রকৃতির মধ্যে ও লোকালয়ে নিত্য নব নব উৎসবের মধ্যে বিরহিণীর ভাগ্য-যন্ত্রণাভোগ কবিতাগুলিতে রস যোগাইয়াছে। কত কথাই শ্রীমতীর মনে পড়িতেছে—গ্রীষ্মের রজনীতে প্রিয়তমের কোলে তাপিত অঙ্গ জুড়াইয়া যাইত, বর্ষায় অশনিগর্জনে ত্রস্ত হইয়া প্রিয়তমকে সে আঁকড়িয়া ধরিত; গভীর শীতের রজনীতে প্রিয়তমের অঙ্কের উষ্ণতায় শৈত্যের জড়তা বিদূরিত হইত—শরতে ও বসন্তে তাহার সঙ্গে কত রসলীলাই না হইত ইত্যাদি!

মাথুরের বারমাস্যা কবিতাগুলি পদবিন্যাসের মাধুর্যে, ছন্দোবৈচিত্র্যের চাতুর্যে, অলঙ্করণের ঐশ্বর্যে জগতের বিরহ-সাহিত্যে অপূর্ব অবদান।

বৈষ্ণব কবিরা এইভাবে মাথুরের গান গাহিয়া গিয়াছেন। তারপর তাঁহাদের অনুকরণে এদেশে শত শত কবি রাধা-বিরহের সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে, ক্ষেতে ক্ষেতে, পথে পথে গায়কগণ সেই সকল গীতি গাহিয়া বঙ্গদেশের হৃদয়াকাশকে মেঘ-মেদুর করিয়া রাখিয়াছে। গৃহস্থগণের চিত্তকে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে, গৃহসংসার হইতে তাহাদের মনকে কাড়িয়া লইয়া ক্ষণকালের জন্যও অজানা অনন্তের উদ্দেশে লইয়া গিয়াছে,

তাহাদের মনে অজ্ঞাতসারে মানবাত্মার চিরবিরহের কথা জাগাইয়াছে, সংসারের কলকোলাহলের মধ্যেও ক্ষণকালের জন্য বৈরাগ্যের উদ্দীপন করিয়াছে, এবং পরিপূর্ণ সুখসৌভাগ্যের মধ্যেও একটা অনিদান অস্বস্তি ও অপূর্ণতার বেদনা সঞ্চার করিয়াছে।

একশ্রেণীর বৈষ্ণবসাধকদের মতে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসই নবদ্বীপলীলার মাথুর। তাঁহাদের রসসাধনায় গৌরাঙ্গদেব 'নবদ্বীপং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।' নবদ্বীপলীলার বাহিরে নিমাইএর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণের যোগ নাই। তাঁহাদের পদাবলীতে কেশবভারতী অক্রূরের মতই ধিক্কৃত হইয়াছেন। নাপিতের যে নির্ম্মম ক্ষুর গৌরের চাঁচর চিকুর মুণ্ডিত করিয়াছে তাহা তাঁহাদের হৃদয়ও খণ্ড-বিখণ্ডিত করিয়াছে। তাঁহারা শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যায় তাঁহারা মাথুরের আতুরতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুবর্তীদের বংশধরগণের গৃহে গৃহে সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নয়, নদীয়ানাগর শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি বিষ্ণুপ্রিয়া কিংবা নিত্যানন্দ-গদাধরের সঙ্গে আজিও নিত্য সেবার্চনা লাভ করিতেছে।

এই মাথুরের নানাভাবে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। বৃন্দাবনকে লীলাভূমি বা স্বপ্নজগৎ এবং মথুরাকে সত্যলোক বা জীবন-সংগ্রামের কর্মক্ষেত্র মনে করিয়া একটা ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। বৃন্দাবন লীলাভুবনই হউক, আর স্বপ্নলোকই হউক আর আহ্বান সত্যেরই হউক আর জীবন-সংগ্রামেরই হউক—বিদায়ের বেদনা মহাবীরের পক্ষেও মর্মন্তুদ। সত্যের আহ্বানে চঞ্চল বীর-হৃদয়ও বলিবে—

বিদায় চন্দ্রাননে!
এসেছে আজিকে মথুরার দূত আমার বৃন্দাবনে॥
ডাকিছে সত্য বিষাণ-বাদনে জীবন-মরণ-রণ-প্রাঙ্গণে
ডাকে মাথুরের কাতর কাকূতি আতুরের আঁখি-লোর।

পাষাণ-কারার আকুল রোদন   করেছে সুপ্ত তেজের বোধন
ভাঙিতে হয়েছে রাগের স্বপন ফাগের রঙীন ঘোর।
মিছে আর আঁখিজল।
মথুরার দূত কবিয়া দিয়াছে অন্তর টলমল। (পর্ণপুট)

আর একটি ব্যাখ্যা এই। ভগবান বলেন—"ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীতি।" তিনি সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসেরই বশীভূত। মাধুর্যের মধ্যে ঐশ্বর্যভাব আসিয়া পড়িলেই বাহুবন্ধ শিথিল হইয়া পড়ে। আর তিনি লীলাভুবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইহাই ভক্তের সাধনমার্গে মাথুর।

গোপগোপীদের দেশে লীলারঙ্গে ছদ্মবেশে বাজাইয়া বাঁশী,
আপনারে সংগোপন করি কত দিন রবে হে লীলাবিলাসী ?
সখারা চড়িল কাঁধে মানিনী ধরালো পায় হইয়া ভামিনী
যশোদা খাওয়ালো ননী, কহিল কঠোর বাণী আভীরী কামিনী।
লীলার মাধুরী ভুলি একদিন অতর্কিতে দেখালে বিভূতি,
তব পীতবাস ভেদি বিকীর্ণ হইল কবে ভাগবতী দ্যুতি।
গোকুলের সখাসখী চমকি' উঠিল দেখি কুণ্ঠাভয়াতুর,
হ'য়ে গেল স্বপ্নভঙ্গ, ফুরাল লীলার রঙ্গ, জ্বলিল মাথুর।
মাধুর্য বিদায় নিল, ঐশ্বর্য আনিল দাস্য লীলার জগতে,
গোষ্ঠের রাখাল ছিলে তব দূর্বাসন ফেলে' আরোহিলে রথে।
সে রথ ত মনোরথ, সেবার্চনা তার পথ। কেবা সে অক্রূর ?
মূর্তিমান দাস্য সে যে। মানসেই বৃন্দাবন আর মধুপুর।
যুগে যুগে দেশে দেশে এই লীলা অভিনীত মানুষেরই মনে,
দাস্য আসে দস্যুবেশে মাথুর ঘটায় শেষে লীলার স্বপনে।

মাথুরের আর একটি ব্যাখ্যা—প্রত্যেক মানুষের জীবনেই মাথুর আসে। যৌবনই বৃন্দাবন, যৌবনাত্যয়ই মাথুর। যৌবন প্রেমের মধ্য দিয়া যাহা উপলব্ধি করে, যৌবনাত্যয়ের দাস্যভাবে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

দৃষ্টি হয়ে আসে ক্ষীণ এ সৃষ্টি লালিত্যহীন খালিত্যে বি-কচ হ'ল শির।
ভ্রান্তি ঘটে প্রতি কাজে ক্লান্তি আসে পথিমাঝে মতি আর
রয়নাক স্থির।
ঔদাস্যে হৃদয় ভরে নৈরাশ্য আকুল করে, লইয়াছে বিদায় যৌবন।
শ্যাম মোর মথুরায় চলে গেছে হায় হায় অন্ধকার মোর বৃন্দাবন।
ফুটে না কুসুমকলি জুটে না কাননে অলি কালিন্দী ধরে না কলতান,
গাছে মূক শুকসারী ক'রে রয় মুখ ভারী পিকপিকী গায়নাক গান।
যুগে যুগে দেশে দেশে যৌবনলীলার শেষে মানবেরে করিয়া আতুর,
লীলারঙ্গমঞ্চপানে এমনি করিয়া হানে শিলাবৃষ্টি জরার মাথুর।
জীবনে জীবনে হেরি মানবসংসার ঘেরি বৃন্দাবনলীলা বলয়িত,
একই লীলা নিত্যকাল করিতেছে নন্দলাল লীলাভঙ্গে
করে পিপাসিত।
শিথিল স্নেহের টান বন্ধুত্বের অবসান ম্লান হয় প্রেম প্রেয়সীর,
অক্রূরের সাথে সাথে দাস্যভাবে সন্ধ্যাপ্রাতে মন্দিরে প্রণত হয় শির।

একটি ব্যাখ্যা সার্বজনীন। রাধা-বিরহ মানবাত্মার চিরন্তন বিরহেরই সাহিত্যরূপ। পূর্ণের সহিত, অসীমের সহিত, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে বিচ্ছেদ সে বিচ্ছেদের বেদনা মানবমাত্রেরই অন্তরে সুপ্ত আছে। প্রকৃতির বৈচিত্র্য সেই বেদনাকে জাগাইয়া মানবচিত্তকে অকারণে উদাসী করিয়া তোলে। রবীন্দ্রনাথ এই বেদনার কবি। এই বেদনাকেই বৈষ্ণব কবিরা রাধা-বিরহের সঙ্গীতের মধ্য দিয়া বাণীরূপ দিয়াছেন। স্বরচিত একটি কবিতার দ্বারা এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি—

অক্রূরের রথে চড়ি লীলারঙ্গ পরিহরি
কবে শ্যাম রায়
কাঁদাইয়া গোপীগণে কাঁদাইয়া বৃন্দাবনে
গেল মথুরায়।

গন্ধে মিলাইল ধূপ অরূপ হইল রূপ,
অনির্বচনীয়,
ইন্দ্রিয়ের রসায়ন ভাবে হয়ে নিমগন
হলো অতীন্দ্রিয়।

উঠিল শ্রীরাধিকার বুকফাটা হাহাকার
বিদারি গগন,
"কোথা গেলে রসরাজ দশমী দশায় আজ
দাও দরশন।"

কাঁদে তায় প্রতি শাখী গোকুলের মৃগপাখী
রাধিকার শোকে,
কাঁদে গোপ-গোপী যত অশ্রু ঝরে অবিরত
জটিলারো চোখে।

অরূপ ফিরেনি রূপে গন্ধ ফিরেনিক ধূপে
শ্যাম বৃন্দাবনে,
তাই আজো রাধিকার আর্তনাদ হাহাকার
বাজিছে ভুবনে।

গুমরে গিরির বুকে ধ্বনিছে নির্ঝর মুখে
নদী কলকলে,
মর্মরিছে বনে বনে মন্দ্রিতেছে খনে খনে
বারিদ-মণ্ডলে।

জীবনে জীবনে ব্যথা জাগাতেছে ব্যাকুলতা
অজানার টানে
মুখে অন্ন নাহি রুচে. চোখে ঘুমঘোর ঘুচে
চাহি কার পানে?

সে বিরহ আজো বাজে মন নাহি লাগে কাজে
কারে যেন চায়,
কারে নাহি পেয়ে বুকে সংসারের কোন' সুখে
প্রাণ না জুড়ায়।

কাহার বরণ স্মরি মেঘ হেরি শির' পরি
পরাণ উদাস,
প্রেয়সী রহিতে কোলে উন্মনা তাহারে ভোলে,
শ্লথ বাহুপাশ।

ব্রজের সজল আঁখি যত মৃগ যত পাখী
নব জন্ম লভি',
হইল কি দেশে দেশে যুগে যুগে ফিরে এসে
শত শত কবি!

রাধার বিরহ রাগে তাদের কল্পনা জাগে
হইয়া অরুণ,
তাদের সকল গীতি ছন্দিত সকল স্মৃতি
করেছে করুণ।

জাগায় সে গূঢ় ব্যথা কোন সুদূরের কথা
পূর্ণের পিয়াসা,
তাহাদের গানে গানে ছুটেছে অনন্ত পানে
অমৃত তিয়াসা।

নিখিল ভুবন ভ্রমি বিশ্বসীমা অতিক্রমি
লক্ষ্য নাহি জানি,
কাহার সন্ধানে ঘুরে দেশকালাতীত সুরে
তাহাদের বাণী।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ভাবসম্মেলন—বৈষ্ণব কবিগণ যে রাধাকৃষ্ণের নিত্য মিলনের কথা বলিয়াছেন, তাহা বৃন্দাবনের রূপলোকে নয়, তাহা কোন কুঞ্জে নয়, তাহা ভাবলোকে। মহাভাবই বৃন্দাবনলীলায় রূপের মাঝারে অঙ্গ লাভ করিল—সে রূপ আবার ভাবের মাঝারে ছাড়া পাইল। ইহাই ভাবসম্মেলনের মূল কথা।

পদাবলী সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে পরিণাম-রমণীয় করিয়াছে ভাবসম্মেলন—কবি অনন্তদাস বলিয়াছেন—

দাবানলে পুড়ে ফুল বিথারল যৈছে লবঙ্গলতা।

শ্রীমতীর দুর্বিষহ বিরহে আর্ত্ত গৌড়জনকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই যেন কবিদের এই ভাবসম্মেলনের সমাবেশ।

ভাবলোকে বিরহ নাই, সেখানে রাধাকৃষ্ণের মিলন নিত্য মিলন। বৈষ্ণব কবিরা রসসম্ভোগের জন্য 'ভাবকে রূপের মাঝারে অঙ্গ' দিয়াছিলেন। এই কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন অন্যভাবে—অরূপ লীলারস-সম্ভোগের জন্য রাধাকৃষ্ণ এই দুই রূপে প্রকট হইয়াছিলেন, তারপর লীলান্তে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রূপ আবার ভাবের মাঝারে' ছাড়া পাইল—'অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ ত্যাগ করিলে সীমা অসীমের মাঝে হারা হইল।' বৃন্দাবনের রূপলীলাই বিরহ, রূপের ভাবে ফিরিয়া যাওয়াই ভাবসম্মেলন। এই মিলনই নিত্য মিলন। এই মিলনের আনন্দই ভাবসম্মেলনের প্রধান উপজীব্য।

সকল মিলনই বিরহান্ত, মিলনের পর আবার বিরহ আসিবেই। ব্রজলীলার মঞ্জরীই যেন নিত্য মিলনের শিলাঘাতে ঝরিয়া পড়ে—ভাবসম্মেলনের পর আর বিরহের ভয় নাই। এই ভাবসম্মেলনের আসল তথ্যটি বিদ্যাপতি বিরহের একটি পদে বলিয়া ফেলিয়াছেন—

"অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব সভাবহি বিসরল আপন গুণ লুবধাই।"

অনুখন প্রিয়তমের চিন্তা করিতে করিতে তদ্‌গতা শ্রীমতী প্রিয়তমের সঙ্গে একাত্মক হইয়া গিয়াছেন, দ্বৈত-ব্যবধান আর নাই।

এই অদ্বয় ভাবই ত ভাবসম্মেলন। ইহাতে ত দিব্যানন্দ-সঞ্চারের কথা। কিন্তু বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—ইহাতে 'বাঢ়ত বিরহক বাধা।' ইহার একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। রাধিকার হ্লাদিনী সত্তা মাধবের সঙ্গে একাত্মক হইয়াছে তাহাতে তাঁগার কাব্যে কল্পিত দ্বৈতসত্তার ব্যবধান বাড়িয়া গেল, তাই বিরহ দ্বিগুণিত হইল। দ্বৈতলীলার কবি এই সত্তার কথাই কাব্যে রূপ দান করেন। সেজন্য কবি বিরহ-বৃদ্ধির কথাই বলিয়াছেন। রাধার এই দ্বৈতসত্তার সঙ্গেই আমাদের মানবিক সত্তার সংযোগ। আমাদের আনন্দ ভাবসম্মেলনে নয়, লীলারসসম্ভোগেই আমাদের আনন্দ।

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

এই হ্লাদিনী সচ্চিদানন্দ ভগবানে উপসংহৃত হইলে আমাদের বোধ হয় ভগবদ্‌বিরহ ঘটে। এই বিরহের কথাই কি বিদ্যাপতি বলিয়াছেন ?

যে লীলানন্দ উপভোগের জন্য ভগবানের নররূপ ধারণ, তাহা কাব্যের ভাষায় মানবিক আনন্দ। তাহাতে আনন্দও আছে, বেদনাও আছে। নিরবচ্ছিন্ন আত্মানন্দ ভোগের চেয়ে এই বেদনান্তরিত বিরহের দ্বারা উপচীয়মান নবনবায়মান আনন্দের তীব্রতা ঢের বেশী—নিরবচ্ছিন্ন আলোকের চেয়ে আলোআঁধারি, এমন কি মাঝে মাঝে আঁধারও যেমন স্পৃহণীয় হইয়া উঠে। সেই রসসত্তার তীব্র আনন্দ ভক্তগণকে দান করিবার জন্য ভগবানের হ্লাদিনীর সহিত দ্বৈত ব্যবধান। ভগবানের এই সাধ যখন মিটিয়া গেল, তখন আমাদের জীবসত্তায় হাহাকার পড়িয়া গেল। মানবিক লীলার মধ্যে যে ধনকে আমরা হৃদয়ের কাছাকাছি পাইয়া আত্মহারা হইয়াছিলাম, তাহা যখন অনন্ত অসীম সচ্চিদানন্দবিগ্রহে পরিণত হইল, তখন আমরা তাহার বিরহে—তাহার মিলনতৃষ্ণায় আকুল হইলাম। আমরা

বৃন্দাবনলীলায় তাঁহাকে পাইয়াছিলাম বিনা তপস্যায়। তপস্যার সূত্রপাত হইল ঐ ভাবসম্মেলন হইতেই।

ভাবসম্মেলনের পরে এই যে বিরহ, এ বিরহ রাধিকার নয়, এ বিরহ ব্রজের, এ বিরহ বিশ্বমানবের।

ভক্ত তুলসীদাস যেমন সীতাহরণ ও সীতাবর্জন স্বীকার করেন নাই, বহু বৈষ্ণব ভক্ত তেমনি মাথুর ও ভাবসম্মেলন স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন, আজিও রাধাকৃষ্ণ সেই বৃন্দাবনলীলাই করিতেছেন। তাঁহারা সেই লীলানন্দে বিভোর হইয়া আছেন। বাকি সকল ভক্ত হাহাকার করিয়া বলে, "শ্রীমতি, তুমি ত প্রিয়তমের সঙ্গে চিরমিলনে মিলিত হইলে, আমরা এখন কি করি? আমরা বাস্তব লোকের জীব—ভাবলোকে কেমন করিয়া যাই? তোমার ব্রজের লীলাসহচর লীলাসহচরী আমরা—লীলার বাহিরে তোমাকে আমরা চিনিতেও পারি না। তুমি সরল গোপগোপীদের ছাড়িয়া কি বৈদান্তিকের অধিগম্য হইলে?"

যে কবিরা চিরদিন ভগবানের দ্বৈতভাবকে বাণীরূপ দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অদ্বৈতভাবকে বাণীরূপ দেওয়ার ভাষণ জানিতেন না। তাই তাঁহারা তাঁহাদের দ্বৈতভাবের ভাষাতেই অদ্বৈতমিলনকেও বাণীরূপ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অদ্বৈতমিলনকে কাব্যরূপ দেওয়াই যায় না—অদ্বৈতবাদী মহাকবি রবীন্দ্রনাথও তাহা পারেন নাই। তিনিও ভক্ত ও ভগবানের দ্বৈতমিলনের ভাষায় অদ্বৈতের প্রেমস্বরূপের প্রকাশ দান করিয়াছেন।

মনে রাখিতে হইবে, ভাবসম্মেলনের তত্ত্ব এক বস্তু, আর তাহার কাব্যরূপ অন্য বস্তু। কাব্যরস উপভোগ করিতে হইলে তত্ত্বটি ভুলিয়া গেলেও চলে। কীর্তনের রাগসঙ্গীত উপভোগ করিবার আগে যেমন গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটাইতে হয়, ভাবসম্মেলনের পদগুলি উপভোগ করিবার আগে তেমনি ভাবসম্মেলনের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের দ্বারা মনকে প্রস্তুত করিয়া লইলে ভালো হয়। বলা বাহুল্য, তত্ত্বটুকু

না জানিলেও পদগুলি উপভোগ করা যায় রাধাশ্যামের পুনর্মিলনের রসচিত্র মনে করিয়া। তাহাতে রোমান্টিক রসটুকু পাইতে অসুবিধা নাই, তাহাতে মিষ্টিক রসটুকু মিলে না। ভগবান্ হইতে যে লীলাচক্রের মধ্য দিয়া নিত্যলীলায় প্রত্যাবর্তনের সত্যটি ভক্ত কবিগণ পদাবলীতে বাণীরূপ দিয়াছেন—সে চক্রের কথা না জানিয়া তাহার পরিধির যে কোন অংশ উপভোগ করা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবভক্ত বলিবেন—'এহো বাহ্য আগে কহ আর।'

রূপময় শ্যাম রায় মথুরা গেলেন, কিন্তু ভাবময় শ্যাম নিত্য মিলনেই থাকিয়া গেলেন। পদাবলীর কবিরা এই নিত্য মিলনের আভাস দিয়াছেন তাঁহাদের পদে। তাই চণ্ডীদাসের রাধা বলিয়াছেন—

তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবে কোন্ পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে॥

চণ্ডীদাস আরও বলিয়াছেন—

কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ্।

জ্ঞানদাসের রাধা বলিয়াছেন—

এ হিয়া হইতে বাহির হইয়া কিরূপে আছিলা তুমি।

মনোলোকে তাই মাথুরের ভয় নাই। বলরামদাস বলিয়াছেন—

হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।

রবীন্দ্রনাথ ইহার অর্থ করিয়াছেন—"প্রিয় বস্তু হৃদয়ের ভিতরকার বস্তু। তাহাকে কে যেন বাহিরে আনিয়াছে। সেইজন্য তাহাকে ভিতরে ফিরিয়া পাইবার জন্য এত আকাঙ্ক্ষা।"

রাধার হিয়ার ভিতর হইতে শ্যামকে বাহির করিল বৈষ্ণব কবিরাই। ইহাতেই ত বৃন্দাবনলীলা। সমগ্র লীলাবিলাস হিয়ার ভিতর হইতে বহিষ্কারিত হৃদয়ের ধনকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। হিয়ার ধনের হিয়ায় ফিরিয়া যাওয়ার নামই ভাবসম্মেলন। এই সম্মেলনের সম্ভোগই চরম সম্ভোগ—ইহাকেই বৈষ্ণবাচার্যগণ বলিয়াছেন—সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।

এই ভাবসম্মেলনের সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য তাঁহার পুলকাঞ্চিত ভাবোল্লাসে। বৈষ্ণব কবিগণ ইহাকে বৃন্দাবনলীলার উপসংহাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমদ্ভাগবত সত্য সত্যই বৃন্দাবনে ফিরাইয়া আনে নাই। অতএব বৈষ্ণব কবিগণ দেখাইয়াছেন—শ্রীরাধা বিরহে একেবারে শ্যামময়ী হইয়া পড়িয়াছেন। অনুক্ষণ অনুধ্যানের ফলে তাঁহার কাছে শ্রীকৃষ্ণ ভাববিগ্রহ রূপেই পরম সত্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাই তিনি ভাবাবেশে মনে করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ আজই ফিরিয়া আসিবেন—তাঁহাকে স্বাগত ভাষণে বরণ করিবার জন্য শ্রীমতী প্রস্তুত হইতেছেন, কত মঙ্গলাচারের আয়োজন করিতেছেন—অথবা তিনি আসিয়া আবার তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন—তিনি বহুদিনকার আকাঙ্ক্ষিত মিলনসুখ উপভোগ করিতেছেন।

শ্রীমতী কখনো দূতীমুখে শুনিতেছেন তিনি আসিতেছেন—কখনও আহার-বণ্টনরত কাকের কলকলিতে, কখনও বামাঙ্গ স্পন্দনে, কখনও নানা শুভ লক্ষণ দর্শনে, কখনো গণকের গণনায়, কখনো কুলপুরোহিতের আশীর্বচনে বুঝিতেছেন প্রিয়তমের আর ফিরিতে দেরি নাই।

দেয়াসিনী আনি দেব আরাধিনু পড়িল মাথার ফুল।
বন্ধুর নামে আগ বোলাইলুঁ কোলে মিলাওল কুল॥

ইহা প্রিয়সঙ্গমেরই শুভ সূচনা।

তাহা ছাড়া শ্রীমতী স্বপ্নও দেখিয়াছেন—

বাম ভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে হৃদয়ে উঠিছে সুখ।
প্রভাতে স্বপন প্রতীত বচন দেখিব পিয়ার মুখ॥
হাতের বাসন খসিয়া পড়িছে দুজনার একই কথা।
বন্ধু আসিবার ঠিকন যোগাতে নাগিনী নাচায় মাথা॥
খঞ্জন আসিয়া কমলে বৈসয়ে শারীশুক করে গান।
বংশী কহয়ে এ সব লক্ষণ কভু না হইবে আন॥

তারপর শ্রীমতী কল্পনা করিতেছেন—বঁধু আসিলে তাঁহার সঙ্গে

বহুদিন পরে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে এবং বঁধুই বা আমাকে হৃদয়ের আকুতি কি ভাবে জানাইবে। জ্ঞানদাসের রাধা বলিয়াছেন—

ছলছল দুনয়ানে। চাহিব বদন পানে
কিছু গদ্‌গদ্‌ স্বরে। এ দুখ কহব তারে॥

সিংহভূপতির কল্পনাবিলাসিনী শ্রীমতী বলিতেছেন—

যতন করি হবি কত না ভাখব। আশ দেই পিয়া পাশ রাখব।
সময় বুঝি তঁহি মাজ্ঝি হোই পুন সাজ্ঝি হোয়ব রে।

ইহার অনুরূপ গৌরলীলার পদে (হোত মনহুঁ লাস সুলছন ইত্যাদি পদে) জগদানন্দ কল্পনাবিলাসের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, কবিদের এই সকল বর্ণনার কোন আধ্যাত্মিক সার্থকতা নাই। বিরহিণীর সুখস্বপ্ন লইয়া রসসাহিত্যের সৃষ্টি। অলৌকিক ভাবসম্মেলনের গূঢ় তত্ত্বটিকে রসশ্রীমণ্ডিত করিবার জন্য লৌকিক অভিব্যঞ্জনা। ভাবাবেশের মিলনের বর্ণনার ভাষা ও কেলিকুঞ্জ-মিলনের ভাষা একরূপ নয়। এ মিলন যে নিত্য মিলন, ভাবলোকের মিলন, তাহাই এ ভাষায় আভাসিত হইয়াছে—

দিনকর কিরণ রহিল ঘন কুঞ্জহিঁ মীলল যুগল কিশোর।
দুঁহু কর কিরণহিঁ গেও সব আঁধিয়ার জনু কোটি রবিক উজোর॥
সজনি দেখ রাধামোহন কেলি।
অনিমিখ নয়ন-চষক ভরি পীয়ত দুহুঁ রূপসুধাসম মেলি॥
পরশহিঁ দুহুঁ তনু নুনীক পুতলী জনু মিলনক বেরি নহ ভেদ।
ঐছন মিলত কত সুখ পাওত না রহ লব পুন খেদ॥
চিরদিন মিলন করত কত নিধুবন আনন্দসায়রে বুর।
রাধামোহন পহুঁ অহনিশি ব্রজে রহু সকল মনোভব পূর॥

এ মিলন নিত্য মিলন, এ মিলনে আর ভেদ থাকে না (মিলনক বেরি নহ ভেদ)—দুইটি ননীর পুতুল যেন এক হইয়া যায়—দ্বৈত আবার অদ্বৈতে ফিরিয়া আসে। নিত্য বৃন্দাবনবাসী (অহনিশি ব্রজে রহু) রাধামোহন এই কথারই আভাস দিয়াছেন।

তারপর ভাবাবেশে বঁধুর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরাধার ভাবোল্লাস। বিদ্যাপতির রাধা বলিয়াছেন—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

এই পদটি—আর—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখলুঁ পিয়া-মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ দশ দিশ ভেল নিরদ্বন্দ্বা॥

এই দুই পদে যে উল্লাস অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা বৃন্দাবনের আর কোন মিলনের পদে নাই।

সকল মিলনেই ছিল দেহের ব্যবধান, চুয়া চন্দন চীরের ব্যবধান —সব মিলন-সম্ভোগই যেন ছিল সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। এই ভাবমিলনেই কেবল কোন বাধা-ব্যবধান নাই, কুণ্ঠা-সঙ্কোচ নাই, মানাভিমানের পূর্ববর্তিতা নাই। ইহাই প্রকৃত সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। সম্ভোগের উল্লাসও তাই অকুণ্ঠিত।

এই ভাবোল্লাস যখন শ্রীচৈতন্যদেব উপভোগ করিতেন—তখন সহচরগণ বিদ্যাপতির ঐ পদ দুইটি গাহিয়া সেই উল্লাসকে নিবিড়তর ও উৎসবময় করিয়া তুলিতেন। ভাবসম্মেলনের শেষ কথা—

বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দেব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ সেইখানে লঞা থোব॥

রূপলোকেই বিচ্ছেদ আছে, মান আছে, অভিসারের ক্লেশ আছে, দ্বৈত-ব্যবধান আছে। ভাবলোকে এসব কিছুই নাই। ভাবলোকে নিত্য মিলন।

রূপলোকে দ্বৈত ব্যবধান। অদ্বৈতে তা লভে অবসান॥

তাই শ্রীমতী প্রার্থনা করেন আর লীলানন্দের লোভে যেন নিত্য মিলনের অদ্বয়তত্ত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। বৈষ্ণব ভক্তেরা বলেন—শ্রীমতীর এই বাসনার ফলেই ত শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। আমরা বলি শ্রীমতীর বেদনায় আর্ত গৌড়জনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই বৈষ্ণব কবিরা ভাবসম্মেলনের পদগুলি রচনা করিয়াছেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত ভাবসম্মেলনের পদগুলিতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাবকে আশ্রয় করিয়া রাধাকৃষ্ণের অদ্বয়ত্ব দেখানো হইয়াছে। উৎকণ্ঠা, রূপতৃষ্ণা, প্রতীক্ষা, অভিসার, মান-অভিমান, বিরহ ইত্যাদির পালা শেষ হওয়ার পর প্রেমের যাহা অনিবার্য পরিণতি এই পদগুলিতে তাহাই দেখানো হইয়াছে। যতক্ষণ দৈহিক ব্যবধান, ততক্ষণই প্রেমের গতি 'অহেরিব' (সাপের মতন)—ততক্ষণই মান-অভিমান, লোকগঞ্জনা ও ঈর্ষার জ্বালা। দৈহিক ব্যবধান ঘুচিলেই সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন।

ভাবসম্মেলনে চণ্ডীদাস শ্রীমতীর মুখে যে পদগুলি বসাইয়াছেন—প্রেমে আত্মসমর্পণের দিক হইতে তাহার তুলনা নাই। এমন কোন বাঙ্গালী নাই যে শুনে নাই—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি॥

এই গান শুনিয়া বাঙ্গালী বুঝে, লৌকিক জীবনেরই হউক আর আধ্যাত্মিক জীবনেরই হউক, সকল প্রেমাস্পদের উদ্দেশেই বাঙ্গালার অন্তরের চিরন্তন আবেদন ইহাই। এই আত্মসমর্পণ শ্রীরাধার পক্ষেও যেমন, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও তেমনি। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর উদ্দেশে বলিতেছেন—

সাধন ভজন করে যেইজন তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন তোমার চরণ তুমি রসময় নিধি॥
যেবা কিছু আমি সব জান তুমি তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়ে নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে কি হইব পার?

ইহাতেও তুষ্ট না হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে অমর করহ তুমি।"

প্রকারান্তরে কবি বলিতেছেন—সকল ভজন সাধনের সার প্রেমের সাধনা। প্রেমের সাধনাই ভবার্ণব তরিবার নায়ের কড়ি। একমাত্র রসসাধনাই প্রেমিককে অমৃত দান করিতে পারে। বাণী যেমন রসের সায়রে অবগাহন না করিলে অর্থাৎ রসময়ী না হইলে অমর হয় না, প্রাণীও তেমনি রসসায়রে অবগাহন না করিলে অমৃতত্ব লাভ করে না।

আমরাও শ্রীমতীকে বলি—তুমিই শ্রীকৃষ্ণকে রসের সায়রে ডুবাইয়া কাব্যলোকে জীবন্ত করিয়াছ—অমর করিয়াছ, নতুবা তিনি হয় অনধিগম্য ব্রহ্ম, নয়ত পৌরাণিক কল্পনামাত্র হইয়া থাকিতেন। তোমারই কৃপায় ভক্ত তাঁহাকে প্রেমলোকে পাইয়াছেন—আমরা পাইয়াছি কাব্যলোকে।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

গঞ্জন বচন তোর শুনি সুখে নাই ওর
সুধাময় লাগয়ে মরমে।
তরল কমল আঁখি তেরছ নয়নে দেখি
বিকাইনু জনমে জনমে॥
তোমা বিনা যেবা যত পীরিতি করিনু কত
সে পীরিতে না পূরিল আশ।
তোমার পীরিত বিনু স্বতন্ত্র না হৈল তনু
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস॥

যিনি প্রেমের বশ, তিনি স্তবস্তুতি চাহেন না, বরং তাঁহার কাছে প্রেমের অনুযোগ, অভিমান ও গঞ্জনাই অধিক প্রীতিকর। গুণকীর্তনের সোনার পাত্রে তিনি কোন রাজভোগ্যই চাহেন না, তিনি গঞ্জনা-বচনের মৃৎপাত্রে চাহেন প্রেমের সুধা।

রাধাপ্রেমে যে মধুর রসের চূড়ান্ত পরিণতি শ্রীকৃষ্ণ সেই মধুর রসেরই ভিখারী। বৈষ্ণবরা বলেন, মধুর রসের এই অনির্বচনীয়

আস্বাদ লাভের জন্যই 'এক' তিনি 'দুই' হইয়াছেন—তাঁহার হ্লাদিনী মহামায়াকে রূপদান করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

তত্ত্বের ভাষায় এখানে গোস্বামী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন—সাহিত্যের ভাষায় তাহা বলিতে গেলে বলিতে হয়—

মধুর লীলার রস ভক্ত কবি আস্বাদন তরে,
বিতরিতে সেই রস সর্বজনে গৌড়ে ঘরে ঘরে,
অদ্বৈতের দ্বৈতরূপে করিয়াছে প্রেমের সাধনা,
দ্বিভুজ মুরলীধররূপে ব্রহ্মে করিয়া কল্পনা॥

চণ্ডীদাস এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া চরম কথাটি বলিয়াছেন—

রাই, তুমি যে আমার গতি।

তোমার লাগিয়ে রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি॥
কিশোরীর দাস আমি পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার॥

ঐশ্বর্যভাবমুগ্ধ ভক্ত মনে করে, রাখাল বানাইয়া, কিশোরী আভীর-কন্যার প্রেমের কাঙাল বানাইয়া বুঝি রসলোভীরা ভগবানকে ছোট করিতেছে। তাই চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—ইহাতে যে সন্দেহ করে তাহার কোটি যুগের সাধন ভজনও বিফল।

পদাবলীর আলোচনা সমাপ্ত করিলাম। সমাপ্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম না—সমাপ্তিবেদনা বিচ্ছেদবেদনার ন্যায় আমাকেও কাতর

করিতেছে। যতদিন এই আলোচনা লইয়া ছিলাম—ততদিন বৃন্দাবনেই বিহার করিয়া আনন্দ পাইতেছিলাম—মাথুর বেদনা আজ আতুর করিয়া তুলিতেছে—বেদনার কারণ আরো আছে। কত কথা বলিব ভাবিয়াছিলাম—সব বলা হইল না। পদাবলী পাঠে যে অচিন্তনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি—তাহাব সামান্য অংশও প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আশ্বাসের বিষয় এই—পদাবলী অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার, বহু যোগ্যতর ভাগ্যধর ব্যক্তি ইহা উপভোগ করিবেন এবং উপভোগের ফলস্বরূপ পরমানন্দধারা তৃষিত পাঠকদের দান করিবেন। আমি শুধু ঐ অফুরন্ত রসভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

কীর্তনে পদাবলীর গান শুনিবার কর্ণসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে—সংখ্যায় অল্প হইলেও এখনও ভক্তের দেখা পাওয়া যায়। সঙ্গীতের মাধুর্যই সাধারণ লোকেব আকর্ষণ, কাব্য হিসাবে পদাবলীর পাঠক দিন দিন কমিয়া আসিতেছে—এযুগের পাঠক কবিতা বলিতে যাহা বুঝে তাহার সব দাবি পদাবলী মিটাইতে পারে না। সেজন্য অনেকে ইহাকে গান বলিয়াই বিদায় দেয়। কিন্তু পদাবলীর দিন কখনও ফুরাইবে না—কারণ, পদাবলী নিত্য বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করিয়া রচিত—যাহা অনিত্য—যাহা যুগে যুগে সাময়িক, তাহার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই—পদাবলীর উপজীব্য প্রেম, প্রকৃতি ও চিরসুন্দর; যাঁহারা পরিমার্জিত চিত্ত রসগত প্রাণ তাহারা মনে করেন—কাব্যের উপজীব্যতার পক্ষে এই তো যথেষ্ট,—ইহার বেশি কিছু পাওয়া যায়—তবে তা উপরি পাওনা।

পদাবলীর শ্রীগৌরাঙ্গ

ব্রজলীলার পদাবলীর সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। গৌরপদাবলী সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা হয় নাই। গৌরপদাবলীতে পরিকল্পিত শ্রীগৌরাঙ্গের রূপটি চিত্রিত করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিলাম—

তব—নয়নে বাদর ঝরে, পুলকাঙ্কুরে ভরে
হেমতনু,—জাগে রসমঞ্জরীবৃন্দ,
স্বেদছলে মধুকণ ক্ষরে তায় অনুখন,
চরণপঙ্কে ফুটে রাতা অরবিন্দ।

শোভি' সংসারমরু জাগিলে কল্পতরু,
ও-ছায়ে শরণ নিল কলিকলুষার্ত ;
যেই ফল বিতরিলে তুলা নাই এ নিখিলে,
প্রেমসম নয় মিলে চারি পুরুষার্থ।

কল্পতরুর কাছে পায় বটে যেই যাচে,
না যাচিতে দাও তুমি না বিচারি যত্ন ;
কল্পতরুর তলে না গেলে কি আশা ফলে ?
দ্বারে দ্বারে সেধে কেঁদে বিলাইলে রত্ন।

মায়াবাদী যতি যত হ'লো তব পদানত,
জ্ঞান-সুরা-ঘট ভাঙি, পিয়ে প্রেমদুগ্ধ ;
কৃষ্ণ-সারের পায় কেশরী করুণা চায়,
তরল-আয়ত-আঁখি-পরসাদে-মুগ্ধ।

ঢল-ঢল নিকষিত হেম-তনু-বিগলিত
লাবণি গড়ায়ে পড়ে অবনীর অঙ্গে,
চন্দন-ললাটিকা বিথারে ললাটে শিখা,
'মদন মূরুছা পায় হাস্যতরঙ্গে।'

কীর্তন-তাণ্ডব- বিলোল চরণে তব
অভিঘাতে জাগে ভূমি-জননীর হর্ষ ;
'হরি-হরি'—হুঙ্কৃতি উত্তাল সঙ্গীতি
গগন বিদারি' করে গোলোকেরে স্পর্শ।

রসহ্রদে ডগমগ   কনক-মরাল-খগ
ফুটালে পাখার বায়ে আঁখি-শতপত্র,
ফেলি পুঁথি বীণাখানি   রসাবেশে বীণাপাণি
নাচিল তোমার সাথে ত্যজি জ্ঞানসত্র।

তব ব্রজরজকায়ে   পুলকিত নীপছায়ে
রাস-রসে বিলসিত লীলাবৈচিত্র্য,
প্রকটিত শ্রীআননে   ঢুলু-ঢুলু দ্বিনয়নে
বিরহিণী শ্রীমতীর নিখিল চরিত্র।

ডুবে উৎকল রাঢ়   আ-কেরল একাকার
ভাসাল গৌড় ব্রজ তব প্রেমসিন্ধু,
নাচিলে লহরী 'পরি   তা তা থৈ থৈ করি',
লক্ষধা বিম্বিত—নদীয়ার ইন্দু।

খনে হাসি খল-খল   খনে আঁখি ছল-ছল,
রামধনু রচে মেঘ রৌদ্রের সঙ্গে,
শরৎ, মূরতি ধরি   আসিলে কি অবতরি?
শ্যাম-গৌরব মরি শিহরে মৃদঙ্গে।

কর-নখে রবি জ্বলে   পদ-নখে শশী ঝলে,
নিশ্বাসে বিলসিত তুলসীর গন্ধ;
মহাভাবমোহে ভোর   হ্লাদিনী রসের চোর,
মাধুরী-লতার গোরা চির-রসকন্দ।

তব লাবণির ভায়   হেম-মুকুরের ছায়
হেরে কবি লীলাময় যুগল শ্রীমূর্তি।
হুঙ্কার-তাণ্ডবে   'পুরুষ' বিকাশ লভে,
লীলায়িত ভঙ্গীতে 'প্রকৃতি'র স্ফূর্তি।

তব পদপঙ্কজে দাদুরীরো মন মজে—
হেরি পাণিযুগ নাগকেশরের দণ্ড ;
আখিজলে টলমল দু'টি নীল শতদল,
ভৃঙ্গ হইল তায় কত যে পাষণ্ড।

কৃষ্ণ-বিরহানল প্রাণ-দীপে প্রোজ্জ্বল
যে অনলে বিগলিত অযুত অনঙ্গ,
কলিকল্মষ পুড়ে' ধূলি হয়ে যায় উড়ে,—
অযুত ভকত তায় হইল পতঙ্গ।

যে অনলে স্বেদজলে তনু-নবনীত গলে,
যে অনলে অরুণিত নয়নের প্রান্ত,
কলিযুগে যে অনলে হরিনাম-যাগ জ্বলে,
সে অনলে পুড়ে গেল তন্ত্র-বেদান্ত।

কেবা করে পথ-রোধ ? দিগ্বিজয়ের যোধ
চলে সাথে, জয়নাদ করে শততুণ্ড।
আগে আগে দুলি' দুলি' হে বীর চলেছ তুলি'
আজানু-লম্বি বাহু—করিবর-শুণ্ড।

দেহে ধূলি বিভূষণ, গলে দুলে আভরণ
নাম-সূতে গাঁথা হরিগুণমণি-মাল্য।
স্বেদজলে বলিরেখা, যেন হ্রদে শশিলেখা
রাজে যৌবনবনে ধ্রুব হয়ে বাল্য।

ব্রজনাট অভিনয়ে এলে নট সুসময়ে
দম্ভদমন-লীলা করিলে আরম্ভ,
গঙ্গা, যমুনা হয়ে ভাবঘোরে যায় ব'য়ে,
তীরে তার সব তরু শিহরি কদম্ব।

অবনী বুকের পানে নবনী-তনুটি টানে,
সচকিতে শচীমা'র মমতার দৃষ্টি,
যাঁহা যাঁহা ধূলি 'পরে তনু আছাড়িয়া পড়ে
কমল-শয্যা করে তাঁহা তাঁহা সৃষ্টি।

ভাবাবেশে গর-গর' কতবার পড়-পড়',
অবিরল দরদর ধারা বহে চক্ষে,
ধ্বস-ধ্বস মার প্রাণ উদ্বেগে বেপমান,
মনে মনে বার বার ঠেকা দেয় বক্ষে।

নাচিতে নাচিতে হায় ঢ'লে পড়ো কার গায় ?
কার গলা ধ'রে কাঁদো ? অদ্ভুত দৃশ্য !
সঙ্কোচে লাজে ডরে ও যে নিজে পড়ে-পড়ে,
ও যে দীন চণ্ডাল হীন অস্পৃশ্য।

প্রেমাবেশে নেচে নেচে পতিতেরি কোল বেছে
ও তনু পতিত হয়—নহে কারো বশ্য।
বলে, "গেল, হায় হায়, ব্রাহ্মণ-ব্যবসায় !"
নদীয়ার যত মূঢ় জাতি-সর্বস্ব।

বুকের পাষাণ হরো মূকেরে মুখর করো,
মোহমূঢ় অন্ধের আঁখি কর ফুল্ল,
পঙ্গুরে দাও বল লঙ্ঘে সে হিমাচল,
কাক-পেচকেরে করো গরুড়ের তুল্য !

রূঢ় জ্ঞানযোগিগণ ছিল যারা নিমগন
পুঁথিতে খুঁজিতে সেই সচ্চিদানন্দে,
লীলানন্দের সাড়া পেয়ে চঞ্চল তারা,
কি লিপি পাঠালে প্রভু তুলসীর গন্ধে ?
ভুলাইলে ধন জন কেলি কাম কাঞ্চন,
রচিলে প্রেমের হিমে কাঞ্চনজঙ্ঘা।

তাপসের জটা ভরি' রসসঞ্চার করি'
ভাসাইল 'গজপতি' তব প্রেম-গঙ্গা।
তোমার লীলার ব্রজ দিল যে পথের রজ,
পারের পাটনী চায় তাহারি প্রাচুর্য,
জ্ঞান ধ্যান হোম জপ সাধনা কঠোর তপ
সব হ'তে বড় হ'লো সহজ মাধুর্য।
ধন মান জ্ঞান যশ কে তোমা করিবে বশ?
তোমার চরিত-রীত বেদবোধগুহ্য।
কলা মূলা বেচে খায় শ্রীধর করুণা পায়,
অবাক তাপস যোগী,—সেও সাধুপূজ্য।
এ অধমে তারো তারো! ডুবিতে কি বলো আরো?
পতিত-পাবন নাম হবে কি অসত্য?
কতটা পতিত হ'লে প্রভু তুমি নেবে কোলে?
শ্মশানে চলিলে, মিছে ঔষধ-পথ্য।
ব্যবহার-রসে হায় দিন মোর জ'রে যায়,
তব নাম রসনায় আসে না দিনান্তে;
শ্রীবাসের আঙিনার ধূলি কবে হবে সার,
নামামৃত-রসে কবে ডুবাবে এ ভ্রান্তে?
নিঃস্ব অকিঞ্চনে চড়াইলে সযতনে।
ভাব-গজরাজে, প্রভু, হাতে ধ'রে তুল্লে।
ছয় ঘোড়া টানে রথ নিরাপদ নহে পথ,
সেই পথে প'ড়ে যেবা তারে কেন ভুল্লে?